বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা

(প্রথম সংখ্যা)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

২০১৪

বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা

প্রথম সংখ্যা

২০১৪

Research Journal of Bengali Language and Literature

Vol.-I

2014

UNIVERSITY OF CALCUTTA

সম্পাদক

ড. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভাগীয় প্রধান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সম্পাদকের নিবেদন

বিভাগীয় গবেষকদের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে আমাদের এই 'বাংলা বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা'। সারস্বত প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনে স্বভাবতই যুক্ত হয়ে পড়ে এর উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এই পত্রিকা থেকেও আশা রাখি আমাদের তরুণ গবেষকদের গবেষণার মান রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাঠক করে নিতে পারবেন। এই পত্রিকাটি ঘিরে যদি বৃহত্তর পাঠক-গবেষক-শিক্ষক সমাজে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়, তবেই পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তা সবিশেষ সহায়ক চালিকাশক্তির কাজ করবে।

বিভাগের 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, আজও সেটি বিভাগীয় অধ্যাপকদের গবেষণাধর্মী রচনা প্রকাশের উপযুক্ত আধার। আমরা সর্বদাই চেষ্টা করি পত্রিকাটি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করতে, কিন্তু পেরে যে উঠি, তা বলা যাচ্ছে না। আসলে লেখা জোগাড় করাটাই এক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ একটি ব্যাপার। ফলে প্রতি সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যাটি অনিবার্যভাবেই আরও বিলম্বিত হয়ে এখন ব্যাপারটি অনিয়মিতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দায় আমাদের। তবু চেষ্টা চলছে ঐ পত্রিকাটিও দ্রুত প্রকাশ করার। এখন আবার যুক্ত হল গবেষকদের পত্রিকাটিও নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করার অতিরিক্ত দায়িত্ব। আমি কাজটি শুরু করলাম, আশা রাখি পরবর্তীরা কাজটি সুষ্ঠুভাবে ও নিয়মিতভাবে করবেন।

ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সহকর্মীদের, প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের প্রদীপদা ও বাদবাকি সকলকে—যাঁদের সহায়তায় এত দ্রুত প্রত্রিকাটি প্রকাশিত হল। চেষ্টা করেও পুরো নির্ভুল হয়তো করতে পারলাম না সংখ্যাটিকে, তাই আগেই ক্ষমাপ্রার্থী। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের পাঠকদের আগ্রহ এই গবেষণা পত্রিকা আরও বাড়াবে বলেই আমার বিশ্বাস। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আর এই তালিকার অন্তিম নাম—উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস। পত্রিকাটি প্রকাশই হত না তাঁর সাহায্য না পেলে; আসলে আমাদের যে কোনো সংকটে তো তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিজ্ঞানভাবনা

অজিতকুমার মণ্ডল

একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে প্রাচীনকালের বিজ্ঞানভাবনা আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য নয় এমনকি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও তা নাগালের মধ্যে আসে না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়ত যে সাহিত্য-দর্শন-মানবিক সংস্কার-ধ্যান-ধারণা মানবের মনে সৃষ্ট হয়েছিল তার একটি বিশিষ্ট রূপ পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন সৃষ্টিতে, কিংবদন্তীতে এং নানাবিধ ঘটনায়। সে-যুগে প্রকৃত সত্যের কথা বলে সক্রেটিস, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও সমাজে তথা রাজশক্তির কাছে নির্যাতিত হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে সেই-সমস্ত সত্য শাশ্বত সত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। আসল কথা এই যে প্রাচীনকালে সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়েছিল এবং সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিত-মানসিকতা-চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতিকে আশ্রয় করে তা অভিব্যক্ত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই দৃষ্টিভঙ্গি এখনকার বিজ্ঞানভাবনার সমতুল্য নয়, তাই সেই যুগের বিজ্ঞানভাবনাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করতে হবে। আরও একটি কথা এই যে নিতান্ত সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুই-আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিজ্ঞান তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিজ্ঞান এক স্বতন্ত্র ভাবনা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই আধুনিক কালের দান এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যে-দর্শনে-চিন্তায়-ভাবনায় তা স্বতন্ত্র স্বরূপেই অভিব্যাক্তি হয়েছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অনুরূপ বিজ্ঞানের অস্তিত্ব খুঁজতে গেলে আমাদের অবশ্যই হতাশ হতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায়—গায়ত্রীমন্ত্রে "ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্" প্রার্থনার মধ্যেও অনিবার্যত একটি বিজ্ঞানভাবনা ছিল যা প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গিরই দ্যোতক। সমগ্র বিশ্বকে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করে সূর্যকে সমস্ত শক্তির আধার রূপে কল্পনা করে যে মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষি এককথায় অনবদ্য অকল্পনীয়। অনুরূপভাবে 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' অভিব্যক্তির মধ্যেও সূর্যের অন্তর্নিহিত যে বৈজ্ঞানিক সত্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান তা প্রাচীন 'জবাকুসুম সঙ্কাশ' এবং আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার 'আলট্রা ভায়োলেট রেজ' (অতি বেগুনি রশ্মি) অনায়াসে সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। কালিদাস-এর যুগেও যখন আমরা লক্ষ করি *'রঘুবংশ'র* সেই বিখ্যাত উক্তি :

> "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্দ্ধারা নিবন্ধেব কলঙ্করেখা।।"

তখন অন্তরালের বৈজ্ঞানিক সত্যটি দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। অথচ এই শ্লোকের মধ্যেও বিজ্ঞান আছে, হয়তো বা প্রাকৃত বিজ্ঞান। মহাশূন্য থেকে দেখা ভারতের এক বিশিষ্ট মানচিত্র যা আধুনিক কালেও সর্বাংশে সত্য। সেই সঙ্গে অনভিব্যাক্তি বিজ্ঞানের সত্যটিকেও উপেক্ষা করা যায় না। এ চিত্র সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে দেখা নয়, না হলে কীভাবে দেখা হয়েছিল? সে কি কোনও মহাকাশ যাত্রার শরিক রূপে? অথবা নিতান্তই মানসচক্ষে দেখা কাল্পনিক সত্য? যদি এই চিত্র মহাকাশনির্ভর হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে মহাকাশযানের কল্পনাও এই সঙ্গে এসে পড়তে পারে, তার মানেই হল এই দু'টি চরণ কেবল বক্তব্যের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়নি, অন্তরালের অবশ্যম্ভাবী বিজ্ঞানের প্রতিও ইঙ্গিত করে, যা হয়তো বা সেকালের মহাকাশযান মহাকাশচারণা প্রভৃতির মধ্যে নিহিত, সেই সঙ্গে

একথাও মনে হতে পারে যে রামায়ণ বর্ণিত কুবের-রাবণের পুষ্পক বিমান একান্তই কবিকল্পনা নয়, তার পশ্চাতে প্রকৃতই সেকালের বিজ্ঞানের বাস্তব সত্য বিরাজমান ছিল।

এইভাবেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে বিজ্ঞান সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনুপ্রবিষ্ট এবং সেই অনুপ্রবেশে বৈদিক-সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ এমনকি নব্যভারতীয় ভাষার বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গেও কোনও পার্থক্য ছিল না। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই দেখা যাবে কিভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসর্বস্ব বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানভাবনা ঢুকে পড়েছে। এই সাহিত্য যেমন চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ঠিক তেমনি মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী সাহিত্য এবং বৈষ্ণবপদাবলিও হতে বাধা নেই।

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের যুগে মাধ্যমিক-যোগাচার-শূন্যবাদ-তন্ত্র প্রভৃতির প্রাধান্যের কালে পূর্বভারতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল বৌদ্ধ সহজিয়াদের সহজযান। জীবনের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা না করে তারই সাধনায় জীবনের নির্বাণ, মোক্ষ বা মহাসুখ লাভের ভাষ্য রচিত হয়েছিল *'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'* আধারিত বিভিন্ন পদ সমূহে। সংকলিত পদসমূহের মধ্যে যেমন সহজ ভাবে স্বাভাবিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তেমনি আবার সন্ধ্যাভাষিত চর্যায় গুহ্য সাধনতত্ত্বের অপরূপ প্রকাশও পরিলক্ষিত হয়। আদি চর্যাকার লুইপাদের নামে চিহ্নিত সংকলন গ্রন্থের আদি চর্যাটির যেমন সহজ ভাষা তেমনি তার ভাবও অনাবিল :

"কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চলচীত্র পৈঠকাল।।
দিঢ়করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।"[১]

স্পষ্ট বোঝা যায় ধর্মীয় সহজযানের সাধনায় অনিবার্যভাবে সহজ বিজ্ঞানকে আশ্রয় করা হয়েছে। দেহবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র অবলম্বন করে সিদ্ধাচার্য পৌঁছে গিয়েছেন 'মহাসুহ'-এর উপলব্ধির জগতে কিন্তু তিনি গুরুবাদকে উপেক্ষা করেননি। এইভাবেই আধ্যাত্মিকতা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এক অভাবিত সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বিজ্ঞান আপাত দৃশ্য না হলেও অন্তরালে তার অস্তিত্ব প্রমাণে একান্তই বদ্ধপরিকর। হতে পারে সে অস্তিত্ব এখনকার দৃষ্টিভঙ্গিসুলভ নয়; কিন্তু সে অস্তিত্বকে উপেক্ষাও করা যায় না। চর্যাগীতিটির উপসংহারে আধ্যাত্মিক সাধনার কথা আরও গভীরতর হয়েছে :

"লুই ভণই আমহে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বৈঠা।।"[২]

আধ্যাত্মিক সাধনা 'ধমণ' 'চমণ' অবশ্যই দেহমার্গের সাধনার পারিভাষিক শব্দ। কিন্তু তার সাধনগত যোগাসন নির্ভর সাধনপথটি অবশ্যই অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্পর্কিত। এ রহস্যের উন্মোচন অবশ্যই বিতর্ক সাপেক্ষ। সিদ্ধাচার্য লুইপাদ যা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তার সঙ্গে যোগসাধনার বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়েছেন অর্থাৎ বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনাও ঘনীভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

লুইপাদের সঙ্গে বিজ্ঞানভাবনাকে সম্পৃক্ত করে ভিন্নতর আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছেন কোনও কোনও আলোচক, সেখানে বিজ্ঞানের কথা ভিন্নভাবে হলেও তা স্পষ্টতর। চর্যার শূন্যবাদের সঙ্গে

বিজ্ঞানের চিন্তাগত ঐক্য রয়েছে। বিজ্ঞানবাদীরা জগতের পরিদৃশ্যমান কোনও কিছুকেই পরমার্থ বলে মনে করেন না, তাঁরা মনে করেন সমস্ত কিছুই বিজ্ঞান। সংসার-প্রবাহ-ধারার অন্তরালে যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপের অস্তিত্ব বিদ্যমান তা লুইপাদ রচিত ২৯ সংখ্যক গানে বুঝতে পারা যায় :

"ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।।

লুই ভণই বঢ় দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাত্র বিলসই উহ ণাঠাণা।।

জাহের বান চিহ্ন রুব ন জাণী।
সো কইসে আগমবেএঁ বখাণী।
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।।"

অর্থাৎ মোহমুক্ত মনই 'প্রকৃতি-প্রভাস্বর' যুক্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আশ্রয়। চর্যায় যে প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞান-চেতনার উন্মেষ স্পষ্ট হয়েছে তা চর্যাকারদের রচনাতেও সুস্পষ্ট প্রমাণিত। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিজ্ঞানভাবনা বা বিজ্ঞান-চেতনার প্রথম অঙ্কুরটির যে চর্যাতেই উদ্‌গম হয়েছিল তা এভাবেই বুঝে নেওয়া যায়। সুতরাং চর্যায় বিজ্ঞানের একটি আভাস যে চর্যার কবিরা রেখে গেছেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

চর্যা নামের অর্থই হল আচরণ। চর্যাগীতিতে তারই প্রকাশ। তত্ত্বের পাশাপাশি সহজিয়া সাধকের জীবনাচরণের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সমন্বয়ে সৃষ্ট। বিশেষভাবে বলতে হয় নাগার্জুনপাদের শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ তথা মৈত্র-অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদের কথা। শূন্যবাদের মধ্যেও বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। সমস্ত বিশ্বের মূল সত্য শূন্যতা আশ্রিত—অর্থাৎ জগতের সমস্ত কিছুই অনিত্য বলেই তা শাশ্বত নয়, তবে ভারতীয় দার্শনিকতার ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যার কথা যেভাবে শঙ্করাচার্য প্রচার করেছিলেন নাগার্জুনের শূন্যবাদ হয়তো ঠিক সেই পর্যায়ের নয়, তা সত্ত্বেও জাগতিক প্রকাশের মধ্যে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বিদ্যমান, এইদিক দিয়ে চর্যার যোগাচারের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদের প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ অস্বীকার করা যায় না। আবার একথাও সত্য চর্যাসমূহে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় ঘটেছে, অর্থাৎ বজ্রযান-সহজযান-মাধ্যমিক-যোগাচার যেমন আছে তেমনি চর্যার মধ্যে তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বিদ্যমান। 'প্রকৃতি-প্রভাস্বর' বিশিষ্ট বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আভাস স্পষ্টতই অনুভূত হয় জয়নন্দীর পদে :

মূল পাঠ	আধুনিক বাংলা রূপান্তর
"পেখু সুঅণে অদশ জইসা।	স্বপ্নে এবং দর্পণে যেমন দেখা যায়
অন্তরালে মোহ তইসা।।	অন্তরালের মোহও তেমনি
মোহ বিমুককা জই মণা।	মন যদি মোহমুক্ত হয়
তবেঁ তুটই অবণাগমণা।।	তবে আসা যাওয়া বন্ধ হয়।
নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চ্ছিজই।	(অগ্নিতে) দাহ্য নয়, (জলে) সিক্ত হয় না, ছেঁড়েও না।

পেখ মোঅ মোহে বলি বলি বাঝই।।	(তথাপি) দেখ বারবার মোহে বৃথা আবদ্ধ হয়
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা।	ছায়া মায়া কায়া সমান
বেণি পাখেঁ সোই বিণা।	সেই (চিত্ত) দুই পক্ষহীন
চিঅ তথতা স্বভাবে ষোহিঅ।	চিত্ত তথতা স্বভাবে শুদ্ধ
ভণই জঅনন্দি ফুঢ় অণ ণ হোই।।"[৩]	জয়নন্দী স্পষ্ট বলেন, অন্যথা হয় না।

এই পদে চিত্ত এবং অন্তরালবর্তী আত্মার কথা আভাসে ব্যক্ত হয়েছে। মোহ দ্বারাই চিত্ত সংসারে আবদ্ধ হয় যদিও তা (আত্মা?) অদাহ্য-অসিক্ত-অবিভাজ্য। ছায়া মায়া কায়া সমান বলেই শূন্যবাদে পৌঁছেছেন কবি। আবার বিশুদ্ধ চিত্তের কথাও ব্যক্ত করেছেন, এই হল 'প্রকৃতি-প্রভাস্বর'-এর আভাস।

সহজ সামাজিক জীবনের বর্ণনাতেও চর্যাকারেরা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু বিজ্ঞানভাবনায় এই সহজিয়া জীবনও একান্ত সহজ নয়। তার অন্তরালে স্বয়ং প্রকটিত হয় তত্ত্ব এবং জীবনদর্শন। ঢেন্টনপাদ রচিত ৩৩ সংখ্যক চর্যায় পাওয়া যায় তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ :

"টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

বেগে সংসার বডহিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে সামাঅ।।"

সহজযানে সহজ সাধনার অঙ্গরূপে যে সমাজ ও সংসার চিত্র এখানে পরিবেশিত হয়েছে তাকে শুধুমাত্র সহজবিজ্ঞানের ভাষায় বিশেষিত করা সম্ভব নয়, এর মধ্যে সহজবিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞান-গার্হস্থ্যবিজ্ঞান-অর্থনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতিও অসামান্য দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন চর্যাকার। নিম্ন জলাভূমি বলেই কিনা কিংবা অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজবহির্ভূত অন্ত্যেবাসী বিশিষ্ট সামাজিক জীবরূপেই কিনা সে-কথা চর্যার ভাষায় স্পষ্ট নয়, কিন্তু একথা স্পষ্ট যে তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে তার অবস্থান অরণ্যপ্রান্তে অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে। শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও সেখানে অতিথির নিত্য আনাগোনা। অনুরূপ সমস্যা সংকুল জীবনে আবার বংশবৃদ্ধিজনিত সমস্যা—ফলে অভাবনীয় অভাব এবং দারিদ্র্য। এই গুটিকয়েক চরণেই যে-কবি অসামান্য সমাজ ও সংসার জীবনের পরিচয় দিতে পারেন তিনি যে সমাজবিজ্ঞান-গার্হস্থ্যবিজ্ঞান-সমাজব্যবস্থা তথা প্রাচীন অর্থনীতি উপস্থাপনেও অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন সে-বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। আরও বিস্ময় উদ্রেক করে আভাসিত গৃহবিজ্ঞানের দিকটি—"টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী" এই অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও অন্ত্যজ শ্রেণির গৃহনির্মাণকলার একটা সুস্পষ্ট আভাস বিদ্যমান। বর্ণনায় না পাওয়া গেলেও পাঠকচিত্তে অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে ব্যাধ-শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষের কুটিরের বর্ণনা যেন আধুনিক কবিসদৃশ চিত্রকল্পে আভাসিত হয়।

অনুরূপ শবরপাদের এই পদে গার্হস্থ্যবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে শবরী বালিকার প্রসাধনে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই শিল্পকলা অনিবার্যভাবে ভর করে :

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ গীবত গুঞ্জার মালী।।"[৪]

প্রাকৃত জীবনের কবি তাঁর নায়িকাকে স্বাভাবিক ভাবেই সাজিয়েছেন প্রকৃতির দানে। তাই তার

অঙ্গসজ্জায় ঠাঁই পেয়েছে ময়ূরপুচ্ছ এবং আরণ্যক গুঞ্জার মালা। এই স্বল্প প্রসাধনে বন্য নারী যেন আধুনিকার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'বনলতা সেন'-এর নায়িকা "পাখির নীড়ের মতো চোখ" নিয়ে যেখানে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেখানেই চর্যার কবির নায়িকা ময়ূরপক্ষীর চক্ষুসদৃশ কলাপ-সজ্জায় অনুরূপ জ্যোতির্ময়ী। কিন্তু তা হলেও সে তার আরণ্যক স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়নি। এই সামাজিক পরিমিতিবোধ যেন বিজ্ঞানেরই পরিমিতিবোধের অনুরূপ। আর এক ধরনের প্রাকৃত বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে ঠাঁই পেয়েছে চর্যাগীতি পদাবলিতে যা অভিব্যক্ত হয়েছে কিঞ্চিৎ দিনচর্যার প্রয়োজনের ভিত্তিতে, আর অধিকতর প্রকটিত হয়েছে গার্হস্থ্যশিল্পকলার বিজ্ঞানের আধারে। সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও সাঁকো নির্মাণ, নৌকো নির্মাণ প্রভৃতি বাস্তুকলা তথা প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিশেষভাবেই প্রকাশিত হয়েছে চর্যাপদের বিভিন্ন বর্ণনায়। দৃষ্টান্ত চাটিলপাদের নামাঙ্কিত ৫নং চর্যায় প্রাকৃত নদী চিত্রকল্পের নদীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। প্রবহমান ভবনদী পারাপারের জন্য সাঁকো বা সেতুর প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পিত হয়েছে চর্যাটিতে, কিন্তু তার নির্মাণকলা অতি সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য চর্যার মতোই পরিমিতিবোধের মধ্যে থেকেও বাস্তব প্রাকৃত বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা যায়নি। নির্মাণের কলাকৌশলে সেই প্রাকৃত বিজ্ঞান যেন ভর করেছে চাটিলপাদের এই চর্যাটিতে :

"ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু য়ান্তে চিখিল মঝেঁ ণ থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামীলোঅ নিভর তরই।।
ফাড়িয় মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ।।
... ...
জই তুম্হে হে লোঅ হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অণুত্তর স্বামী।।"[৫]

সাঁকোর নির্মাণ কৌশল আভাসে অভিব্যঞ্জিত হলেও তার প্রকাশ স্পষ্ট, যাকে অনায়াসে বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে অর্থাৎ বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত করা যায়। মোহমুক্ত হলেই যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব। স্থূলার্থের অভিব্যঞ্জিত চিত্রটি তারই দ্যোতক। গাছ থেকে তক্তা তৈরি করে এবং জোড়া লাগিয়ে সেতু নির্মাণ করতে পারলে তবেই নদী পারাপার সম্ভব, যে নদীর দু'প্রান্তে কর্দম এবং মাঝখানে গভীর স্রোত। জীবনসাধনার পথেও ব্যাপক বাধার কর্দম। গভীর সংসার নদীতে সাধন-ভজন তথা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সমস্তই ভেসে যাওয়াও স্বাভাবিক ব্যাপার। সেখানে মোহমুক্ত নির্বাণ সাধনাই মুক্তির একমাত্র পথ, যদিও সে-পথ গুরুবাদ নির্ভর।

২

চর্যাপদে যা ছিল অনুপস্থিত সেই দৈব নির্ভরতা এবং অলৌকিকত্ব এসে ভর করেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* থেকেই তার শুরু এবং আধুনিক সাহিত্যের প্রাক্কালে ভারতচন্দ্রে তার পরিসমাপ্তি। দেবনির্ভর এই যুগের সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলি সম্ভবত রোম্যান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত বলেই ব্যতিক্রম রূপেই চিহ্নিত হতে পারে—কিন্তু *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* এবং মঙ্গলকাব্য যা

পাঁচ-ছয় শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাঙালি জাতির মনোভূমিকে অধিকার করে রেখেছিল, তার মূল কথাই হল অলৌকিকবাদ। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিজ্ঞানও অলৌকিকতা মণ্ডিত। তাই সেখানে মাত্র কয়েক প্রহরের সাধনায় নির্মিত হয় লৌহবাসর, মুহূর্তমধ্যে রাত্রির সংক্ষিপ্ত অবসরেই প্রয়োজনভিত্তিক রথ নির্মিত হয় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নিপুণ হস্তে। আবার অরণ্যপ্রদেশে অলৌকিক চিত্র বিচিত্র শিল্পমণ্ডিত হয়ে দেবী চণ্ডীর কাঁচুলি নির্মিত হয় অসাধারণ তৎপরতায়। *'মনসামঙ্গল'*-এর চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী 'সপ্তডিঙা মধুকর' অবশ্যই অসাধারণ সমুদ্রপোত, অনুরূপ অর্ণবপোত নিয়েই ধনপতি সদাগর সিংহল যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত সমুদ্রপোতের নির্মাণকলা বা শিল্পসুষমার বিন্দুমাত্র কোনও বর্ণনা কোথাও উল্লেখিত হয়নি। চন্দ্রধরের সপ্তডিঙা মধুকরকে ছাপিয়ে গেছে হনুমানের প্রবল দাপাদাপি, আবার ধনপতির অর্ণবপোত ঢাকা পড়েছে কালীদহে আবির্ভূত কমলেকামিনী রূপের উদ্ভাসে। অলৌকিকত্ব অনুরূপ ভাবে অন্তরালে নিক্ষেপ করলেও অর্ণবপোত-রথ কিংবা লৌহবাসর নির্মাণের অন্তরালে যে কারুশিল্প বিদ্যমান ছিল সেই মধ্যযুগে তাকে কিন্তু কিছুতেই অন্তরালের বস্তু বলে মনে হয় না, সে যেন সে-যুগের প্রত্যক্ষ বাস্তুকলা বা শিল্পবিজ্ঞান। যদিও তা অলৌকিকত্বের মহিমামণ্ডিত। দেবশিল্পীর নৈপুণ্য সহযোগে পরিবেশিত।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মতে বাংলা মঙ্গলকাব্য সমূহ প্রকৃতপক্ষে লৌকিক পুরাণ। এই সুবাদেই বলা চলে ভারতীয় পুরাণ সদৃশ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাতেও বাংলা মঙ্গলকাব্য যেন তথাকথিত ভারতীয় পুরাণেরই বিকল্প হয়ে উঠেছে বঙ্গীয় লৌকিক জীবনে। ভারতীয় পুরাণের অনুরূপ সৃষ্টি কাহিনি দিয়ে মঙ্গলকাব্যেরও সৃষ্টিখণ্ড পরিকল্পিত। বিশ্বসৃষ্টির তথাকথিত অতিলৌকিক ভারতীয় দর্শন তারই মধ্যে অভিব্যক্ত। অবশ্যই তাকে তথাকথিত সৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা চলে। হিন্দুপুরাণের মতো অত ব্যাপক না-হলেও তারই নির্যাস নিয়েই যেন এই সৃষ্টিখণ্ডে আবশ্যিক বিবরণ প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই স্থান পায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী[৬] এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মতো মঙ্গলকাব্যের বিদগ্ধ কবিদের কাব্যে সৃষ্টিখণ্ড অনেকাংশে ভারতীয় পুরাণের অনুসরণেই বর্ণিত হয়েছে। দৃষ্টান্তক্রমে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের 'দেবখণ্ড'র 'সৃষ্টি-প্রকরণ' অধ্যায় থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। যেখানে তিনি অত্যন্ত অল্প কথায় চমৎকার সৃষ্টি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন :

"এক দেব নানা মূর্তি হৈলা মহাশয়। হেম হৈতে বস্তুত কুন্ডল ভিন্ন নয়।।
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান। রূপময় হৈল তথি তনয় 'মহান'।।
মহতের পুত্র হৈল নাম অহংকার। যাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার।।
অহংকার হইতে হৈল এই পঞ্চজন। পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন।।
এই পঞ্চজনে বলে পঞ্চভূত। ইহা হইতে প্রাণী বৃদ্ধি হৈলা বহুত।।
গুণভেদে এক দেব হইলা তিন জন। রজোগুণে হৈলা ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ।।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপ করেন পালন। তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ।।"[৭]

এই সৃষ্টি-প্রকরণ বা সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের *'অন্নদামঙ্গল'* কাব্যের 'গীতারম্ভ' অংশে বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

"অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।

অনির্ব্বাচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি।।
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি।।
বিনাচন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা।।
গুণ সত্ত্ব তমোরজে হরিহরকমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।
গুণবিধি হরিহর তিনজনে পরস্পর
করেন কারণ জলে জপ।।
তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।
পচা গন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে।।
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচা গন্ধে ভারি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা।।
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া।।
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে বসিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি দু'জনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা।।"[৮]

প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের একটি অনিবার্য ও অনতিক্রম্য বৈশিষ্ট্য হল এই সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *'মনসামঙ্গল'* কাব্যের 'সৃষ্টি-প্রকরণ' অংশটিও তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"প্রভুর আদেশ পায়্যা আনি দেবী মহামায়া
অবনীর করিল সৃজন।
এক দেব নানা মূর্ত্তি ত্রৈলোক্যে করিয়া স্থিতি
জন্মাইল তনয় মহান।।

মহাবল হৈল সুত অহঙ্কার নামযুত
অহঙ্কারে হৈল্ল পঞ্চজন।
অবনী উদক তেজে গগন পবন রাজে
পঞ্চভূতে প্রাণ নিয়োজন।।
তাহা হইতে প্রজা বৃদ্ধি হইল অনেক সিদ্ধি
গুণ ভেদে তিন অবতার।
সত্ত্বগুণে নারায়ণ রজগুণে পদ্মাসন
তমগুণে করেন সংহার।।"[৯]

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ, কিংবা তার পরেও রচিত হয়েছে অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য। যেগুলির মধ্যে হয়তো কবিদের বিজ্ঞানভাবনার পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে হলেও পাওয়া যাবে। যাইহোক, *'চণ্ডীমঙ্গল'*-এর বিশিষ্ট কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম সৃষ্ট চণ্ডীমঙ্গল-এর 'দেবখণ্ড'র 'ভৃগমুনির যজ্ঞারম্ভ' অংশে প্রচ্ছন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গ এইভাবে ধরা দেয় :

"মহিষে চাপিয়া আইলা চতুর্দশ যম। হরিণে আইলা ঊনপঞ্চাশ পবন।।
রাশিচক্রে চাপিয়া আইলা গ্রহগণ। রথে দশদিক্‌পাল কৈল আগমন।।"[১০]

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার বারমাস্যায় লক্ষণীয়ভাবে ফুটে ওঠে দারিদ্র্য পীড়িত পল্লিবাংলার নিখুঁত চিত্র; যার মধ্যে কবির বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি তথা দৃষ্টিভঙ্গিটিও বিশেষ লক্ষ করার বিষয়। 'ভেরণ্ডার খাম' বা থামের ওপরে নির্মিত কুটির বৈশাখের ঝড়ে প্রত্যহ ভাঙে। 'ফুল্লরার বার মাসের দুঃখ' অংশে ফুল্লরার কথায় :

"মাস মধ্যে মার্গ শীষ আপনি ভগবান। হাটে মাঠে গৃহ গোঠে সবাকার ধান।।
উদর ভরিয়া অন্ন দিল বিধি যদি। যম সম শীত তথি নিরমিল বিধি।...
মধুমাসে মলয় মারুত বহে মন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ..."[১১]

সমাজ অন্তর্গত মানুষ ও তার আচরণ-মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি ছাড়াও কীট-পতঙ্গের আচরণবিধির দিকটিও কবির সূক্ষ্ম প্রকৃতি ও প্রাণীবিজ্ঞানীসুলভ দৃষ্টিতে কীভাবে উঠে আসে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লিখিত চরণগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আবার একই নিসর্গবিজ্ঞান চিন্তনের অঙ্কুর *'মনসামঙ্গল'* কাব্যেও লক্ষ করা যায়। এই কাব্যের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ লৌহবাসর প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"হেন কালে বিশ্বমাতা বিশ্বকর্ম্মে কহে কথা
চাঁদ মোর রিপুর সমান।
তাহার আরতি পায়্যা সাঁতালি পর্ব্বতে গিয়া
তুমি কৈলে বাসর নির্ম্মাণ।।"[১২]

আধুনিক লৌহগৃহ নির্মাণের পশ্চাতে যে বিজ্ঞানভাবনা রয়েছে, 'বাসর নির্মাণ' যেন তারই প্রাক্কালীন উদাহরণ। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *'মনসামঙ্গলে'* বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাকালে দামোদরের পূর্বতন যাত্রাপথের অকৃত্রিম বর্ণনায় ভৌগোলিক বাস্তবতার বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় ফুটে ওঠে। আবার বেহুলা শাশুড়ির কাছে যখন ডোমিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করে ব্যজনী বিক্রি করতে এসেছে, তখন তার মুখে উচ্চারিত হয় অদ্ভুত ছলনাময়ীর এহেন বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা :

"আমার বিয়নী খানি লক্ষ তঙ্কা মূল। চাঁদ ঝলমল করে কণকের ফুল।।
মদন বসন্ত আইসে বিয়নীর বায়। নিদাঘের কালে লাগে সুশীল গায়।।"[১৩]

পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে প্রাচীন বাংলার অত্যন্ত শিল্পসুষমামণ্ডিত হস্তশিল্প-নিদর্শনের পরিচয় মূর্ত হয়ে ওঠে। বেহুলা সর্পাঘাতে মৃত স্বামীর প্রাণ ফেরানোর উদ্দেশ্যে যেভাবে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছিল, সেই যাত্রার আয়োজনে বা প্রস্তুতিতে জলে ভেসে যাওয়ার উপযুক্ত যে বিজ্ঞানভাবনা ছিল, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কবির ভাষায় তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে :

"ঘাটিলুঁ দেবীর পায় কি বিধি লিখিল তায়
আমার কপালে কদাচিত।
কলার মান্দাসখানি মোরে গড়্যা দেহ আনি
তবে সে আমার কর হিত।।
নানা পরিবন্ধ করি বাঁশের গজাল মারি
সাজাইল কলার মান্দাস।
মান্দাস ভাসিল জলে মনসার পদতলে
বিরচিল কেতকার দাস।।"[১৪]

বেহুলার এই যাত্রাকালের পুর্বে তার নির্দেশ ছিল :

"কড়ার তৈলেতে দীপ ছ'মাস জ্বলিবে। তবে সে জানিবে মনে লখীন্দর জীবে।।
সিজানা ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে। মরা পুত্র জীয়ন্ত বসিয়া পাবে ঘরে।।
প্রভুর ব্যঞ্জন অন্ন পুরি হেম থালে। পুঁতিয়া রাখিল লয়্যা দাড়িম্বের তলে।।"[১৫]

অর্থাৎ অন্নগ্রহণের এ হেন কৌশল বা প্রক্রিয়াটি আপাত অনুপযুক্ত মনে হলেও একটি বাস্তবসম্মত চিন্তাবিজ্ঞানও বটে।

ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যেও ভূগোল-বিজ্ঞানের ঈষৎ অনুষঙ্গ গভীর পর্যবেক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন 'সুরিক্ষার পালা'য় কবি লিখেছেন :

"কামেশ্বরী কাঙুরে আছে কামাখ্যাতে।
ধাতু কোথা বৈসে নারীর অষ্টাঙ্গ থাকিতে।।"[১৬]

বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কামাখ্যা পাহাড়ে পড়েছিল সতীর জননাঙ্গ—যা ক্রমে প্রস্তরীভূত হয়ে ধাতুতে রূপান্তরিত হয়েছিল; এখানে অবশ্যই ভুগোল-বিজ্ঞানের পরিচয় মেলে। এমনকি এই একই পালায় কবি সূর্য-দিন ও রাত্রি এবং মরুৎ বা বায়ুপ্রসঙ্গ এনেছেন; যেখানে একই সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পঞ্চতত্ত্ব রা সৃষ্টিতত্ত্ববিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় :

"সূর্য্য বলে তুমি বুদ্ধিতে হীন।
রাত্রিকালে বল করিতে দিন।।
আটদণ্ড রাত্রি এখন স্থিতি।
উদয় দিতে মোরে কহ মারুতি।।"[১৭]

মঙ্গলকাব্যে ভূগোল-বিজ্ঞান পরিলক্ষিত হয় ধনপতির সিংহলযাত্রায় ব্যাপকভাবে, চাঁদ

সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে এবং বেহুলার গাঙ্গিনীর জলে ভেসে যাওয়ার জলপথ বর্ণনায় আংশিকভাবে। যাইহোক *'চণ্ডীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল'* ও *'ধর্ম্মমঙ্গল'*-এর পর আমরা চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিষয়টিকে ভৌগোলিক বিজ্ঞানভাবনা প্রসঙ্গে সমধিক গুরুত্ব দিতে চাই। এই ভূগোল-বিজ্ঞান ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের 'মধ্যলীলা' পর্যায়ে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণভ্রমণের পর্যায়ক্রমিক সুবিন্যস্ত, সুবর্ণিত বিবরণ নানাভাবে ফুটে উঠেছে কবির বর্ণনায়, যা অন্যের মুখে শোনা নয়, প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে চৈতন্যের সাহচর্য পেয়েছিলেন এবং দক্ষিণ ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন সে-কথা সুকুমার সেন-এর নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য থেকেই স্পষ্টভাবে জানা যায় :

> চৈতন্য মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ফাল্গুন মাসে পুরীতে এলেন। সেখানে দু'মাস থেকে দক্ষিণ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে চাননি। নিত্যানন্দ প্রভু অনেক জেদ করে চৈতন্যের (ও তাঁর সঙ্গে আসা) সঙ্গে দিলেন কৃষ্ণ দাস নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে —
>
> "কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
> ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন।।
> জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
> যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে।।"[১৮]

'*শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*' গ্রন্থের 'মধ্যলীলা'র 'ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ'-এ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :

> "এইমত সার্ব্বভৌমেরে নিস্তার করিল।
> দক্ষিণগমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।।
> মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
> ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।।"[১৯]

দক্ষিণগমনে মহাপ্রভু যেভাবে মাস-তিথি-পক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করে মাঘ শুক্লপক্ষ নির্বাচন করেছিলেন তার মধ্যে দিয়ে অবধারিত ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিচয়টি গভীর প্রকট হয়ে ওঠে।

শ্রীচৈতন্যের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ *'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'*-এর 'মধ্যলীলা' পর্যায়ের 'ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ'-এ কবিকৃত বর্ণনায় জানা যায়---উৎকল দেশ থেকে আরম্ভ করে অন্ধ্রদেশের গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রীর সন্নিকটে অবস্থানকালে রায়রামানন্দের সঙ্গে পরকীয়া তত্ত্বের অলৌকিক ভাষ্য পাওয়া যায়। অতঃপর কেরালায় ভট্টমারীদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে পৌঁছেছিলেন গোয়ার পথে মহারাষ্ট্রে পান্ডারপুরে (পাণ্ডবপুর?), জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপের তিরোধান সংবাদ পেয়ে পর্যটন অসমাপ্ত রেখে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন পুরী। কিছুকাল পরে আবার গিয়েছিলেন উত্তরভারতে বৃন্দাবন পর্যন্ত। ঝারিখণ্ড দেশের অরণ্যপ্রদেশ পার হয়ে কাশী-প্রয়াগ ছুঁয়ে পৌঁছেছিলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের সমস্ত লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের মধ্যেও এই অঞ্চলের ভূগোল-বিজ্ঞানের একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর এই যাত্রাপথের দু'পাশের ভূগোল-প্রাকৃতিক নিসর্গ দৃশ্যের অন্তরালে হলেও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে বর্ণিত হয়েছে 'সপ্তম পরিচ্ছেদ'-এ। কবি লিখেছেন :

"দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন।।
সেইসব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল।।
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি।।"[২০]

মহাপ্রভু দক্ষিণগমনে 'সহস্র সহস্র তীর্থ' দর্শন করেছিলেন—আর এইভাবেই বাংলা কাব্যে ভূগোল-বিজ্ঞান অনুপ্রবেশ করেছে। এইসব তীর্থ দর্শনে গমন ও প্রত্যাবর্তনের পথে দক্ষিণ এবং বাম দিকের ভূগোল-বিজ্ঞানটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ভ্রমণপথের নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণটি কবি উল্লিখিত গ্রন্থের 'ষোড়শ পরিচ্ছেদ'-এ এইভাবে উপস্থাপন করেছেন :

"নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হৈল শতগুণ।।
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম হৈল ভ্রমে যবে বনে।।
অন্য দেশে প্রেম উথলে বৃন্দাবন থামে।
সাক্ষাৎ ভ্রমরে এবে সেই বৃন্দাবনে।।
প্রেমে গর গর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নানভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে।।
এইমত প্রেমে যাবৎ ভ্রমিলা বারো বন।
একত্রে লিখিল সব না যায় বর্ণন।।"[২১]

সবশেষে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে আমরা যেভাবে এতকাল বিজ্ঞান-অনির্ভর ভাবে গ্রহণ করেছি সেই পদ্ধতি সার্বিক সত্য নয়। বিজ্ঞানও সেখানে নানাভাবে ভর করেছে, কখনও বিক্ষিপ্তভাবে, আবার কখনও বা ব্যাপকভাবে। আমরা বলতে চাই আধুনিক যুগের পরিশীলিত যুক্তিবীদী বিজ্ঞানভাবনা হয়তো প্রাগাধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে সেইভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেনি; কিন্তু প্রাগাধুনিক যুগই যে পরবর্তী বিজ্ঞানচেতনার অর্ধস্ফুট বীজ ও সূত্র বহন করে বিজ্ঞানভাবনার প্রথম পথটি উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, এবিষয়ে কোনও দ্বিধার অবকাশ নেই। এই আলোচনায় সে-কথাই প্রমাণ করার সবিশেষ প্রয়াস করা হয়েছে!

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. চর্যাসংখ্যা ১, পদগুলি সুকুমার সেন-এর 'চর্যাগীতি পদাবলী' থেকে নেওয়া হয়েছে।
২. ঐ।
৩. চর্যা সংখ্যা ৪৬, পদটি ড. নির্মল দাশ-এর 'চর্যাগীতি পরিক্রমা' থেকে নেওয়া হয়েছে।
৪. চর্যা সংখ্যা ২৮।
৫. চর্যা সংখ্যা ৫।
৬. 'মুকুন্দরাম' কিংবা 'মুকুন্দ' সে-বিতর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বহীন।

৭. কবিকঙ্কন চণ্ডী।
৮. অন্নদামঙ্গল ১ম খণ্ড।
৯. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান'।
১০. কবিকঙ্কন চণ্ডী (আখেটিক খণ্ড)।
১১. ঐ।
১২. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান'।
১৩. ঐ।
১৪. ঐ।
১৫. ঐ।
১৬. ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'-এর 'পরিশিষ্ট' অংশের 'সুরিক্ষার পালা' (পৃ. ৭২১) থেকে নেওয়া হয়েছে।
১৭. ঐ, (পৃ. ৭২৯) থেকে গৃহীত হয়েছে।
১৮. সুকুমার সেন-এর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড)-এর 'চৈতন্যাবদান' (পৃ. ২৭৩-২৭৪) থেকে গৃহীত।
১৯. শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের 'মধ্যলীলা'র 'ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ' থেকে গৃহীত।
২০. ঐ, 'সপ্তম পরিচ্ছেদ' থেকে নেওয়া হয়েছে।
২১. ঐ, 'ষোড়শ পরিচ্ছেদ' থেকে গৃহীত।

আকর ও সহায়ক গ্রন্থ

১. চর্যাগীতি পদাবলী সুকুমার সেন, আনন্দ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬
২. চর্যাগীতি পরিক্রমা ড. নির্মল দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১১
৩. মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬১
৪. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৩
৫. বিজ্ঞানের কাব্যায়ন অমল কুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২০১০
৬. The Poetic experience of science Oneil Biswas, A writer's workshop Grey-bird Book, ২০০০.
৭. বিজ্ঞান সঙ্গ-অনুষঙ্গ শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, সূত্রধর, ২০১১
৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) সুকুমার সেন, আনন্দ, ২০১৩
৯. শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২

ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ : প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস

অনির্বাণ বসু

> ...১৯৯১ সালে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটবে সেটা দুনিয়ার সবচেয়ে নামজাদা ক্রেমলিনোলজিস্টরাও বলতে পারেনি। পৃথিবীকে বেশ কয়েকশো বার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দেওয়া যায় এরকম কয়েক হাজার নিউক্লিয়ার মিসাইল সাইলোতে ঘুমিয়ে থাকল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দেবার মতো বিশাল সামরিক বাহিনী, পুলিশ, কেজিবি, লক্ষ লক্ষ পার্টি সদস্য সব হয়ে গেল ঠুঁটো জগন্নাথ। ঘটনাটিকে আমরা বিশ্বের বৃহত্তম প্যারালিসিস বলে অভিহিত করতে পারি। ভলকোগনভের মতো ঐতিহাসিকরা পরে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু এই মহাপতনের ব্যাপারটা একমাত্র আঁচ করা যায় সাহিত্যে—বুলগাকভ, গ্রসম্যান, লেভ আনাতোল থেকে সলঝেনিৎসিন হয়ে অনেকের লেখায়। হয়তো সরাসরি বলা হয়নি, কিন্তু ছিল—একটা সম্ভাবনা, একটা ধরতাই বা তার আদল। সাহিত্যই পারে।...[১]

আক্ষরিকতাতেই সত্য : একমাত্র সাহিত্যই পারে। শুধুই ভবিষ্যতের আগাম খোঁজ দিতে নয়; বিস্মরণের বিস্ফোরণে চাপা পড়ে বেমালুম ফসিল-বনে-যাওয়া কিছু স্বপ্নকে বিরুদ্ধ বাস্তবের অগণন প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে সাহিত্য। কোথাও সম্ভাব্য সত্য ধ্বস্ত হয় এবং তার বদলে নতুন এক সত্য জেগে ওঠে, যা ভয়ংকর হলেও সত্য; অনভিপ্রেত হলেও সত্য; অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সত্য। যা সম্ভাবনা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, অভিপ্রেত ছিল, এমন-কি, যুক্তিযুক্ত ছিল—তার কথা মনে না-রাখলে সর্বনাশ ও সময়নাশের কাহিনিও মানবসত্য হয়ে ওঠে না।

১৯৯১-২০১০। এই সময়ের ঐতিহাসিক দলিলের সূচিপত্রে প্রথম অধ্যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলতে-থাকা বহুচর্চিত ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান। সারা পৃথিবীর কাছে আমেরিকার অবাধ আত্মপ্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে। যে-সাম্রাজ্যবাদ তার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রথমেই তার বিষদাঁত বা আস্তিনের তলায় লুকিয়ে-রাখা বাঘনখ বের করে না। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে এসে পড়ল এক নতুন শব্দ : বিশ্বায়ন। ২৪ জুলাই ১৯৯১, নরসিংহ রাও-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ থাকল বামফ্রন্ট সরকারের শাসন। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে ১৯৯৮ সালে কংগ্রেসের একাংশ পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পার্টি গঠন করলেন। জন্ম হল সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেসের।

বিশ্বায়ন-উত্তর এক নতুন প্রজন্ম, এক অস্থির সময়ের সন্ততি, যারা চোখ মেলেই দেখেছিল ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি; ব্যক্তিগত সবকিছুকে পণ্যে পালটে ফেলছিল চুপিসাড়ে। স্বপ্নবাসর নির্মাণ অসম্ভব সে-দিন; সেই ভাঙা স্বপ্নের হাটে ইতিউতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, মানুষের সনাতন মূল্যবোধগুলির মনোহারী বিপণি। জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা বলার দিন শেষ। দূরের আকাশ আর দূরতর আকাশরেখার কোণে জেগে-থাকা সাঁঝবাতির সাথে চুপিচুপি মনখারাপের গল্প-বলার দিনও ফুরিয়ে

এল দেখতে-দেখতে। দিনের আলো নিভে গেলে এই চেনা শহর জ্বলে-ওঠা নিয়ন আলোয় অচেনা আলেয়া হয়ে গেল। বদলে গেল চেনা মানুষের চেনা মেলামেশার ঢং, বদলে গেল অলি-গলির শিরা-উপশিরা। তখন কত মানুষের ভিড়ে কতরকমের কথকতা, কেনাকাটা, ক্যাকোফনি, কান্না-হাসির দোল-দোলানো নৈমিত্তিক পৌষ-ফাগুন। কত আনাড়ি উচ্ছ্বাস আর সেয়ানা সফলতা নিয়ে কাড়াকাড়ির ভূত চতুর্দশী। মিটিং-মিছিল; মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের দশটা-পাঁচটা। তারপর তার অন্তর জুড়ে থেকে গেল শুধুই অন্তর্দাহ। কিংবা নিছকই অন্তর্ধানের ইচ্ছা। নাগরিক রাত নিজেকে লাগসই করে নিল একঘেয়ে এক ক্লান্ত রুটিনে। একান্ত কথা; কথনের আগেই দিকভ্রান্ত হয়ে গেল। চোখের আড়ে-অপাঙ্গে গোপন হয়ে থাকল; অথবা বদলে গেল দেখনদারি জৌলুশে, বা অতিকথনের নেশায় রঙিন জাঁহাবাজিতে। হারিয়ে গেল জনঅরণ্যে। যৌথখামারের স্বপ্নের রাজপাট পলকে পালটে গেল পশুখামারের দুঃস্বপ্নের খোঁয়াড়িতে।

দুই

আপাত নিস্তরঙ্গ, প্রকৃত প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ এই সমকালের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্ঘাত, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ—সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সত্ত্বেও একের-পর-এক নির্বাচনী লড়াই জিতে সরকারে থেকে-যাওয়া ভিতরে-ভিতরে শাসকদলের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ক্রমশ অসহিষ্ণু করে তোলে মানুষকে। এই বিরুদ্ধাচারণ থেকেই রমানাথ রায় লেখেন *মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী*। আমাদের সাধের পশ্চিমবাংলা, তাকে শোষণ করে কীভাবে কোনো-কোনো বিশেষ আঙুল; ফুলে-ফেঁপে কলাগাছ হয়, এ-উপন্যাস তাই-ই দেখায়। খামখেয়ালি মুখ্যমন্ত্রীর তোয়াজ পেতে পর্যটন-মন্ত্রীর চূড়ান্ত মেরুদণ্ডহীনতা কল্লোলিনী কলকাতাকে ক্রমশ ঠেলে দেয় নিষ্প্রাণ নিথর মরুভূমির দিকে। এই লেখকের *কর্ণকাহিনী* বা শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের *চার পাই ভাই ভাই* (যে-উপন্যাসটিকে লেখক জর্জ অরওয়েল-এর *অ্যানিমেল ফার্ম* উপন্যাসের প্রচ্ছায়া বলে মনে করেন) উপন্যাসেও কোনো বাস্তব ঘটনার ভিত্তি নেই। বিপরীতে মুখোশের আড়ালে আছে সমকালীন মন্ত্রীদের বুদ্ধিহীনতা, অসাড়ত্ব আর ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পুলিশ যখন মানুষ শিকার করে, তখনই, প্রয়োজন পড়ে বেশ-বদলের। আমাদের মনে পড়বে গত শতকের সাতের দশকে শংকর বসু বা স্বর্ণ মিত্রের কথা[২]। ফলত সাবধানী সতর্কতায় মুখ হয়ে যায় মুখোশ—নাম যেমন অনেকক্ষেত্রেই ছদ্মনাম হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকেরা সচেতনভাবেই খোঁজেন অবগুণ্ঠনের আড়াল। সকলের অলক্ষ্যে, চুপিসাড়ে, মুখ থেকে মুখে—বুক থেকে বুকে—গোপনে পাচার হয়ে যায় বিপ্লবের নিষিদ্ধ ইশ্‌তেহার।

মানবসমাজের কাছে যা বিপর্যয়ের সূচক, তা দেখে আমরা বারবার হতচকিত হই, স্তম্ভিত হই, তবু করে উঠতে পারি না কিছুই। রাম-জন্মভূমির ভূত যখন সারা দেশে দাঙ্গা ছড়িয়ে দিল, দেশের মধ্যে থেকেও বাম শাসনে থাকার সুবাদে আমরা যে সুরক্ষিত ছিলাম, তেমনটাই জানালেন 'স্পষ্টবাদিতা'র কারণে বিখ্যাত সাহিত্যিক-কলমচি[৩]। একদিকে যখন দৈনিক সংবাদপত্রে চলছিল মায়াজাল-রচনা, তখন অন্য সূত্র জানাচ্ছে : পশ্চিমবঙ্গে মৃতের সংখ্যা ৩২। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদীদের আত্মসন্তুষ্টি, আশাবাদী সরকারের কার্ফ্যু-তুলে-নেওয়া (৯ ডিসেম্বর ১৯৯২) যে এই দাঙ্গাকে আরও ব্যাপক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল, উঠে আসছে সে-অভিযোগও[৪]। তবে সাম্প্রদায়িক বীজ যে সে-দিনের জলবায়ুতে মিশেছিল, *মৃগয়া* উপন্যাসের ঘটনা থেকেও সে-আঁচ পেতে অসুবিধা হয় না :

> বাবরি মসজিদটা ভেঙে দেবার পর যখন দাঙ্গা লেগে গেল এখানে-ওখানে, চন্দন একটা গান বেঁধেছিল। মৌলবাদকে চাবুক মেরেছিল সেই গানে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথাও ছিল। বাঙালি কলোনির লোকজন সেই গান শুনে ক্ষেপে ফায়ার। বলে, শালা, অদের লগে ভিটামাটি ছাইরা সর্বস্বান্ত হইসি, মনে নাই? সম্প্রীতি! কাঁসাকলা!... মকবুল শেখ কস্মিন-কালেও নামাজ পড়ে না। রোজা করে না। এতদিন তেমন গা করেনি কেউ। ইদানীং তার ওপরেও চাপ আসছিল ঘনঘন। সক্কলে পইড়ছে, তুমি ক্যানে পইড়বে নাই বটে?... তুয়াদ্যার পার্টির বড় বড় নেতারা যিখানে ধুম ধাম কইরে রটন্তীকালীর পূজা কইর্ছে, পাঁঠাবলি দিচ্ছে, অষ্টপ্রহরের থানে গিয়ে গপাগপ ভোগ খাচ্ছে, সিখেনে, মুসলমানের বাচ্চা হইয়েঁ, তুই ক্যানে নামাজ পইড়বি নাই, রোজা কইর্বি নাই,... নামাজ যেদি নাই পইড়্বি তো তুই হিন্দু পাড়ায় গিয়ে বসতি কর্।...[৫]

বেশ বোঝা যায়, গলদটা আদতে গোড়াতেই। অন্ধকার; প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদীপের তলায়। ক্ষমতার মোহে, আসক্তির অবাধ্যতায় ছিদ্রপথে শাসকদলের অন্দরে যে বেনোজলের অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়েছিল একটা সময়, তা আজ আমাদের জানা। নগর পুড়লে যেমন দেবালয়েরও নিস্তার মেলে না, তেমনই বাম আমলের গর্বের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও রেহাই পায় না। বেনোজলের বেনিয়াবাজি শুরু হয় সেখানেও। *মৃগয়া*-তে বাঁশি বাউরির পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া সেই বাস্তবতাকেই বৈধতা দেয়। সোহারাব হোসেনের *মাঠ জাদু জানে* উপন্যাসেও এই পঞ্চায়েতি দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে কাহিনি ক্রমে এসে পৌঁছোয় অনতি অতীতের জমি-অধিগ্রহণের জটাজালে। *জাগরণ* উপন্যাসে দেবব্রত সিংহ তুলে ধরেন সর্বশিক্ষা অভিযানের নামে শাসকদলের লুঠেপুটে খাওয়ার অশ্লীল চড়ুইভাতি। এই অপসংস্কৃতি একটা সময় আছড়ে পড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও। শিক্ষাঙ্গণও ক্রমশ রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়ে যায়। সেই সমীকরণকে সামনে রেখেই সাধন চট্টোপাধ্যায় লেখেন *তেঁতুল পাতার ঝোল*। চাকরিজীবনে শাসকদলের পার্টিফান্ডে চাঁদা না-দেওয়ার 'অপরাধে' পেনসন আটকে যায় অবিনাশবাবুর।

প্রতিটি সরকারি অফিসে শিকেয় ওঠে কর্ম-সংস্কৃতি। পদমর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে চলতে থাকে চোরাগোপ্তা দুর্নীতি। নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় *হে প্রেম* উপন্যাসে দেখান, দুই স্কুলশিক্ষকের একযোগে শংসাপত্র জালের কারসাজি। বোঝা যায়, রাজনীতি ক্রমেই মানুষের মুনাফা-লোটার সুপারলোটোয় পরিণত হচ্ছিল। হারিয়ে যাচ্ছিল আমাদের এতদিনকার লালিত বিশ্বাস আর পালিত ন্যায়-অন্যায় বোধগুলো। তাই *যুদ্ধ পরিস্থিতি*-র রণজয়ের হাহাকার প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে দেওয়াল থেকে দেওয়ালে—কার্নিশ থেকে কার্নিশে :

> ...আমরা পেটিবুর্জোয়া কমরেড। ভুল আমাদের হতেই পারে। কিন্তু রাইফেলের ওপর বাড়ি উঠে যাওয়ার ভুলটা কার? রাইফেলের ওপর বাড়ি উঠে গেছে![৬]

পাইয়ে-দেওয়ার-খেলায় ইদানীং মিলিজুলি সরকারের যুগ। সকলেই প্রায় বুঝে গেল যে, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলে কোনো-না-কোনো সময় দয়া হবে মা ভবানীর। আর তাই সেই সাধারণ মানুষটা, এতদিন যে ছিল সামান্য এক সমর্থক, শীঘ্রই অনুভব করল মিনি বিপ্লবের নিশ্চিন্ত আবহাওয়ায়, নিশ্চল থেকেও দলে নাম-লিখিয়ে পাওয়া সম্ভব আরও অধিক স্বচ্ছলতা। আর কোনো দলীয় সমর্থনটুকু না-রেখেও যাঁরা ছিলেন আজীবন বামপন্থা ও বিপ্লবের আদর্শে এককাট্টা—অভাবিত

উপায়ে অযাচিত আয়ে, ধীরে ধীরে মনের চোরা গলিঘুঁজিতে আরও সাফল্য কামনা করতে শুরু করলেন বামফ্রন্ট সরকারের। আটের দশকের শেষ থেকে পেতে শুরু-করা চোরা সুযোগ-সুবিধাগুলো যে অতি সম্প্রতি বুনিয়াদি হয়ে উঠবে, কেউ-কেউ হয়তো তেমনটাই ভেবেছিলেন। স্বভাবতই আদর্শ এবং সুবিধাবাদের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে—দেবাশিস চক্রবর্তীর *রাজনীতি, দলতন্ত্র ও অমিয়,* সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের *দেখে পার হবেন রাস্তা,* দেবব্রত মিত্রের *অশেষ গুপ্তর মৃত্যু চাই* এবং সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়ের *খাণ্ডবদাহন* তো নৈতিকতা আর নেমকহারামির সেই পারস্পরিক সংগ্রামেরই পরিণামী অবশেষ।

নকশাল আন্দোলন রাজনীতিতে মস্তানরাজের আমদানি করেছিল বলে কেউ-কেউ মনে করেন[৭]। '৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসবার পর কিছুদিন থিতিয়ে ছিল এই অসামাজিক কাজকর্মগুলো। কিন্তু অবিলম্বেই পুনর্মূষিকো ভব। তাই শেখর মুখোপাধ্যায়ের *অন্য কোনওখানে* উপন্যাসে দেখি, বাড়িওয়ালার ঝামেলা এড়াতে স্থানীয় রাজনৈতিক দাদার সাথে উটকো ভাব জমাতে হয় ইরাবতীকে। তিলোত্তমা মজুমদারের *রাজপাট* উপন্যাসে তাই নারী-পাচারের সাথে যুক্ত-থাকা সমাজবিরোধীরা শাসকদলের ছত্রতলে পুষ্ট হতে থাকে। এ-সবকিছুতে বীতশ্রদ্ধ সিদ্ধার্থ অতএব পালাতে চায়—হয়তো-বা নতুন এক লড়াইয়ে যোগ দিতে তার এই পলায়ন! ঠিক কী কারণে এবং কোথা থেকে এই পলায়ন? সহজ প্রশ্নের জানা-উত্তরেও কী যেন একটা অজানা কিছুর দ্বারা, হঠাৎই নস্যাৎ হয়ে যায় আমাদের প্রতিষ্ঠা-সাফল্য-অস্তিত্ব। তবে কি পালাতে চাই আমরাও? রণজয়দের না-থাকার সুযোগে রাইফেলের ওপর উঠে-যাওয়া ফ্ল্যাট বাড়িটার পাঁচতলার দখিনখোলা জানলার শার্সি ছুঁয়ে আমাদের শয়নকক্ষে ভেসে আসে না-তো কিছু প্রশ্ন; মধ্যযামের নিদ্রা হরণে!

তিন

এই বিশ বছরের টাইমস্প্যানে বাঙালি মধ্যবিত্তের বাইফোকাল লেন্স বড়ো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন দেখেনি। দেখার মধ্যে দেখেছে শুধু নানা ফর্ম্যাটের অনেকগুলো হ-য-ব-র-ল ভোট। এই সময়; অধিগ্রহণ-মার্কা কিছু ঝুটঝামেলা বাদ দিলে, মাইলের-পর-মাইল জুড়ে আপাতত শান্তিকল্যাণ। যদিও প্রকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। এক অনির্বাণ জতুঘরের ঘরে-বাইরে ছিল আমাদের প্রাত্যহিক চলাচল। এই সময়ের বাংলাভাষী বাণিজ্যিক ছায়াছবির খলচরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি সজাগ থাকলে বিষয়টি বুঝতে বিন্দুমাত্র সমস্যা হয় না। এতদিন বড়োলোক/স্মাগলার/অন্ধকার জগতের বাদশারা; নিদেনপক্ষে দুটো-একটা চুনোপুঁটি-গোছের মন্ত্রী—এই ছিল চলতি বাংলা সিনেমার খলচরিত্রের মূল ট্রেন্ড। ইত্যবসরে সেই আসন দখল করল লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। লোকাল কমিটিখানা যে কোন দলের, বলাই বাহুল্য, তা বোঝার জন্য মগজে সঞ্চিত প্রি-পেড পাণ্ডিত্যই যথেষ্ট।

অতএব ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলই। প্রয়োজন ছিল সে-জতুগৃহে অগ্নি-সংযোগের। দীর্ঘদিনকার অনভ্যাসে অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থাও যে তখন কাজে আসবে না, তা-ও জানা ছিল একপ্রকার। রাজ্য সরকার-কর্তৃক জমি-অধিগ্রহণ শুধু ঘৃতাহুতির কাজ করল। নিমেষে জ্বলে উঠল বারণাবত।

২০০৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে জিতে সপ্তমবারের জন্য রাজ্যে সরকার গঠন করে বামফ্রন্ট। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো শিল্পায়নের জন্য জমি-অধিগ্রহণে নামে সরকার। টাটা মোটরস-এর কারখানার জন্য স্থান হিসেবে মনোনীত হয় হুগলি জেলার সিঙ্গুর। জমি-দানে-অনিচ্ছুক কৃষকেরা

জোট বাঁধে। তাদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য সংগঠনগুলিকে নিয়ে একত্রে একটি প্যানেল গঠিত হয়। প্যানেলের পরামর্শ সরকার মানেনি। ২ ডিসেম্বর ২০০৬, সিঙ্গুরে চূড়ান্তভাবে জমি-অধিগ্রহণ করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬, অধিগৃহীত জমিতে ধর্ষিত ও নিহত হয় তাপসী মালিক।[৮]

এই জমি-অধিগ্রহণকেই উপন্যাসের বিষয় করেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য; তাঁর *আঁধারবেলা* উপন্যাসে। শিল্পের কারণে রুদ্রপুরের জমি; অধিগ্রহণের মর্মে নোটিশ দেয় সরকার। গোটা কর্মযজ্ঞকে ঘিরে শুরু হয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আখের গোছানোর কেরামতি। একদা রুদ্রপুরের বাসিন্দা প্রভাস এখন কলকাতায় থাকে। রুদ্রপুরে সাকুরা মোটরস-এর কারখানা হবে শুনে স্বপ্নের ঘুমঘোরে ডুবে যায় সে। কিন্তু অচিরেই ছিঁড়ে যায় সেই ইন্দ্রজাল। রুদ্রপুরের গরিব চাষিরা রুখে দাঁড়ায় জমি-অধিগ্রহণের সরকারি ফতোয়ার বিরুদ্ধে। তৈরি হয় কৃষিজমি রক্ষা কমিটি নামের সংগঠন। সরকারবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। প্রতিবাদের ব্যারিকেড ভাঙতে একটা সময় গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে মারা যায় এক দরিদ্র ভাগচাষি। আর কলকাতার বিলাসবহুল বাড়িতে টেলিভিশনের পর্দায় ব্রেকিং নিউজে চোখ রাখে মেট্রোপলিটন মন :

> ...সাকুরা মোটর্সের সীমানার মধ্যে এক তরুণীর মৃতদেহ...
> ...মৃতের নাম শ্যামলী দলুই। বাড়ি পরশমণি...
> ...তরুণীটি সম্ভবত গণধর্ষণের শিকার...[৯]

শ্যামলী মারা গেছে। তার মৃতশরীর জন্ম দিয়েছে আর-এক রক্তবীজের। আরও ব্যাপক হয়েছে আন্দোলন। কিন্তু আমরা জানি, সিঙ্গুর আন্দোলনে তাপসী মালিক মারা গেলেও পুলিশ সেখানে গুলি চালায়নি। পুলিশ গুলি চালিয়েছিল নন্দীগ্রামে (১৪ মার্চ ২০০৭)। সেই খণ্ডযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন চোদ্দো জন। তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি স্বতপ্রণোদিত হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন :

> The News of deaths by police firing in Nandigram this morning has filled me with a sense of cold horror. We will soon know more details of the sequence of events that led to this tragedy. But the point uppermost in my mind is not 'who started it', 'who provoked it' or whether there were agent-provocateurs behind it. Investigations will reveal that. The thought in my mind and of all sensitive people now is—Was this spilling of human blood not avoidable? What is the public purpose served by the use of force that we have witnessed today?[১০]

জমি নিয়ে এই বাজার-গরম-করা তরজা, পারস্পরিক চাপান-উতোর উঠে এসেছে কিন্নর রায়ের *ব্রহ্মকমল* বা *হননঋতু*, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের *বীরাসন*, সোহারাব হোসেনের *মাঠ জাদু জানে* উপন্যাসে।

চার

কিন্নর রায়ের *ব্রহ্মকমল* উপন্যাসের সূত্র ধরে এসে পড়ে মাওবাদী অনুষঙ্গ। খতরনাক সত্তরের পর আবারও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি। শাসকদলের নাগাড়ে ক্ষমতায় থেকে-যাওয়া এবং দীর্ঘকালীন অনুন্নয়ন এই সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল কিছুটা হলেও। সিস্টেমের ভিতরে থেকে

সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল *রাজপাট*-এর সিদ্ধার্থ। শেষপর্যন্ত সে-ও সিস্টেমেরই শিকার হয়ে পড়ে। অথচ মনের ভিতর ছাইচাপা আগুন নেভে না। তাই উপন্যাসের শেষে এই প্রতিবাদী যুবা নাম লেখায় রাষ্ট্রদ্রোহীর তালিকায়—শুরু হয় তার আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন। মণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের *তেজহ* উপন্যাসেও দেখি, স্থানীয় রাজনীতির কবল থেকে বাঁচতে বয়ঃসন্ধির এক কিশোর পাকে-চক্রে পৌঁছে যায় মাওবাদীদের ক্যাম্প অফিসে। এরই পাশে সাতের দশকের নকশালদের কাছে অক্সিজেন নিয়ে আসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)। তাই *হে প্রেম* উপন্যাসে প্রাক্তন নকশাল শিলাদিত্য কলকাতায় থেকে মাওবাদীদের লিংকম্যান হিসেবে কাজ করে এবং শেষে বাঁকুড়ায় যৌথবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়।

মাওবাদী সমস্যাই শুধু নয়, এই সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও ক্রমশ দানা বাঁধছিল। তা দমন করতে রাষ্ট্র হাজির হয়েছে তার অক্ষরসর্বস্ব আইন আর অস্ত্রসর্বস্ব শাসন নিয়ে। বিপরীতে ম্যালিগন্যান্টের মতো দ্রুত ছড়িয়েছে এ-কে-ফরটিসেভেন, এ-কে-ফিফটিসিক্স, কার্বাইনের হাত-বদল। সমরেশ মজুমদার এই বিষয়কেই উপন্যাসে এনে ফেলেন *অগ্নিরথ বা ঠিকানা ভারতবর্ষ*-এর মতো উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে।

অগ্নিরথ পাহাড় বনাম সমতলের মধ্যে জাতিসত্তার লড়াইকে নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস। প্রতি মুহূর্তে সেখানে বন্‌ধের চোখরাঙানি। 'নিরাময়' যেখানে সেবার প্রদীপ হাতে উপস্থিত, সেই দার্জিলিংয়ের; পাহাড়ের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও কাজ শুরু করেছিল এলিজাবেথ। তাকেই একদিন নগ্ন করে চরম অপমান করে জিপে চড়ে-আসা চারজন উদভ্রান্ত আন্দোলনকারী। আর সমরেশ শুধু লেখেন :

> নিরাপদে ফিরে গিয়ে ছেলে চারটে মশগুল ছিল। ছিনতাই করা একটা জিপ তাদের আড়াল করতে অনেক গল্প সাজাবে। ওরা কেউ পেছনে তাকায়নি তাই অগ্নিরথ দেখতে পায়নি। ওরা কেউ সামনে তাকাবে না তাই লক্ষ লক্ষ অগ্নিরথের অস্তিত্ব টের পাবে না।[১১]

আগামী তার রং-তুলি দিয়ে সাদা ক্যানভাসকে শ্লোগানে-শ্লোগানে ছয়লাপ করে তুলবে, হয়তো-বা এই ভরসাতেই কাহিনির ইতি টানেন সমরেশ মজুমদার।

এই একই পথের সহযাত্রী তাঁর *ঠিকানা ভারতবর্ষ* উপন্যাসটি। একদিন রাত্রে দিশার হেল্‌থ্ সেন্টারে আসে একটি গুলিবিদ্ধ ছেলে। পরিচয় না-জানা ছেলেটির পা থেকে, ফোঁড়া-কাটার ছুরি দিয়ে প্রায় আদিম পদ্ধতিতে দিশা বের করে আনে বুলেটের অহংকার। ছেলেটির পরিচয় জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে, দিশাকে, ছেলেটিকে নিয়ে-আসা তার সাথী জবাব দেয় : 'ওর নাম স্বাধীনতা সৈনিক, ঠিকানা ভারতবর্ষ'[১২]। এরপর স্পটলাইট এসে পড়ে একান্তই দিশার উপর। তারপরে প্রশাসনিক অচলাবস্থা আর অমানবিকতাকেই তুলে ধরেন সমরেশ। উগ্রপন্থীদের সাহায্য করার অভিযোগে দিশার বাড়িতে পুলিশ এলে গ্রামের সাধারণ মানুষ এসে সমবেত হয়েছে তার বাড়ির সামনে। সার্কুলার মোতাবেক জমায়েত নয়; বিপরীতে স্থানিক অপশাসনের বিরুদ্ধে, ভালোবাসার জনের জন্য।

পাঁচ

কাগজে-কলমে, লিফলেটে-পোস্টারে; আমাদের সরকার ছিল আমাদের পাশে। দাম্পত্য ঝামেলা,

বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে বিবাদ, সালিশিসভার নামে তোলাবাজি—আমাদের সরকার ছিল আমাদের পাশে। শুধু আমরাই যেন দু-দণ্ডের শান্তি খুঁজে পেতে সরে যাচ্ছিলাম ক্রমশ। প্রতিশ্রুতির গ্যাস-বেলুনে বেঁধে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে মূল্যবৃদ্ধির আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে যুঝে উঠতে জনতা-মাত্রেই যখন নাজেহাল, বাজারের চালে-ডালে-তেলে-নুনে বা পেঁয়াজে—চুপিচুপি অবয়ব পাচ্ছিল আশাবাদী সরকারের নিহন্তারা।

আমাদের রাজ্য সে-দিন বিশ্ব-জোড়া যৌথখামারের স্বপ্নে বিভোর। বিশ্বকে যে কতভাবে জোড়া যায় এবং জোড়া হবে, তার এতটুকু ইঙ্গিত পেয়েও যদি সে-দিনের শহিদ; স্বপ্নাবিষ্ট কিছু প্রাণ অন্তত আরও কিছুদিন সামলে নিতেন নিজেদের, তাহলে অন্তত মিথ্যেকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যর্থ বিপ্লবকে মিথে পরিণত করে, মানুষকে রাজনৈতিক আত্মমৈথুনের অবসাদে আপ্লুত করে রাখার সুনিপুণ চক্রান্তের হাত থেকে নিস্তার পেলেও পেতে পারত সমসাময়িক কয়েক প্রজন্ম। কিন্তু জুতোয় পেরেক থাকার সত্য থেকে যে অব্যাহতি মেলে না কদাচ!

সাতাত্তরে বহু লড়াই-আন্দোলনের বামপন্থী ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মানুষ যে-দলের কাছে ভবিষ্যতের দুনিয়া-বদলের-স্বপ্নে ভরসা অর্পণ করল, তারা আগামী দিনে দুনিয়া-বদলের ভুবন-জোড়া-আয়োজনে চোখ-কান বন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, শুধু স্বপ্নগুলোর মানে; পালটে যেতে শুরু করল রোজ রাতে। যৌথখামারের জমিতে গজিয়ে উঠল শপিংমল। আদর্শের বুলি-কপচানো মুখগুলো বসে রইল টেলিভিশনের টক্-শো আলো করে। ঝান্ডা-ধরা কিছু হাত বদলে গেল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কম্পিউটারের কী-বোর্ডের ওপর ব্যস্ত হাতে, কিছু বা হয়ে গেল ডান্ডা-ধরা। বস্তি হারিয়ে গেল বহুতলের বহুমাত্রিক ছলনায়।

বাম আমলে আমাদের বিপ্লব ও আপস, আমাদের বিশ্বায়ন ও সমাজবাদ, আমাদের ঐতিহ্য ও উন্নয়ন, আমাদের কর্পোরেট ও রেডলাইট, আমাদের শপিংমল ও টাইমকল, আমাদের বাইপাস ও বেনিয়াটোলা, আমাদের কবিতা ও মিছিল, আমাদের আত্মঘাত ও নিয়ন রাত—সব কিছু নিয়েই বেঁচে ছিলাম আমরা। শুধু জানলা দিয়ে যে-টুকরো আকাশটা দেখা যায়, যে-আকাশ ঢেকে লাল পতাকা ওড়ার কথা ছিল, সেই লাল রং আরও গাঢ় হয়ে দেখা দিল—সে-লাল কিসান্ কেচ্ আপ, এভাররেডি আর কোকা-কোলার।

অন্ধ হলেও প্রলয় যে বন্ধ থাকে না!

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. নবারুণ ভট্টাচার্য, "পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট", *পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট*, কলকাতা : প্যাপিরাস, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭৬।

২. বিশ শতকের সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনের সময়ে প্রকৃত নামে অনেক লেখকই প্রকাশ্যে আসেননি বা কলমও ধরেননি। নিরাপত্তার কারণেই ছিল তাঁদের এই পদক্ষেপ। স্বর্ণ মিত্রের এবং শংকর বসুর প্রকৃত নাম যথাক্রমে উৎপলেন্দু চক্রবর্তী এবং রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. *আজকাল*-এ ১১.১১.২০০০ তারিখে "এখন জ্যোতিষ্ক" শিরোনামে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'মহাত্মা গান্ধিও কি সারাদেশের সর্বধর্ম ও সকল জাতি মানুষের নেতা হতে পেরেছিলেন? কলকাতায় বসেও তিনি দাঙ্গা থামাতে পারেননি। আর, ইন্দিরা গান্ধি নিহত হলেন, এমনকি একে একে বাবরি মসজিদের তিন-তিনটি গম্বুজও ভেঙে পড়ল—শুধু জ্যোতি বসুর পশ্চিমবঙ্গেই একটা লাশ পড়ল না! দেশনেতা কি হরলিক্স, যে লোকে এমনি এমনি খাবে?'

৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা,* কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ৪২।

৫. ভগীরথ মিশ্র, *মৃগয়া* (রাজ সংস্করণ), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ১০২১-২২।

৬. নবারুণ ভট্টাচার্য, *যুদ্ধ পরিস্থিতি,* হুগলী : সপ্তর্ষি প্রকাশন, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৫৮।

৭. মৃণাল সেন, *তৃতীয় ভুবন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৯৩-৯৪।

৮. তথ্য : স্বপনকান্তি ঘোষ (সম্পা.), "সিঙ্গুর", *রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস/নকশালবাড়ি থেকে নেতাইগ্রাম,* কলকাতা : পদাতিক, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১৭৯।

৯. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *আঁধারবেলা,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ১৮১।

১০. তথ্য : স্বপনকান্তি ঘোষ (সম্পা.), "নন্দীগ্রাম", *রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস/নকশালবাড়ি থেকে নেতাইগ্রাম,* কলকাতা : পদাতিক, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ২২১।

১১. সমরেশ মজুমদার, *অগ্নিরথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ৩৮৯।

১২. সমরেশ মজুমদার, *ঠিকানা ভারতবর্ষ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৫০।

উল্লেখপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১. কিন্নর রায়, *ব্রহ্মকমল,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯।

২. কিন্নর রায়, *হননঋতু,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১০।

৩. তিলোত্তমা মজুমদার, *রাজপাট,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।

৪. দেবব্রত মিত্র, *অশেষ গুপ্তর মৃত্যু চাই,* কোলকাতা : উবুদশ, ডিসেম্বর ২০০৯।

৫. দেবব্রত সিংহ, *জাগরণ,* কলকাতা : পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৯।

৬. দেবাশিস চক্রবর্তী, *রাজনীতি, দলতন্ত্র ও অমিয়,* কলকাতা : কবিতীর্থ, জানুয়ারি ২০১১।

৭. নবারুণ ভট্টাচার্য, *যুদ্ধ পরিস্থিতি,* হুগলী : সপ্তর্ষি প্রকাশন, এপ্রিল ২০০৭।

৮. নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, *হে প্রেম,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৮।

৯. ভগীরথ মিশ্র, *মৃগয়া,* রাজ সংস্করণ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১০. মণি বন্দ্যোপাধ্যায়, *তেজস,* কলকাতা : অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০১০।

১১. রমানাথ রায়, *কর্ণকাহিনী,* উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা : বাণীশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

১২. রমানাথ রায়, *মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,* উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা : বাণীশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

১৩. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, *চার পাই ভাই ভাই,* উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৯৬।

১৪. সমরেশ মজুমদার, *অগ্নিরথ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।

১৫. সমরেশ মজুমদার, *ঠিকানা ভারতবর্ষ,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৩।

১৬. সাধন চট্টোপাধ্যায়, *তেঁতুল পাতার ঝোল,* কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, ২০০৮।

১৭. সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *দেখে পার হবেন রাস্তা,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।

১৮. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *আঁধারবেলা,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১০।

১৯. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, *বীরাসন,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪১৫ ব.।

২০. সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, *খাণ্ডবদাহন,* কলকাতা : গুরুচণ্ডালি, জানুয়ারি ২০১৩।

২১. সোহারাব হোসেন, *মাঠ জাদু জানে,* অখণ্ড, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০১১।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অদ্রীশ বিশ্বাস (সম্পা.), *সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি,* কলকাতা : প্রতিভাস, ২০০৯।

২. অশোক মিত্র, *অনাবাসী পাখিরা ও অন্যান্য,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০২।

৩. অশোক মিত্র, *আত্মসমালোচনা,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৭।

৪. অশোক মিত্র, *আপিলা-চাপিলা,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।

৫. আজিজুল হক, *সোনায় মোড়া ভুলগুলি,* কলকাতা : আজকাল পাবলিশার্স, ২০০৩।

৬. আশিস ঘোষ, *বামচরিতমানস,* কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৮।

৭. দেবেশ রায়, *ব্যক্তিগত ও গোপন সব ফ্যাসিবাদ নিয়ে একটি বই,* কলকাতা : অবভাস, জানুয়ারি ২০০৬।

৮. নবারুণ ভট্টাচার্য, *পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট,* কলকাতা : প্যাপিরাস, জানুয়ারি ২০১০।

৯. প্রদীপ বসু, *রাজনীতির তত্ত্ব/তত্ত্বের রাজনীতি,* কলকাতা : চর্চাপদ, ২০১১।

১০. মৃণাল সেন, *তৃতীয় ভুবন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১১।

১১. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা,* কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২।

১২. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, *গদ্যসমগ্র,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : প্রতিভাস, মার্চ ২০০৩।

১৩. স্বপনকান্তি ঘোষ (সম্পা.), *রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস/নকশালবাড়ি থেকে নেতাইগ্রাম,* কলকাতা : পদাতিক, এপ্রিল ২০১১।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' : অরণ্য, আদিবাসী ও ভারতবর্ষ

ঋষিপ্রতিম ঘোষ

'আরণ্যক' (১৯৩৯)-এর অভিনবত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিগত কয়েক দশকে অজস্র রমণীয় উক্তিতে ভরে গেছে শ্রদ্ধেয় সমালোচকদের লেখনী।[১] কখনও এটিকে বলা হয়েছে 'অভিনব উপনিষদ', কখনও বা বিভূতিভূষণকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'মহীদাস আরণ্যক' বলে। আবার কেউ শুনেছেন এতে 'মানুষের বুকের কথা' অথবা মনে করা হয়েছে অরণ্যের কথা আর মানুষের কথা এখানে এক হয়ে গেছে। কিন্তু একটি মনোজ্ঞ আলোচনায়[২] রুশতী সেন দেখিয়েছেন 'আরণ্যক'-এ প্রকৃতির কাহিনি আর মানুষের কাহিনি সর্বদাই মিলতে পারেনি, যেটি-ই উপন্যাসটির মর্মকথা। সুতপা ভট্টাচার্য মনে করেছেন[৩] এখানে গল্পকথকের সোসিয়োগ্রাফিক বিবৃতির মধ্য দিয়ে বিহারের এমন একটি বৈষম্যপূর্ণ সমাজ-কাঠামো বাঙালিকে লেখক আগেই চিনিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে পরে বারবার ঘটে গেছে জাতিগত ঘাত-প্রতিঘাত। আমাদের মনে হয় এ সব কিছুর সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে আরেকটি দিক, এবং তা হল ভারতের আদিমতম জনগোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে লেখকের ক্রান্তদর্শী চিন্তাভাবনা। ভারতীয় সভ্যতা-সমাজ-সংস্কৃতির ধারায় চিরউপেক্ষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও মূলগত সমস্যা, অরণ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আর উচ্চবর্ণের উন্নাসিক মানসপরম্পরায় বিদ্ধ উপজাতিদের সংকটকে চিহ্নিত করতে যেমন সক্ষম হয়েছেন বিভূতিভূষণ তেমনি উত্তরকালে ভারতবর্ষে আদিবাসীদের বিপন্ন অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় নির্ভুল অনুমান করে মহাশ্বেতা দেবী কিংবা নলিনী বেরা-র মতো কৃষ্ণ-ভারতের ইতিহাস রচয়িতাদের পূর্বসূরি হিসাবেও এখানে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'আরণ্যক' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'-তে কার্তিক ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ থেকে ফাল্গুন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ বিশ শতকের তিনের দশকের উপান্তে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এটির আবির্ভাব। বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসীদের প্রসঙ্গ উনিশ শতকে ক্ষীণভাবে ধরা দিয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবী-র (১৮৫৬-১৯৩২) 'মিবার রাজ' (১৮৮৭) কিংবা 'বিদ্রোহ' (১৮৯০)-তে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) 'পালামৌ'[৪] ভ্রমণকাহিনি হলেও গল্প বলার ঢঙে আরণ্যক মানুষদের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। অবশ্য শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) তাঁর কয়লাকুঠি বিষয়ক গল্পগুলিতে আদিবাসীদের বঞ্চিত জীবনের প্রথম বস্তুনিষ্ঠ চিত্রকর। কথাসাহিত্যের গণ্ডি ছাড়ালে দেখা যাবে উনিশ শতকে ইংরেজ লেখকরাই সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক অন্বেষণে আদিবাসীজীবনকে সর্বপ্রথম ধরতে চেয়েছেন 'Descriptive Ethnology of Bengal' (১৮৭২) কিংবা 'The Tribes and Castes of Bengal' (১৮৯১) এর মতো গ্রন্থগুলিতে। বিশ শতকে বাঙালি নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় (১৮৭১-১৯৪২) বিহার ও উড়িষ্যার আদিবাসীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেভাবে লেখনী ধারণ করেছিলেন তাও স্মরণযোগ্য। সাঁওতালদের নানাদিক নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দু-তিনটি দশকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাঙালি লেখকরা অনেকগুলি প্রবন্ধও লেখেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এ আদিবাসীদের সম্পর্কে এমন কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা চিন্তাভাবনা জেগে উঠেছে যার পূর্বসূত্র এইসব নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষা কিংবা কাল্পনিক ভাষ্য, বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ কিংবা রম্য ভ্রমণবৃত্তান্তে খুঁজে

পাওয়া যবে না; এর শিকড় প্রোথিত আছে পথিক-হৃদয় নিয়ে নিরন্তর অরণ্যসংলগ্ন আদিবাসী-জীবনকে দেখার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের স্বোপার্জিত জীবনবোধ থেকে জন্ম নেওয়া অন্তর্দৃষ্টির গভীরে।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে খেলাৎচন্দ্র ঘোষের ভাগলপুরস্থিত জঙ্গলমহালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে বিভূতিভূষণের থাকার সময়েই 'আরণ্যক'-এর বীজ উপ্ত হয়েছিল; কিন্তু তা অঙ্কুর থেকে মহীরূহে রূপান্তরিত হয় পরবর্তী একদশকেরও বেশি সময়কাল ধরে সিংভূম, নাগপুর, সম্বলপুর, ঘাটশিলা, গালুডি প্রভৃতি অঞ্চলে লেখকের ভ্রমণের সূত্রে। 'আরণ্যক'-এর ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট আর মানুষজন নির্মিত হয়েছে তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রের অভিজ্ঞতায় জন্ম নেওয়া বিভূতিভূষণের একাধিক অনুভূতি সমীকৃত হয়ে। উপন্যাসটির বীজস্বরূপ ভাগলপুরের সেই অরণ্যবাসের স্মৃতিচিত্র হল 'স্মৃতির রেখা' (১৯৪১) আর মহীরূহ হয়ে ওঠার পূর্বাভাস আছে লেখকের 'অভিযাত্রিক' (১৯৪১), 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪৩), 'ঊর্মিমুখর' (১৯৪৪), 'উৎকর্ণ' (১৯৪৬)-তে অথবা ১৯৩৩ বা ১৯৩৪ সালের ব্যক্তিগত দিনলিপিগুলিতে। 'স্মৃতির রেখা'য় আছে 'আরণ্যক'-এর প্রাথমিক পরিকল্পনার কথা 'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো'[৫]; ১৯৩৩ সালের দিনলিপিতে পাওয়া যাচ্ছে প্রস্তুতিপর্বের হদিশ—'বাসায় এসে জঙ্গল সম্বন্ধে বইটার 'Sketch' করলুম'[৬]; ১৯৩৪ সালে আছে এটির সূচনা করার আকাঙ্ক্ষা 'জঙ্গলের বই আরম্ভ করবো'[৭]; 'উৎকর্ণে' পাওয়া যাবে রচনার সংবাদ 'আরণ্যক-এর একটা অধ্যায় লিখচি'[৮]। অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে দীর্ঘসময়ব্যাপী 'আরণ্যক' সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে—

> "এগারো বছরের যাত্রাপথে সাহিত্যের কতশত উপকরণ বিভূতিভূষণ তাঁর ভ্রমণের অনুষঙ্গে তাঁর কল্পনার বৈভবে সঞ্চয় করেছেন; প্রকৃতি আর মানুষের ঘাত-প্রতিঘাতকে, সে বিনিময়ের অসংগতিকে, সাফ হয়ে যাওয়া জঙ্গলকে, আর সেই মরা জঙ্গলের কোনো যথার্থ বিকল্প থেকে বঞ্চিত তাঁর দেশের প্রান্তরকে পরম মমতার আর চরম যন্ত্রণার শিল্পে গাঁথবেন বলে।"[৯]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল 'আরণ্যক'-এ বর্ণিত একাধিক ঘটনা-চরিত্র-অনুভূতির পূর্বাভাস এইসব দিনলিপিগুলিতে থাকলেও আদিবাসী চরিত্র—দোবরুপান্না বা ভানুমতীর কোনো প্রত্যক্ষ পূর্বসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সমালোচকদের অনুমান "জঙ্গলমহালে থাকাকালীন বিভূতিভূষণ কোনো রাজগোঁড় নেতাকে দেখেননি। আগে পরের অভিজ্ঞতা, কিছু বা কল্পনা মিলে দোবরু পান্নার কাহিনীটি গড়ে উঠেছে।"[১০] আমাদের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতার সেই সঞ্চয় বা কল্পনার সেই জন্ম লেখকের জীবনের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাসূত্রে হয়নি, বরং অরণ্যসংলগ্ন আদিবাসীদের দেখার টুকরো টুকরো স্মৃতিমুহূর্ত একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে বিভূতিভূষণের মধ্যে একটা অখণ্ড প্রত্যয়ভূমি তৈরি করেছে যাতে আছে অত্যন্ত আধুনিক ইতিহাসচেতনা আর ভারতচেতনা থেকে উৎসারিত আদিবাসীচেতনা, যার প্রাসঙ্গিকতা আজও নিঃশেষিত হয়নি।

'স্মৃতির রেখা'-র কালপর্ব থেকে শুরু করে 'আরণ্যক' রচনার পূর্ববর্তী সময়ে অরণ্যময় পরিবেশে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ পরিচিত হয়েছিলেন সাঁওতাল, গোঁড়, মুন্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি বেশ কয়েকটি উপজাতির জীবনধারার সঙ্গে। অভিজ্ঞতা থেকে আদিবাসীদের সম্পর্কে লেখকের তৈরি হওয়া নিজস্ব চিন্তাভাবনার স্তরগুলিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে—

১. আদিবাসীদের জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা দারিদ্র্য আর অনাহার।

২. অরণ্যের কাঠ কাটাই আদিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। অর্থাৎ অরণ্যই তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। বিকল্প জীবিকা বলতে কয়লাখনিগুলিতে কুলিগিরি, বিচ্ছিন্নভাবে সামান্য কৃষিকার্য আর শিকার।

৩. আদিবাসী মেয়েরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং একধরনের সারল্য আছে তাদের। কাঠ কাটা ও তা বয়ে নিয়ে আসার মতো পরিশ্রমের কাজে তারাও অংশ নেয়।

৪. অরণ্য আদিবাসীদের ধাত্রী। তবু হাতি কিংবা বাঘের মতো বন্য জন্তুর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় তাদের, যার সম্পর্কে তারা অনেকটাই উদাসীন।

৫. অসহায় দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে মাঝেও নৃত্য ও গান করার আনন্দ থেকে আদিবাসীরা বঞ্চিত নয়।

৬. মাতৃভাষার পাশাপাশি বসবাসকরা অঞ্চলের মূলস্রোতের ভাষাতেও কথা বলতে অভ্যস্ত তারা। অর্থাৎ আদিবাসীরা দ্বি-ভাষী। (Bi-Lingual)

৭. কলকাতা শহর, আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে বিস্ময় আর অজস্র জিজ্ঞাসা আদিবাসীদের মনে।

উপরোক্ত আদিবাসীভাবনার সূত্রগুলিকে বিভূতিভূষণ ব্যবহার করেছেন 'আরণ্যক'-এ সত্যচরণের অভিজ্ঞতা মারফত। কিন্তু সাধারণ আদিবাসীদের থেকে স্বতন্ত্র দোবরু পান্না বীরবর্দীর রাজকীয় মর্যাদাবোধ, অতীত গণসংগ্রামে তার লড়াই, সারল্যের মাঝখানেও ভানুমতীর আভিজাত্য এবং ভারতীয় সভ্যতার আর্য-অনার্য সংঘাতের প্রেক্ষিতে আদিবাসী চরিত্রগুলিকে বিচার—প্রভৃতি দিকগুলি নিঃসন্দেহে উপন্যাসগত সংযোজন। ঔপন্যাসিক হিসাবে বিভূতিভূষণের আরোপিত এই বীক্ষাতেই ধরা আছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা।

আঠারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 'আরণ্যক'-এর যাবতীয় ঘটনা, চরিত্র, অনুভূতি কাহিনিকথক সত্যচরণের দ্বারাই উন্মোচিত হয়েছে। সত্যচরণকে লেখকের মানস-প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। সে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কলকাতার এক শিক্ষিত যুবক। যে নির্জন আরণ্যক পরিবেশ সত্যচরণের কাছে প্রথমে ছিল দুঃসহ পীড়ন, ধীরে ধীরে তাই হয়ে উঠেছে তার জীবনের আরাম। সত্যচরণ অরণ্য আর অরণ্যের দরিদ্র মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এমন এক ভারতবর্ষকে চিনেছে যা তার কাছে ছিল অজ্ঞাত—'মনে মনে ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনও কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।'[১১] সত্যচরণের সেই চেনা-শোনার পথে বিহারের বিশেষ এক সমাজ কাঠামোয় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা ধরা দিয়েছে। বন্য আদিম জাতি ছাড়াও যার মধ্যে আছে—গাঙ্গোতা, মৈথিল ব্রাহ্মণ, দোষাদ, ভুঁইহার ব্রাহ্মণ, রাজপুত মহাজন, নাচিয়ে, কাটুনী মজুর প্রভৃতি। উচ্চবর্ণের মানুষদের সম্পর্কে সত্যচরণের অভিজ্ঞতা তিক্ত, কিন্তু দরিদ্র সাধারণ মানুষ তার মনে রেখাপাত করেছে। সত্যচরণের এই অনুভূতি এক গভীরতর উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে আদিবাসী দোবরু পান্না বীরবর্দীর পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ে, যেখানে ধরা দিয়েছে ভারতীয় সভ্যতার মর্মসত্য—"আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত"।[১২]

উপন্যাসে অরণ্যসংলগ্ন অন্যান্য দরিদ্র যত শ্রেণির মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় তার মধ্যে আদিবাসী রাজগোঁড় পরিবারটি বিশেষ এক তাৎপর্যে সত্যচরণের দৃষ্টিপথে ধরা দিয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে, অর্থাৎ কাহিনির দীর্ঘ অগ্রগতির পর সত্যচরণের সঙ্গে দোবরু পান্না-ভানুমতীদের পরিচয়। তাদের সম্পর্কে উপন্যাসে দুটি বিপরীত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সত্যচরণ ও অন্যান্য চরিত্রসূত্রে; যার একটিতে আছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার মানসিকতা, আর অপরটিতে ইতিহাসচেতনার আলোকে সত্যদর্শনের অনুভব এবং কোথাও অতিমাত্রায় গৌরবানুভূতির আরোপ। দোবরু পান্নার সাথে সত্যচরণ দেখা করতে চাইলে সেই জঙ্গলের মালিকের কর্মচারী বুদ্ধু সিং বলেছে, "পাহাড়ী অসভ্য জাতদের রাজা, তাই বলে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী?"[১৩] প্রথম দর্শনে সত্যচরণ-ও দোবরু পান্নাকে ভেবেছে 'বৃদ্ধ সাঁওতাল কুলীর মতো'[১৪], ভানুমতীকে মনে হয়েছে তার 'হো কিংবা মুণ্ডা তরুণী'[১৫] বলে, এমনকি দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের রাজপ্রসাদকে 'সাপখোপের ও ভূতের আড্ডা'[১৬] ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি সে। শ্রাবণ-পূর্ণিমায় ঝুলনোৎসবে গিয়ে রাজু পাঁড়ের মতো নগণ্য মানুষকেও বলতে শোনা গেছে—"আমার যে কটা মহিষ আছে রাজার শুনলাম তাও নেই।"[১৭] মটুকনাথও বলেছে—"রাজা দেখছি আমার চেয়ে গরীব।"[১৮] পাশাপাশি আবার দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের বিশাল রাজত্ব, তির-ধনুক নিয়ে অতীতে মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই, আপাত অহংকারী আচরণের আড়ালে দোবরুর সরলতা, সাঁওতাল বিদ্রোহে দোবরুর গৌরবময় নেতৃত্বদান, তার আতিথ্যবোধ, সাধারণ আদিবাসীদের মতো মদ্যপান না করা—প্রভৃতি দিকগুলি উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভানুমতীর প্রীতিপূর্ণ আচরণে সত্যচরণ বুঝেছে—"বন্য অসভ্যতার এই দানের নিকট সভ্য সমাজের বহু সম্পদ... নিষ্প্রভ..."[১৯]। ভানুমতী ও তার সখীদের নৃত্যে 'আদিম ভারতের সে সংস্কৃতি যেন মূর্তিমতী'[২০] হয়ে উঠেছে সত্যচরণের কাছে। ভানুমতীকে সত্যচরণের অভিজাত বংশের মেয়ে বলে মনে হয়েছে।[২১] ভানুমতী-ও সত্যচরণকে বলেছে যে তারা রাজগোঁড়; বনের অন্য গোঁড়, সাঁওতালরা তাদের রাজা বলে মানে।[২২] এইভাবে অবহেলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে যেন সমস্ত তুচ্ছতার উর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

কাহিনিতে অন্যান্য উচ্চবর্ণীয়রা তাদের উন্নাসিকতা থেকে আদিবাসী চরিত্রগুলিকে যেভাবে দেখেছে, প্রকৃতপক্ষে তাই তৎকালীন ভারতের উপজাতিদের বাস্তব অবস্থা। একাধিক অরণ্যভ্রমণে দরিদ্র অসহায় সাঁওতাল, গোঁড়, মুন্ডা, ভূমিজদের এই অবস্থান-ই বিভূতিভূষণের চোখে ধরা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে একটি গোঁড় পরিবারের কথা আছে। তবু তাদের উপেক্ষা করে পৃথকভাবে 'রাজগোঁড়' নামাঙ্কিত অন্য একটি জনজাতিকে কেন কাহিনিতে নিয়ে আসা হল এবং বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের আরোপ করা হল তা আমাদের ভাবায়। রুশতী সেন লিখেছেন—

> "...গোঁড়রা অনার্য জাতি, তাদের মধ্যে যারা প্রধান অর্থাৎ সেনাপতিস্থানীয়, তারাই রাজগোঁড় (Risley, 1981. 292-8)। বিহারে ঠিক কোথায় গোঁড়, রাজগোঁড় ছিল, আদৌ ছিল কিনা তা খুব স্পষ্ট নয়। অন্তত ১৯১১-র 'ভাগলপুর' এবং 'পূর্ণিয়া গেজেটিয়ারে' গোঁড়দের উল্লেখ নেই।"[২৩]

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী হল গোন্ড বা গোঁড়। তারা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত[২৪]। 'ভারতকোষ' অনুসারে 'রাজগোন্ড' রা সাধারণ গোঁড়দের মতো নয়, তারা আচার-আচরণ ও জীবনযাপনে অনেকাংশে উচ্চবর্ণীয়দের মতো।[২৫] এ হেন রাজগোঁড়দের প্রসঙ্গ উপন্যাসে নিয়ে আসায় বিভূতিভূষণের আদিবাসীভাবনা বাস্তব সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে ঠিক-ই কিন্তু সামাজিক-

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মানসিক অবজ্ঞায় বিদ্ধ আর শোষণজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়া প্রতিবাদ-হীন ভারতীয় আদিবাসীদের নির্বিরোধ মৌনতার মাঝে উচ্চবর্ণের পক্ষ থেকে লেখকের নিঃশব্দ প্রতিবাদ এবং বিনম্র ক্ষমাপ্রার্থনা হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭)-এ বাঙালি চরিত্র অমূল্য আব্রাহাম-কে দিয়ে বলিয়েছিলেন—''আমি এই শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থার মানুষ। এই ব্যবস্থা আমাকে না-দেয় বেসিক হিউমান রাইট, না-শেখায় বিবেকবোধ।''[২৬] বিভূতিভূষণ অন্যভাবে ভারতের মূলস্রোতের সেই অপরাধকে স্বীকার করেছেন। আরণ্যক মানুষগুলির অসহায়তাকে প্রত্যক্ষ করে তাদের হয়ে কিছু বলার অভীপ্সাতেই হয়তো কাহিনিনির্মাণে এই অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের আদিবাসীচেতনা এখানে অনেকাংশেই ইতিহাসচেতনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আছে। ইতিহাসের প্রসঙ্গ 'আরণ্যক'-এ দুভাবে এসেছে; একদিকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাঁওতাল গণসংগ্রামে দোবরু পান্নার অংশগ্রহণের স্মৃতিতে, অন্যদিকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতায় অনার্য সংস্কৃতির অবদান এবং আর্য-অনার্য সংঘাতের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের এক বিরাট ট্র্যাজেডির ভাবনায়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে বাঙালির বিরূপতা কমতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজের আতঙ্ক' (১৩০০ বঙ্গাব্দ) নামক প্রবন্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কে ইংরেজদের মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে।[২৭] ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় লোকনাথ দত্তের সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কিত কাব্য—'সাঁওতাল কাহিনী (বনবীর গাথা)'। এর পরেও বাঙালি সাহিত্যিকদের বিষয়টি ভাবিয়েছে, এর প্রমাণ মন্মথ রায়ের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৫৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' (১৯৬৬), মহাশ্বেতা দেবীর 'হুলমাহা' (১৯৮২), কিংবা 'হুলমাহার মা' (১৯৮২) প্রভৃতি। যদিও 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কালটিও ভুল নির্দেশ করেছেন (বুদ্ধু সিং এর মুখ দিয়ে ১৮৬২ সাল বলিয়ে)। আসলে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৮৫৫) ছিল পীড়িত-বঞ্চিত আদিবাসীদের প্রথম ব্যাপক সমবেত মর্যাদার লড়াই যা শাসক ইংরেজকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। হয়তো এ কারণেই সেই গৌরবের অধ্যায়কে লেখক সংযুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট আদিবাসী চরিত্রটির সঙ্গে। অন্যদিকে সত্যচরণের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ ইতিহাসের মর্মন্তুদ সত্যে গভীর সহমর্মিতা ও ব্যথা অনুভব করেছেন এক পড়ন্ত বিকেলের হেলে পড়া রোদে দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে—

> ''ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এইসব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়।''[২৮]

লক্ষণীয়, বিভূতিভূষণ 'আদিবাসী' এবং 'অনার্য' বিষয় দুটিকে একাকার করে ফেলেছেন নিজস্ব ইতিহাসভাবনার আলোয়। লেখকের 'তৃণাঙ্কুর'-এ উল্লেখ আছে তিনি কখনও ভাবছেন ইতিহাস (History) পড়বেন,[২৯] কখনও চর্চা করবেন 'Historiography'।[৩০] আবার ১৯৩৩-এর ব্যক্তিগত দিনলিপিতে আছে[৩১] তিনি 'Prehistory' (প্রাগিতিহাস)-এর বই পড়ার জন্য নিয়ে এসেছেন। উড়িষ্যার সম্বলপুরের বিক্রমখোলে প্রাগৈতিহাসিক গুহালিপি দেখার অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যাচ্ছে 'তৃণাঙ্কুর'-এ।[৩২] 'আরণ্যক'-এ আছে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশ শতকের দুয়ের দশকের গোড়াতে হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার হয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম আর্যসভ্যতার মিথ—''এর আগে ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু হত ভারতীয় আর্য সভ্যতার

(Indo-Aryan Civilization) কথা দিয়ে। বলা হত, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসে অসভ্য ভারতবাসীকে সভ্য করেছে। বদলে গেল সে ইতিহাস। ... ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু হল এই হরপ্পা সভ্যতা দিয়ে"।[৩৩] নিঃসন্দেহে আদিম জনগোষ্ঠী হিসাবে আদিবাসীদের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি লেখকের সহমর্মিতা আর অন্তর্লীন চিন্তাভাবনার মূলে ইতিহাসের এইসব সত্যদৃষ্টি প্রেরণা জুগিয়েছে।

ইতিহাসের সত্যে কেবল অতীতেই থেমে থাকেননি বিভূতিভূষণ। তিনি দেখিয়েছেন বর্তমানকে; যেখানে আছে আদিবাসীদের চূড়ান্ত দারিদ্র্য, মহাজনী শোষণে নাজেহাল দৈন্যদশা আর নিরক্ষরতার মতো আরও অনেক অভিশাপ। দোবরু পান্নার মৃত্যুর পর ভানুমতীরা নিজেদের এক বিপন্ন বিশ্বের বাসিন্দা বলে মনে করতে থাকে। ভারতের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্নতাই আদিবাসীদের সমস্যার কারণ, এমন কোনো স্পষ্টরেখাঙ্কিত সিদ্ধান্তে বিভূতিভূষণ হয়তো পৌঁছোননি কিন্তু রেখে গেছেন কিছু ইঙ্গিত। উপন্যাসের শেষাংশে সত্যচরণের প্রশ্নের উত্তরে ভানুমতী জানিয়েছে সে কখনও শহর দেখেনি, ভারতবর্ষের নাম শোনেনি এবং জানেও না ভারতবর্ষের অবস্থান কোথায়। অথচ ইতিহাস বলছে বিশ শতকের তিনের দশক থেকে হিন্দু নেতৃত্ব নিজেদের সুবিধার্থে প্রচারপুস্তিকায় আদিবাসীদের হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করতে থাকে[৩৪]। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে আদিবাসীরা অংশগ্রহণও করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গান্ধি-রাজনীতি পূর্বভারতের আদিবাসীদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি, কেননা তা ছিল 'প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অনুসারী'।[৩৫] 'আরণ্যক'-এর ভানুমতী সেই ব্রাহ্মণ্য অহংকারে স্ফীত ভারতবর্ষে পরবাসী। এর দায় কেবল ঔপনিবেশিক শাসনের নয়, সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত ভারতবাসীরও। উপন্যাসে সত্যচরণ তাই "বুঝতে পারে যে সে এবং 'আরণ্যক'-এর নর-নারী এক দেশে থাকে না। 'আরণ্যক'-এর নর-নারী তার রচিত 'ভারতবর্ষ'-এর প্রতিবাদ"।[৩৬] এই সত্যোপলব্ধি কোনো তৈরি করা রাজনৈতিক তাত্ত্বিকতায় আচ্ছন্ন নয়, বরং তা লেখকের অভিজ্ঞতায় অর্জিত। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫)-এর সেই উদার, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের কথা যেখানে সমস্ত অবহেলিত শ্রেণিকে নিয়ে এক অখণ্ড ভারতবর্ষের ভাবনা ছিল। বিশেষ করে বিবেকানন্দের জীবনী পাঠে যখন জানা যায়[৩৭] ১৯০১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মঠের জঙ্গল সাফ ও জমি ভরাট করতে নিযুক্ত কয়েকজন দরিদ্র সাঁওতাল নর-নারীকে তিনি উপযুক্ত আহার করান এবং বলেন তাঁর নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল, তখন সত্যচরণের মারফত নিঃস্ব-রিক্ত সমস্ত প্রতিবেশী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি লেখকের অন্তরের ভাষা পড়া যায়, চেনা যায় তাঁর বৃহত্তর ভারতচেতনাকে।

উপন্যাসে দোবরু পান্না বীরবর্দীর পরিবারটিকে কেন্দ্র করে আদিবাসীজীবনের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক প্রভৃতির যে বিবরণ আছে তাতে আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত অভ্যাস সর্বদা যে মান্যতা পেয়েছে তা নয়। খাদ্য হিসাবে ভাত, মেটে আলু, বুনো ধুঁধুল, মাষকলাইয়ের ডাল, সজারু-হরিয়াল-বনমোরগের মাংস ইত্যাদি গ্রহণ কিংবা ভানুমতীর আদিবাসী রমণীসুলভ পোশাক ও ফুলের অলংকারের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ অরণ্যবাসীর বাস্তব জীবনের নিকটবর্তী, কিন্তু ঝুলনোৎসবে গিয়ে সত্যচরণ যখন দোবরু পান্নার কাছ থেকে জানে উৎসবের নৃত্য-গানের মাঝেও কেউ মহুয়ার মদ খায় না কিংবা বংশের মেয়েদের মদ্যপানের রেওয়াজ-ই নেই, তখন লেখকের আদিবাসীচেতনায় সংশয় জাগে। প্রায় সমকালেই সুবোধ ঘোষ লিখেছিলেন—

> "আদিবাসী সমাজের একটা মস্ত আচরণগত দোষ মদ্যপানের অভ্যাস। শুধু উৎসব রাত্রির মুহূর্তগুলিকে প্রগল্‌ভ করার জন্য নয়, প্রাত্যহিক জীবনেও মদের নেশা আদিবাসীকে গ্রাস করে বসে আছে। শুধু আদিবাসী পুরুষ নয়, মেয়েদের মধ্যেও এ নেশা সমানভাবে প্রবল।"[৩৮]

একালে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের মতো আদিবাসী-বিষয়ক গবেষকরাও সাঁওতাল বা সমগোত্রীয় আদিবাসীদের মধ্যে মহুয়ার মদ ও হাঁড়িয়ার অতিরিক্ত ব্যবহারকে তাদের অন্যতম সামাজিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর', 'উর্মিমুখর' প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনি প্রমাণ দেয় বিভূতিভূষণ আরণ্যক পরিবেশে একাধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। মদ্যপানের বিষয়টি লেখকের অজানা ছিল, এমন ধারণা করলে তাই সরলীকরণ হবে। আমাদের মনে হয় জীবনকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের কারণে এবং অবহেলিত সমগ্র অরণ্যবাসী জনগোষ্ঠীর নির্বিরোধ মৌনতার বিপরীতে দোবরু পান্নার পরিবারটিকে রাজকীয় মর্যাদায় গৌরবান্বিত করার অভিপ্রায়ে বিভূতিভূষণ তথ্যভিত্তিক বাস্তবতা থেকে সরে এসেছেন।

'আরণ্যক'-এ আদিবাসীদের অস্তিত্বের বিপন্নতাকে গোপন করা যায়নি। দোবরু পান্নাদের কুলদেবতা বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা 'টাঁড়বারো'-কে উপজাতি-জীবনের সেই অসহায়তার প্রতীক বলে মনে করা যেতে পারে। বিভূতিভূষণের ১৯৩৪ সালের ব্যক্তিগত দিনলিপিতে দুবার—২ ফেব্রুয়ারি ও ২১ ফেব্রুয়ারিতে টাঁড়বারোর প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে ওরাওঁগড় ও রানিঝর্ণায় ভ্রমণের সূত্রে[৩৯]। সাঁওতালি 'টান্ডি' থেকে আগত 'টাঁড়' শব্দটি মানভূম-ধলভূম অঞ্চলে অনুর্বর, শুষ্ক প্রস্তরময় প্রান্তর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'টাঁড়বারো' বলতে বোঝায় বনভূমির দেবতা বিশেষ বা বুনোমোষের রক্ষক দেবতা[৪০]। উপন্যাসে সত্যচরণ জেনেছে কীভাবে টাঁড়বারো অতিলৌকিকভাবে বন্যমহিষদের রক্ষা করে শিকারিদের হাত থেকে। কিন্তু অরণ্যের অধিবাসীদের গড়ে তোলা সেই মিথ ভেঙে যায় সত্যচরণের চোখের সামনে প্রকৃত বাস্তবের মাটিতে—

> "অনেক দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া একবার দেখিয়াছিলাম বড়বাজারে, জ্যৈষ্ঠমাসের ভীষণ গরমের দিনে এক পশ্চিমা গাড়োয়ান বিপুল বোঝাই গাড়ীর মহিষ দুটাকে প্রাণপণে চামড়ার পাঁচন দিয়া নির্মমভাবে মারিতেছে—সেই দিন মনে হইয়াছিল, হায় দেব টাঁড়বারো, এ তো ছোটনাগপুর কি মধ্যপ্রদেশের আরণ্যভূমি নয়, এখানে তোমার দয়ালু হস্ত এই নির্যাতিত পশুকে কি করিয়া রক্ষা করিবে এ বিংশ শতাব্দীর আর্য সভ্যতাদৃপ্ত কলিকাতা। এখানে বিজিত আদিম রাজা দোবরু পান্নার মতই তুমি অসহায়"।[৪১]

এইভাবে আদিবাসীদের নিজস্ব জগতে গড়ে ওঠা টাঁড়বারো-র অলৌকিক কথা নস্যাৎ হয়ে যায় সেই মানস-ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে সভ্য নাগরিকতায়; ঠিক যেমন আদিবাসী এবং তাদের সংস্কৃতি শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞা আর অস্বীকৃতিতে ভারতীয় সভ্যতার মূল কাঠামোয় স্থান পায় না।

'আরণ্যক' শুরু হয় সত্যচরণের অরণ্যনিধনের স্বকৃত অপরাধের কথা নিজের মুখে বলে পাপস্খালনের প্রস্তাবনায় আর শেষ হয় অরণ্যানীর আদিম দেবতাদের কাছে বিনম্র ক্ষমাপ্রার্থনায়। কিন্তু সত্যচরণের কৃতকর্ম যে আসলে ভ্রষ্ট সভ্যতার অবদান তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অরণ্য ও আদিবাসী—এই দুয়ের আত্মিক অভিন্নতা বিভূতিভূষণ উপলব্ধি করেছিলেন 'আরণ্যক' রচনার আগে

ও পরে বহুবার। 'বনে-পাহাড়ে' (১৯৪৫)-তে আরেকবার তাঁকে বলতে হয়েছে—"এই অরণ্যভূমি এদের মা;... একেই চেনে এরা।"[৪২] 'আরণ্যক'-এ দোবরু পান্না তৃপ্তির সুরে বলেছিল—"এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভালো।"[৪৩] কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুছে যায় নিশ্চিন্ত সেই আবাস, মরীচিকা বলে মনে হয় সঞ্জীবচন্দ্রকৃত সেই রমণীয় উক্তি 'বন্যেরা বনে সুন্দর'।[৪৪] সত্যচরণের যে বিশ্বাস "ভানুমতীর দেশের এ বন কেহ নষ্ট করিবে না"[৪৫]—তা তার স্বপ্নাতঙ্কের মতোই নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হয়েছে, যেখানে ভানুমতীদের 'মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি'[৪৬] করতে দেখে কয়েক বছর পর বিভূতিভূষণও বুঝেছেন "দেশের বন্যসম্পদ সব লুণ্ঠিত হচ্ছে।... আর বনভূমির আদিম অধিবাসী হো ও মুণ্ডারা কুলিগিরি করে দাসত্বের অন্ন ভোজন করচে মাত্র।"[৪৭] বিভূতিভূষণের উপলব্ধির সেই সত্যতা স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন দশক পরেও রয়ে গেছে বলেই হয়তো বিরসা মুন্ডার লড়াইকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবীকে লিখতে হয়, "অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ-ভারতের আদি অধিকার।"[৪৮]

নিঃসন্দেহে, তথ্য ও তত্ত্বের বিচারে আদিবাসী জীবনের সমস্ত সংবাদ 'আরণ্যক'-এ নেই; আর যেটুকু আছে সেখানেও সীমাবদ্ধতা আর অসংগতি ধরা পড়েছে। কিন্তু, ভানুমতী চরিত্রে প্রচলিত নায়িকার স্বভাব আরোপ, সাধারণ আদিবাসীদের ছেড়ে 'রাজগোঁড়' নামাঙ্কিত উপজাতিদের উপস্থাপনা—এই সমস্ত আপাত বিচ্যুতি সত্ত্বেও অরণ্য থেকে সমূলে উৎপাটিত আদিবাসীদের বিপন্ন অস্তিত্ব আর তাদের প্রতি উচ্চবর্ণীয়-অবহেলার চোরাস্রোতটিকে বিভূতিভূষণ চিনিয়ে দিতে পেরেছেন, কেননা 'বিভূতিভূষণের মতো সাহিত্যিকরা নিজের অজান্তেই সবচেয়ে কঠিন বাস্তবকে চেনেন আর চেনান।'[৪৯] আমরাও বুঝতে পারি ভারতীয় সভ্যতায় আর্যগৌরবের তলদেশে হারিয়ে যাওয়া অনার্য আদিবাসীদের টিকে থাকার ক্ষীণ স্পন্দন বর্তমানেও কীভাবে প্রতি মুহূর্তে বিঘ্নিত হচ্ছে অরণ্যনিধনের পাপচক্রে, যা ভবিষ্যতে হয়তো পৌঁছে দেবে তাদের শিকড়হীন বেঁচে থাকায়। প্রাচীন ভারতের বৈদিক 'আরণ্যক' অরণ্যলব্ধ জ্ঞানে আমাদের ঋদ্ধ করে ঔপনিষদীয় পরম স্বস্তির মন্ত্রে, কিন্তু আধুনিক ভারতের বিভূতিভূষণ কথিত 'আরণ্যক' আমাদের কানে কানে শুনিয়ে দেয় দেশের আদি বাসিন্দাদের স্বস্তিহীন বেঁচে থাকার কথা। একথা বললে হয়তো অনৃতভাষণ হবে না যে, বিভূতিভূষণ আদিবাসীদের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের অন্যতম ভাষ্যকার।

সূত্রনির্দেশ

১। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রন্থ পরিচয়', বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪০-৬৪১।

২। রুশতী সেন, "অরণ্যপদ ও মানবগাথা" (প্রবন্ধ), 'বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস', প্যাপিরাস, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৩), দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৮।

৩। সুতপা ভট্টাচার্য, "উপন্যাসের ছন্দ : 'আরণ্যক'" (প্রবন্ধ), 'কথাসাহিত্যের একলা পথিক-বিভূতিভূষণ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৫), পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১০।

৪। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'প্র-না-ব' ছদ্মনামে পৌষ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ থেকে ফাল্গুন ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ছয়টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়।

৫। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৯।
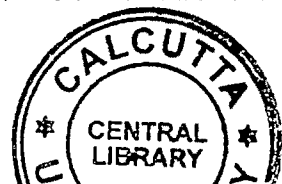
৬। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯।

৭। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৩৮।

৮। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৭।

৯। রুশতী সেন, 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ১৯৯৯, পৃ. ১১৮।

১০। পূর্বোক্ত "অরণ্যপদ ও মানবগাথা", 'বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস', পৃ,. ৩৭।

১১। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮১।

১২। ঐ, পৃ. ৯৬।

১৩। ঐ, পৃ. ৯১।

১৪। ঐ, পৃ. ৯৬।

১৫। তদেব

১৬। তদেব

১৭। ঐ, পৃ. ১১১

১৮। তদেব

১৯। তদেব

২০। ঐ, পৃ. ১১৩

২১। ঐ, পৃ. ১৪৭

২২। ঐ, পৃ. ১৫০

২৩। পূর্বোক্ত "অরণ্যপদ ও মানবগাথা", 'বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস', পৃ. ৩৭।

২৪। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ', দ্বিতীয় খণ্ড, পরিবেশক : সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ১১১

২৫। 'ভারতকোষ' (তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮০।

২৬। মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২৩৬।

২৭। রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), দ্বাদশ খণ্ড : প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৩৮-৮৩৯।

২৮। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

২৯। বিভূতি রচনাবলী-(জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৪।

৩০। ঐ, পৃ. ২৬৩।

৩১। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৪২

৩২। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৫

৩৩। প্রশান্ত প্রামাণিক, 'হরপ্পার অনার্য গরিমা', জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৪৭।

৩৪। শুচিব্রত সেন, 'পূর্বভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৭৪-৭৫।

৩৫। ঐ, পৃ. ৭৬

৩৬। শিশিরকুমার দাস, " 'আরণ্যক' : ভারতবর্ষ কোন দিকে", (প্রবন্ধ), 'বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা', (সম্পাদনা অরুণ সেন), সাহিত্য আকাদেমি, (প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭), দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ : ২০০৯, পৃ. ১১।

৩৭। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দ', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৪), ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬৩।

৩৮। সুবোধ ঘোষ, 'ভারতের আদিবাসী', ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, রথযাত্রা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৫।

৩৯। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৫০, ৭৬১

৪০। 'সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খন্ডী বাঙ্‌লার গ্রামীণ শব্দকোষ', (সংকলন ও সম্পাদনা সুধীরকুমার করণ), দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ২৯৯

৪১। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৯৭

৪২। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৮৯

৪৩। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৯৩

৪৪। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'পালামৌ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৬

৪৫। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৪৭

৪৬। তদেব

৪৭। পূর্বোক্ত বিভূতি রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭০২

৪৮। পূর্বোক্ত মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১২০

৪৯। পূর্বোক্ত "অরণ্যপদ ও মানবগাথা", 'বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস', পৃ. ৪৪।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ

কৃষ্ণা দাস

"বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।
মন বুঝিবারে বুঝি জানকী।
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ, দেখ দেখি।।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী নাহি জানায়ে আমায়।"[১]

—বঙ্গভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলে তিনি নির্দ্বিধায় বলবেন যে এটি কৃত্তিবাসের রচনা, অর্থাৎ কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে উদ্ধৃত। কৃত্তিবাস যে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় অনুবাদের কারণে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন তা তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর প্রকৃত রচনা কোনটি তা বোঝা আজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে গাওয়া হত এবং বিভিন্ন পালাকারগণ যে সেই সময়কার জনরুচির নিরিখে বিশেষ বিশেষ অংশ গাইতেন তা আমরা সকলেই জানি। কখনও পালাকারদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, কখনও বা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত লিপিকররা কৃত্তিবাসের প্রকৃত রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টি। ফলে যা হওয়ার তা হয়েছে। বিভিন্ন পুথি একত্রিত করলে একাধিক বৈচিত্র্য দৃশ্যমান হয়েছে। আর এর সূত্র ধরেই আধুনিককালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পাদনাকালে নানান বৈচিত্র্যের সুর বেরিয়ে এসেছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আংশিক মুদ্রণ সর্বপ্রথম দেখা যায় হ্যালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থে। আসলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে দেওয়ানি লাভ করে ১৭৬৫ খ্রি.। ফলে এদেশের শাসনকার্য সুলভে চালাবার জন্য শাসকগোষ্ঠী দারুণভাবে প্রয়োজন বোধ করেছিল এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার। আর এর জন্য ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচনা করলেন 'A Grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮ খ্রি.)। মোট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে তিনি বাংলা ব্যাকরণের পাঠ দেন এই গ্রন্থে। এতে তিনি যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছিলেন, তেমনি কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের পুথি থেকেও বেশ কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছিলেন। এই গ্রন্থটি কেবলমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম আংশিক মুদ্রণ হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর সঙ্গে সেই উদ্ধৃতাংশগুলির ইংরাজি অনুবাদের কারণেও প্রশংসনীয়। বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থে কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর পংক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে যা মনে রাখার মতো ঘটনা। হ্যালহেডের গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'Of Attributes and Relations'-এ উদ্ধৃত হয়েছে—

সুগ্রীব হইতে বালী রাজা অতি মহা বীর।
রঘুনাথের বানে তেহ হইন অস্থির।।

"Baalee Raajaa was a much greater hero than Soogreeb,
Yet even he was put to flight by the weapons of Roghoonath."[২] (যদ্দৃষ্টং)

এরপর ১৮০০ খ্রি. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হলে ক্রমে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ মুদ্রণের ধারা শুরু হয়। মুদ্রণের ইতিহাস কম-বেশি সকলের জানা, তাই আপাতত এই ক্ষুদ্র পরিসরে কেবলমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অভ্যন্তরে মুদ্রণবস্তু নিয়ে আলোচনা করছি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মোট সাতটি কাণ্ডই ১৮০২-০৩ খ্রি. মোট পাঁচটি খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডে আদিকাণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ড ও অরণ্যকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও সুন্দরকাণ্ড, চতুর্থ খণ্ডে লঙ্কাকাণ্ড ও পঞ্চম খণ্ডে উত্তরকাণ্ড মুদ্রিত হয়েছিল। প্রতিটি খণ্ডের সূচনায় দুটি করে নামপত্র ছিল। প্রথমে ইংরাজিতে, তারপর বাংলায়। লক্ষণীয়, ইংরাজি নামপত্রে 'বাল্মীকি' শব্দটি উল্লিখিত নয়। সেইসঙ্গে, 'বেঙ্গলি' শব্দটিও অনুপস্থিত। মহাকাব্যকে কেবল 'A POEM' বলে উল্লেখ করা আছে। ইংরাজি সাল হিসেবে ১৮০২ লেখা। কিন্তু ঠিক এরপরের পৃষ্ঠায় বাংলা নামপত্রে 'সংস্কৃত' শব্দ অনুপস্থিত। মোট 'পাঁচ খণ্ডে' লেখাটিও এখানে দৃশ্যমান নয় এবং সাল হিসেবে লেখা ১৮০৩। (১০×১৮) সেমি আয়তনের এই গ্রন্থগুলির প্রতিটির দু'টি নামপত্রের পরবর্তী পৃষ্ঠায় ডিম্বাকৃতি গোলকের মধ্যে তিনটি ভাষায় লেখা 'পুস্তক কলেজ ফোর্ট উলিয়ম'। আর এর পরবর্তী পৃষ্ঠা অর্থাৎ গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকে সূচিত হয়েছে কাব্য। তার আগে কোনও সূচিপত্র, ভূমিকা-জাতীয় কিছু নেই। প্রতিটি গ্রন্থে পৃষ্ঠার নীচে বা গ্রন্থের শেষে পাদটীকা, পাঠান্তর, নির্ঘণ্ট, শব্দার্থ কোনও কিছু দেওয়া নেই। কবি-পরিচিত বা কোনো চিত্রের কোনো প্রশ্নই নেই। যতিচিহ্ন হিসেবে কেবল এক দাঁড়ি (।) দেখা যায়। দু'লাইন পর একটি এক দাঁড়ি। পুথির মতো টানা লেখা কিন্তু নেই। অর্থাৎ দু'টি শব্দের মাঝে ফাঁক দৃশ্যমান। পদ্যাকারে কাব্য সজ্জিত, গদ্যের মতো টানা লেখা নয়, পরবর্তীকালে বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো। তবে কোনো শব্দের দ্বিত্ব-করণের জন্য সেই শব্দটি দু'বার না লিখে পুথির মতো পাশে দুই (২) সংখ্যাটি লেখা। একই পরিচ্ছেদে পয়ার ও ত্রিপদী উভয় প্রকার ছন্দ রয়েছে। দু'টি পরিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে দীর্ঘ ফাঁক ব্যবহার করার মাধ্যমে।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত পাঁচটি খণ্ডের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এতক্ষণ ধরে বলা হল। এবার প্রতিটি খণ্ডের পৃথক পৃথক যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা ব্যক্ত করা হচ্ছে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮। প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ক, খ, গ... চিহ্নিত। কিন্তু ঞ-র পর দেখা যায় আট পাতা অন্তর ট, তার চার পাতা অন্তর ট২। সম্ভবত পুঁথির পাতার কিছু অংশ পরে পাওয়া যাওয়ায় বা পুঁথির পাতা ওলট-পালট থাকায় ঐ নির্দিষ্ট স্থানে উপযুক্ত পৃষ্ঠা সন্নিবিষ্ট হবে বুঝে এই কৌশলে তা সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের সূচনায় রয়েছে—

'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।
অথ আদিকাণ্ড মতি লিখ্যতে।
গোলোক বৈকুণ্ঠ পুরী সভাকার পর
লক্ষ্মীর সহিত তথা আছেন গদাধর।'[৩] (যদ্দৃষ্টং)

দ্বিতীয় খণ্ডের কাব্যের সূচনায় অথচ দেখা যাচ্ছে—

'রামায়ণ।—

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।—

অথাযোধ্যা কাণ্ড মভিলিখ্যতে।—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং
সুন্দরং কাকুৎস্থলং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মকং। রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধিং
দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে
লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।—
গন্ধপুষ্পে দূষিত রাজা সুগন্ধি কস্তুরী
ত্রিভুবন জিনিয়া তার রূপের মাধুরি।' [৪] (যদ্দৃষ্টং)

দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪। লক্ষণীয়, প্রথম খণ্ডের মতো এখানে শ্রীকৃষ্ণকে নয়, শ্রীরামকে শরণ করা ও বন্দনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডেই তৃতীয় কাণ্ড সন্নিবিষ্ট। কিন্তু সেটা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠা দেখে বোঝা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কাণ্ড অর্থাৎ অযোধ্যাকাণ্ড পড়তে পড়তে সমাপ্ত হলে পরের পৃষ্ঠায় তৃতীয় কাণ্ড তথা অরণ্যকাণ্ড শুরু হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা কিন্তু অরণ্যকাণ্ডের ক্ষেত্রে আবার এক থেকে সূচিত নয়। অযোধ্যাকাণ্ডের দেড়শো পাতার পর অরণ্যকাণ্ড শুরু, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেড়শো পরবর্তী ক্রম দ্বারা বিন্যস্ত।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১১। ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি সুন্দরকাণ্ড। চতুর্থ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২৭। এই খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা দু'ভাবে, ওপরে সংখ্যায়, নিচে খখ, খখ২, গগ, গগ২ ...। তবে খখ পৃষ্ঠার চার পৃষ্ঠা পর খখ২। আবার খখ২ এর সাত পৃষ্ঠা পরে গগ—এভাবে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া। সর্বশেষ খণ্ড বা পঞ্চম খণ্ডটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪২। এখানে পৃষ্ঠার নিচে দশ পাতা অন্তর পৃষ্ঠাঙ্ক ককক, খখখ, গগগ...। আবার ককক পৃষ্ঠার দুই বা তিন পাতা পর ককক২, ...ঞঞঞ২ লেখা। এভাবে শশশ পর্যন্ত আছে। পঞ্চম খণ্ডের কাব্যের সূচনায় শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করে লেখা—

'রামায়ণ।—

শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ।—

অথ উত্তর কাণ্ড মভি লিখ্যতে।—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং
রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্ত-
মূর্ত্তিং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং
রাবণারিং।

দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধ্বনি বামেতো জানকী শুভা
পুরতো মারুতিযস্যতং নমামি রঘুত্তমং।

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় নাথায় সীতয়াং পতয়ে নমঃ।
আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী।'[৫] (যদ্দৃষ্টং)

—শ্রীরামকে বন্দনা করে একাধিক শ্লোক একমাত্র এই খণ্ডেই দেখা যায়। বাহ্যিক দিক থেকে দেখে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাঁচটি খণ্ডে পাওয়া গেছে সেগুলি বর্ণিত হয়েছে। এপার কাব্যের অভ্যন্তরে কী কী পাওয়া গেছে বা যায়নি তা নিয়ে আলোচনা অগ্রসর হবে। বিভিন্ন খণ্ডে একই শব্দ বিভিন্ন বানানে পরিলক্ষিত হয়। যেমন—প্রথম খণ্ডে ছিল 'কেকয়ী', দ্বিতীয় খণ্ডে 'কৈকেয়ী' এবং 'কৈকেয়ি'। একটি বানানের নির্দিষ্ট আদর্শ রূপ তখনও পর্যন্ত লিপিকররা আয়ত্ত করেনি বলে একই বানানের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা বর্তমান বাজার চলতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা করলে বোঝা যায় যে প্রথম মুদ্রণে কী অনুপস্থিত ছিল ও তার পরবর্তী মুদ্রণে কী কী অতিরিক্ত এসেছে বা পরে যুক্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মূল-ভাব এক থাকলেও পংক্তি বা শব্দগত বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত প্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণে দশরথ কৈকেয়ীর কথা শুনতে বাধ্য হলে নিজেকে 'স্ত্রী কুক্কুর' বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে এই শব্দটির কোনো অস্তিত্ব নেই। 'স্ত্রী বশ' শব্দটি তখন এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। তবে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে একটি নামপত্র, সেটি নিম্নরূপ—

THE
RAMAYUN
TRANSLATED INTO BENGALEE
BY KRITTEE-BAS
BOOK I
SECOND EDITION
বাল্মীকিকৃত
রামায়ণ
কৃত্তিবাস ঃ কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত
দ্বিতীয়বার ছাপা।
প্রথম কাণ্ড।
SERAMPORE ঃ শ্রীরামপুর।
১৮৩০ . ১৮৩০।[৬]

এই সংস্করণেও কিন্তু কাব্যের সূচনায় 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ' লিখিত। যতিচিহ্ন হিসাবে এক দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (।।)-র ব্যবহার রয়েছে। সেই সঙ্গে পৃষ্ঠা সংখ্যা কিন্তু ইংরাজিতে দেওয়া— A, A2, B, B2, B3, B4, B5, B6, C– C6। তেরো পৃষ্ঠা অন্তর পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া C, C2, C3, C4, C5, C6। আবার তেরো পৃষ্ঠার পর থেকে D, D1, D2, D3, D4, D5, D6। লক্ষণীয় যে,

যে কয়েকটি পংক্তি দ্বারা এই প্রবন্ধ সূচিত হয়েছে সেই পংক্তিগুলি কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের এই দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম পাওয়া যায়, যা বর্তমান বাজার চলতি সংস্করণে ও স্কুলপাঠ্য হিসেবেও প্রচলিত ছিল। যদিও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঐ মূলভাবসম্পন্ন কয়েক পংক্তি পাওয়া গেছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত প্রথম সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণ ও বাজার চলতি সংস্করণগুলির ঘটনা ও পরিচ্ছেদগতও কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—প্রথম সংস্করণে অরণ্যকাণ্ডে রাক্ষস বধে সীতা রামকে বাধা দিলে রাম ক্রোধ প্রকাশ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে রামের ক্রোধ প্রকাশ নেই। প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণে সীতার তুলসী, ফল্গুনদী ও ব্রাহ্মণকে অভিশাপ ও বটকে আশীর্বাদ দেওয়ার কোনো প্রসঙ্গই নেই। প্রথম সংস্করণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ইন্দ্রজিতের বাণে বন্দি হনুমানের প্রস্রাব বা মুখ পোড়ার কথা ব্যক্ত নয়। অথচ এ বিশদ বর্ণনা আমরা এখনকার সংস্করণগুলিতে পাই। সেতুনির্মাণে কাঠবিড়ালির কোনো ভূমিকা বা সেতু নির্মাণের পর শিবলিঙ্গ নির্মাণের কোনো প্রসঙ্গ দেখা যায় না আদি সংস্করণে। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ প্রাচীরে উঠে বানর সৈন্য দেখতে এলে বিভীষণ কর্তৃক রামকে রাবণ দেখানো প্রসঙ্গও প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত। 'অঙ্গদের রায়বার' নামে যে মুখরোচক পরিচ্ছেদ এখনকার বাজার চলতি সংস্করণে পাওয়া যায়, তা প্রথম সংস্করণে থাকলেও তেমন মুখরোচকভাবে পরিবেশিত নয়। অর্থাৎ ছদ্মবেশধারী বহু মায়াবী রাবণের মাঝে স্ব-রূপে থাকা ইন্দ্রজিৎকে উদ্দেশ করে অঙ্গদের রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে অপমান করার যে বাক্‌পটুতা তা প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত।

অবিধবা হওয়ার লক্ষণ প্রথম সংস্করণে কৌশলে ব্যক্ত। সীতা জনকগৃহে থাকাকালীন সীতাকে সকলে অবিধবা হওয়ার কথা বলত। এই প্রসঙ্গে অবিধবা হওয়ার চিহ্নগুলি বর্ণিত—পরে যা আর পাই না। 'মানিক' রামায়ণের সময়ে থাকলেও, 'কাচ' ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ নাগপাশে বন্দি হ'লে রাম বিভীষণকে বলেন—

'প্রাণের দোসর লক্ষ্মণ গুণের ভাই
সীতানাগিয়া আমি লক্ষ্মণে হারাই।
সীতার উদ্ধার করিতে লক্ষ্মণ ভাই মরে
কাচের বদলে মানিক হারাইনু সাগরে।'[৭] (যদ্দৃষ্টং)

স্ত্রীর চেয়ে এখানে ভাইকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু একথা পরবর্তী সংস্করণে পাই না। এতে সীতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে ভেবেই হয়তো পরবর্তী সম্পাদকগণ সীতার অবিধবা লক্ষণ বা রামের বলা এই উক্তি বর্জন করেছেন।

শুধু তাই নয়, গরুড়কে রামের দ্বিভুজ মুরলী মূর্তি দেখানো আমরা শ্রীরামপুর কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই না। 'মাথা' ও 'চর্চ্চিত' শব্দটি প্রতি ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণে যথাক্রমে 'মাতা' ও 'চর্চ্চিত' রূপে লিখিত। রাবণ ক্রোধে সীতাকে প্রহার করতে উদ্যত হলে মন্দোদরী তাকে নিরস্ত করে। কিন্তু প্রথম মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় এক্ষেত্রে অরবিন্দ নামক এক রাক্ষস রাবণকে বাধা দিয়েছে। পাতালে মহীরাবণকে বধ করার কৌশল দেবী মহামায়া হনুমানকে দেননি। প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী হনুমান নিজ বুদ্ধিবলে তা সম্পন্ন করেছে। মহীরাবণের পুত্রের নাম এখানে অহিক রাবণ, যা এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অহি রাবণ হিসেবে লিখিত। সবচেয়ে মজাদার যে অংশটি কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে পাওয়া যায় সেটি হল রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধে রামের দু'হাতের ঝগড়া :

'রামের দক্ষিণ হস্তে ভৎর্স্যে বামহাত
রণের বেলা পাছু যাও আগু খাও ভাত।
রণের পাছু যাও ভোজনের বেলা আগে
না পাই খাইতে আমি যুঝি অগ্র ভাগে।
রণের বেলা হস্ত তুমি হইলা কাতর
আমি আগু যাই তুমি পাছু যাও পাইয়া ডর।
দক্ষিণ হস্ত বলে তুমি শুন বাম কর
এ তিন ভুবনে আমার কারে নাই ডর।
যারে গালি দেয় লোকে তারে বলি বাম
সহজে বাম তুমি বাম তোমার নাম।
ভোজনসময় আমি সর্ব্ব কর্ম্মে আগে
ত্রিজগতের আগে দক্ষিণ বাম পাছে লাগে।
সহজে বাম তুমি বাম তোমার বাণী'[৮] (যদ্দৃষ্টং)

এর পরবর্তী যে প্রসঙ্গটি প্রথম সংস্করণে ছিল না অথচ বর্তমান সংস্করণগুলিতে পাই সেটি হল রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা। সীতা রামের কাছে ফিরে গেলে মন্দোদরী ঈর্ষাকাতর হয়ে সীতাকে অভিশাপ দিয়েছিল বলে কথিত, যা প্রথম সংস্করণে পাওয়া যায় না। হনুমানের সীতার দেওয়া হার ছিন্ন করা বা বুক চিরে রাম নাম লেখা দেখানোর কোনো প্রসঙ্গ প্রথম সংস্করণে উপস্থাপিত নয়।

প্রথম সংস্করণের উত্তরকাণ্ডে রাম যখন জানতে পারেন যে বনবাসকালে লক্ষ্মণ কোনো ফল আহার করেননি, তখন কিন্তু হনুমানকে বলেননি বনবাসকালীন ফল আনতে। এর ফলে হনুমানের অহংকারভঙ্গেরও কোনো প্রসঙ্গ নেই। আবার রাম লক্ষ্মণের কথাতেই বিশ্বাস করেছে বলে ফল গুনে হিসেব করা এই সংস্করণে নেই। কিন্তু বাজার চলতি সব সংস্করণে এই প্রসঙ্গগুলি বিস্তৃত আকারে বর্ণিত।

রাবণ ও বালির মিত্রতা কোনো মুনি দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী। রাবণ পরাজিত হয়ে নতি স্বীকার করলে অগ্নি সাক্ষী করে বালি ও রাবণের মিত্রতা হয়। কিন্তু বাজার চলতি সংস্করণে দেখা যায় রাবণের পিতামহ এসে এই মিত্রতা ঘটান। প্রথম সংস্করণেই কেবল রম্ভা সরাসরি রাবণকে 'বাপা' সম্বোধন করেছে। রাবণ রম্ভার সতীত্ব হরণ করলে রম্ভার করুণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

'হাত পা আছাড়ে রম্ভা রাবণের কোলে
মুখেতে তর্জ্জন করে ত্রাস অন্তরে।'[৯]

অথচ পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বলা আছে মুখে তর্জন করলেও রম্ভা নাকি অন্তরে আনন্দিত। এই প্রসঙ্গে অগস্ত্য নারীচরিত্রের কালিমালিপ্ত দিক ব্যাখ্যা করেছেন, যা এই প্রথম সংস্করণে নেই। প্রথম সংস্করণে রাজসূয় যজ্ঞ করার কোনো ইচ্ছা রাম প্রকাশ করেননি, সীতা বিসর্জনের পর সরাসরি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চেয়েছেন। লবণ বধ প্রসঙ্গ এখানে কেবল উল্লিখিত, বিস্তৃতভাবে বর্ণিত নয়, যা পরবর্তী বাজার চলতি সংস্করণগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যক্ত। শ্রীরামপুর মিশন

থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতাপুত্র 'লব' নয়, 'নব'। এর কারণ পুথিতে আগে 'ল'-কে 'ন' লিপি দিয়ে লেখা হত। যিনি সম্পাদক তিনি পড়তে ভুল করেছেন বলে 'ল'-এর স্থানে 'ন' লিখেছেন। তবে এই সংস্করণে শম্বুক বধ প্রসঙ্গ, গৃধিনী-পেচক বিবাদ প্রসঙ্গ, অগস্ত্য কর্তৃক রামকে অলংকার দান প্রসঙ্গ—কোনোটিই নেই। অথচ বাজার চলতি সব সংস্করণে এই প্রসঙ্গগুলি বিস্তৃত আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

আসলে, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ কে সম্পাদনা করেছিলেন বা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পাদনা করেছিলেন তা ভূমিকা অংশ না থাকায় সেভাবে বোঝা যায় না। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণে যদিও ভূমিকা নেই কিন্তু পরবর্তী সম্রান্ত সম্পাদনা থেকে জানা যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনা করেছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, যা বটতলার সংস্করণ বা অন্যান্য পরবর্তী সংস্করণগুলি অনুসরণ করে এসেছে। পুরাতন পুথি বা রচনা সম্পর্কে বিশ্বস্ত থাকার যে গুরুত্ব এখন আমরা বুঝি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে জয়গোপাল বা তাঁর সহযোগী পণ্ডিতরা তা উপলব্ধি করেননি। পাণ্ডুলিপিবিদ্যা সম্পর্কে যথার্থ ধারণার অভাব এই ঘটনার দ্বারা সূচিত হয়। এই অভাব পূরণ হয়েছে পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে। ফলে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে লোক উপযোগী করে সবার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁদের সফল হলেও মূল কৃত্তিবাসী রচনার ধারাকে সেভাবে ধরতে পারাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রথম সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আরও কিছু পুথি, নিজের তৎকালীন স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা জয়গোপাল যা ভালো বুঝেছেন তা-ই প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে সমস্ত পুথি এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেগুলি মিলিয়ে দেখলে প্রকৃত কৃত্তিবাসের রচনার মূল ভাবাংশ পরিলক্ষিত হয় ঠিকই কিন্তু মূল রচনাংশ কোনটি তা সঠিকভাবে বলা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পুথির পাতা থেকে মুদ্রণের অক্ষরে প্রথম সম্পূর্ণ ছেপে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল পরবর্তীকালে সেই কাঠামোকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে অন্যান্য প্রকাশক বা সম্পাদকগণ এগিয়েছেন। কিন্তু কাঠামো গড়ার প্রথম পদক্ষেপরূপে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ ও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় সংস্করণের গুরুত্ব অপরিসীম। কালের গর্ভে বিস্মৃত প্রায় দুর্লভ এই সংস্করণকে তাই আর একবার উজ্জ্বল আলোয় তুলে ধরার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তথ্য-নির্দেশ

১. পাঠ-সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, ১৯৯৯, পৃ. ৯৩।

২. A Grammar of the Bengal Language By Nathaniel Brassey Halhed, Printed at Hooghly in Bengal MDCC LXXVIII, 1778, Page 147.

৩. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪।

৪. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪।

৫. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪-৫।

৬. কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮৩০, নামপত্র।

৭. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৮৫।

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪১৭।

৯. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

আকর গ্রন্থ

১. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, প্রথম খণ্ড।

২. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, দ্বিতীয় খণ্ড।

৩. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, তৃতীয় খণ্ড।

৪. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, চতুর্থ খণ্ড।

৫. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০২-০৩, পঞ্চম খণ্ড।

৬. রামায়ণ (কৃত্তিবাসকৃত)-শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮৩০।

সহায়ক গ্রন্থ

১. নীলমণি পাল (প্রকাশক), অরণ্যকাণ্ড, বটতলা সংস্করণ, ১২৪৭ বঙ্গাব্দ, শাস্ত্র প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, কুমারটুলি, কলিকাতা।

২. পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সম্পাদিত সম্পূর্ণ সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ১৯২৬ খ্রীঃ।

৩. শ্রীনীলমণি পাল ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস (প্রকাশক), অযোধ্যাকাণ্ড, বটতলা সংস্করণ, ১২৪৮ বঙ্গাব্দ, শাস্ত্র প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, কুমারটুলী, কলিকাতা।

৪. শ্রীবনমালি প্রামাণীক ও শ্রীশ্যামাচরণ প্রামাণীক (প্রকাশক), উত্তরা কাণ্ড, বটতলা সংস্করণ, ১২৫৬ বঙ্গাব্দ, নিস্তারিণী যন্ত্রে যন্ত্রিত, কলিকাতা।

৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৬. কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান—মোহিনীমোহন সরদার, ১৪১৭, কোডেক্স।

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

ঔপনিবেশিক নগর কলকাতার 'বাবু' বিষয়ক ছড়া

গার্গী সরকার

'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা' উপলক্ষে বারোইয়ারি তলায় বসেছে 'কেত্তনে'র আসর। কেত্তনের শেষে একজন বাউল সুর করে গাইলে—

"আজব সহর কল্‌কেতা
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোনারবেণের কড়ি,
খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখরাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।
গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাবে, তফাৎ থাকাই সার কথা।"[১]

—এই ছিল অল্প কথায় উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক নগর কলকাতা। যা আক্ষরিক অর্থেই মেকির উপর চকচকে পালিশ। উপরে জাঁকজমক কিন্তু ভেতরে অন্তঃসারশূন্য, শিকড়হীন জীবনচর্যা। যে জীবনের অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন কলকাতার 'বাবু'-রা। কারা এই 'বাবু'? ১৭৫৭-য় পলাশির যুদ্ধের পর থেকে নগর কলকাতা, বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষেই বাণিজ্যের সূত্র ধরে শাসক হয়ে উঠছে ইংরেজ কোম্পানি। কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম দিকে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল এক শ্রেণির মানুষ। বৃত্তিতে তারা দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান। ইংরেজরাও বুঝেছিল নতুন জায়গায় শাসনকার্য চালাতে গেলে দেশীয় মানুষদের হাত ধরতেই হবে। আর এই বৃত্তিজীবী মানুষগুলোও বুঝে নিয়েছিল নতুন যুগ সমাসন্ন। যে যুগের রাজা ইংরেজ, রাজধানী কলকাতা। ফলে ইংরেজ সান্নিধ্য ভাগ্যাকাশে সূর্যোদয়-ই ঘটাবে। হলও তাই। নবগঠিত কলকাতার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ইংরেজদের সাহায্য, তোষণ, অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করে তৈরি হল অগাধ বিত্তশালী 'বাবু' শ্রেণি। যে শ্রেণি কালের নিরিখে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নিজেকে পালটে নিল 'আদিবাবু', 'নববাবু' কিংবা 'নব্যবাবু'র মতো নানা অভিধায়।

উনিশ শতক। নগর কলকাতা। বিচিত্র এক সময়। ব্রিটিশ পুঁজির চাপে গ্রাম সমাজ ভেঙে পড়ছে। ফলে গ্রাম থেকে প্রতিদিন মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছে ব্রিটিশের নতুন রাজধানী কলকাতায়। পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কলকাতায় তৈরি হচ্ছে নিম্নবিত্তের বৃত্তিজীবী সমাজ—কারিগর, জেলে, ময়রা, ধোপা, মালি, দরজি, ছোটোখাটো পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা, কুলি, মজুর, চাকর, বেয়ারা, পাল্কিবাহক, গাড়োয়ান, কোচোয়ান, মেথর, ভিস্তি। আবার এর ঠিক বিপরীতেই ছিল কলকাতার হঠাৎ নবাবের দল—বেনিয়ান, মুন্সি, দেওয়ান, ব্ল্যাক জমিদার ইত্যাদি। গ্রাম থেকে শহরে আসা নিম্নবর্গীয় মানুষের দল হয়তো বিপন্ন বিস্ময় নিয়েই লক্ষ করেছিলেন উচ্চবিত্তের জীবনকে। তাই উনিশ শতকের

'ছড়া'-য় জায়গা করে নিল 'বাবু'-রা। বস্তুত, ঔপনিবেশিকতার ধারণাটিই আসলে দু'তরফের। শাসক এবং শাসিতের। এক রাষ্ট্র যখন তার ক্ষমতাবলে অন্য রাষ্ট্রের উপর প্রশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু তা চালনা করে তার নিজের দেশ থেকেই তাহলে অধীনস্ত রাষ্ট্রটি হয় ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের উপনিবেশ। এখন ঔপনিবেশিক কাঠামোয় শাসিত বাধ্য পরাধীনতা মেনে নিতে। পরাধীনতা জন্ম দেয় হীনমন্যতার। আবার হীনমন্যতা থেকে আসে শাসকের প্রতি ভয়। এই ভয় কাটানোর উপায় হিসেবেই শাসিত হয়ে ওঠে তোষামোদপ্রবণ, অনুসরণপ্রিয় এবং অনুকরণপ্রিয়, কারণ ঔপনিবেশিক সমাজে টিকে থাকবার জন্য বা প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য সে হাতিয়ার করে শাসককেই। 'বাবু'-দের মধ্যেও এই মানসিকতাই কাজ করেছিল। তাদের এই সকল স্বভাব-ই উঠে আসে বৃহত্তর জনসমাজের মানসিকতার প্রতিফলক 'ছড়া'-য়।

লোকসাহিত্যে 'ছড়া' প্রাচীনতম। ছড়ায় কোনো রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। স্রষ্টা নয়, সৃষ্টিই তার একমাত্র পরিচয়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ অর্থাৎ পলাশি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে থেকে নবনির্মীয়মান কলকাতার সামাজিক দলিল হয়ে আছে অজ্ঞাতনামা স্রষ্টার রচিত ছড়াগুলি। আমরা এই প্রবন্ধে বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থ পাঠ করে তুলে এনেছি সেইসব সমাজ বিশ্লেষক ছড়াগুলিকেই। এই ছড়াগুলি থেকে একদিকে যেমন কলকাতার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়—নবগঠিত কলকাতার সামাজিক বিন্যাসকে বুঝে নিতে পারি তেমনি অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের 'বাবু'-দের কলকাতার মানুষ কীভাবে চিনেছিল সে সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক, এই ছড়াটির কথা যেখানে একইসঙ্গে কলকাতা এবং কলকাতার 'বাবু'-দের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাযথ ধারণা পাওয়া যায়—

"ধন্য হে কলিকাতা ধন্য হে তুমি
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি।।
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।
নকলে বাঙালী বাবু হল যে কাঙ্গাল।।
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে।।"[২]

— একইসঙ্গে 'মিমিক্রি' এবং 'মাইগ্রেশন'-এর ছবি। পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভের পরামর্শ অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি ঘোষণা করে কলকাতার চারপাশে কেউ যদি নিজের খরচায় বনজঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে তবে ওই অংশের জমির অধিকারী হবে সেই। এর ফলে রাজা নবকৃষ্ণ, পাথুরেঘাটার ঠাকুররা অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শোভাবাজার, পাথুরেঘাটা প্রভৃতি অঞ্চল পরিষ্কার করে নিজেদের বসবাসের উপযোগী করে নেয়। শুধু উচ্চবিত্তরাই নয় গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা বহু বৃত্তিজীবী নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে 'নেটিভ টাউন' গড়ে উঠতে থাকে। ইংরেজ তোষণ করে 'নেটিভ টাউনের' বড়োলোকদের হাতে দেদার পয়সা। ক্লাইভ পেরিয়ে হেস্টিংসের সময় থেকে 'আদি বাবু'দের বেজায় রমরমা। কলকাতায় তখন নতুন রাস্তাঘাট, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, গ্যাসবাতির আলো আর বেনিয়ানি-মুৎসুদ্দি-নবাবিয়ানার দৌলতে প্রচুর কাঁচা টাকার আনাগোনা। যাদের জন্য এত অর্থের সমাগম তাদের মতো হয়ে ওঠাটাই লক্ষ্য 'বাবু'-দের কাছে। এই অনুকরণ স্পৃহাই হল 'মিমিক্রি'। 'বাবু'-দের চাল-চলন, আদব-কায়দা, পোশাক, জীবনধারণের প্রবণতা সব কিছুর মধ্য দিয়েই তা ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে হোমি ভাবা লিখছেন—

"Mimicry is, thus the sign of a double articulation; a complex strategy of reform, regulation and discipline, which 'appropriates' the other as it visualizes power. Mimicry is also the sign of the inappropriate, however, a difference or recalcitrance which coheres the dominant strategic function of colonial power, intensifies surveillance, and poses immanent threat the both 'normalized' knowledges and disciplinary powers."[৩]

এখন কীভাবে ইংরেজদের সঙ্গে 'বাবু'-দের সখ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং কীভাবে বাঙালি 'বাবু'রা (অবশ্য তখনো তারা 'বাবু' হননি) ইংরেজদের বিপদের দিনে সাহায্য করেছিল সে কথাও ধরা আছে ছড়ায় —

"হেস্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত
কাশিমবাজারে গিয়া হল উপনীত
... ...
কান্তমুদি ছিল তাঁর পূর্ব পরিচিত।
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান।
মুস্কিল পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়
হেস্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ
কাঁচালঙ্কা, বড়ি পোড়া কাছে কলাগাছ।
সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে
হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।"[৪]

লর্ড হেস্টিংসের কান্ত মুদির বাড়িতে 'ডিনার' খাওয়া যদি হয় পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সামিল তেমনি বাংলাদেশের সমাজের বংশ কৌলিন্যের দীর্ঘদিনের সংস্কারকে ভেঙে ফেলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সাহায্যের খতিয়ান কিংবা দেওয়ানি-মুৎসুদ্দিগিরি-বেনিয়ানির ফলে প্রাপ্ত অগাধ অর্থের সূত্রে 'কান্তমুদি'দের 'কান্তবাবু' হয়ে ওঠার বৈপ্লবিক কাহিনিও বলা আছে ছড়াতেই। আসলে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই কলকাতার নাগরিক সমাজে বংশ-কৌলিন্যের জায়গা দখল করে নিচ্ছিল অর্থকৌলিন্য। তাই চূড়ামণি দত্ত, রাজীবলোচন রায় বা মহারাজা নন্দকুমারের পাশেই অনায়াসে উচ্চারণ করা গেল নবকৃষ্ণ দেব, রামদুলাল সরকার, বনমালী সরকার কিংবা গোবিন্দরাম মিত্রের নাম। কলকাতার এই নতুন বড়োলোক 'বাবু'-দের নিয়েও লেখা হল ছড়া—

"বনমালী সরকারের বাড়ী
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
আমিরচাঁদের দাড়ি
হুজুরি মল্লের কড়ি"[৫]

এই ছড়াটির আরও নানা পাঠান্তর পাওয়া যায়, যেমন —

"গোবিন্দরামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি
নকু ধরের কড়ি
মথুর সেনের বাড়ী।"[৬]

কিংবা,

"বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি
জগৎ শেঠের কড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি।"[৭]

কখনো বা 'গোবিন্দরাম' মিত্রের ছড়ির বদলে 'নন্দরামের ছড়ি'-ও পাওয়া যায়। এই ছড়া প্রসঙ্গে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"আসলে এই ছড়া, ও তার বিভিন্ন পাঠান্তরের মধ্যে, অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এক একটি ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এইসব লোক প্রবচনে এমনভাবে উচ্চারিত হয় যাতে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান খুঁজে বার করা যায়।"[৮]

তবে আমাদের মতে, শুধু ব্যক্তির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থান নয়, ঐ ব্যক্তির সূত্রে সমসাময়িক কালটিকে চিনে নেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ছড়ার প্রত্যেকটি চরিত্রই হলেন কলাকাতার ইতিহাসের প্রথম পর্বের 'বাবু'-রা। যাদের 'বাবুত্বের' মূলে আছে জমিদারি, বেনিয়ানি, মুৎসুদ্দিগিরি।

কোম্পানি আমলের সূচনায় অষ্টাদশের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজদের দেওয়ানি করে কলকাতায় কুমোরটুলিতে প্রাসাদসদৃশ বাড়ি বানিয়েছিলেন বনমালী সরকার। ইনি প্রথমে ছিলেন পাটনার কমার্সিয়াল রেসিডেন্সির দেওয়ান, তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডেপুটি ট্রেজারার। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পর্যন্ত এই অট্টালিকা দেখতে আসেন। গোবিন্দরাম মিত্র কলকাতার প্রথম দিককার 'ব্ল্যাক জমিদার'। ১৭৩৯ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত শহরের কর আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে কর আদায় করতেন। তাঁর নিপীড়নের ফলে ১৭৫২-এ কলকাতা শহরে মন্বন্তর দেখা যায় আর তিনিই উপার্জিত অর্থে নির্মাণ করেন ১৬৫ ফুট উঁচু নবরত্ন মন্দির। তাঁর সঙ্গের ছড়িটি যেন তার প্রবল প্রতাপের প্রতিনিধি হয়ে জায়গা করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। জগৎ শেঠ পলাশির যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতার অন্যতম শরিক। উমিচাঁদ পশ্চিমের বণিক। বাংলাদেশে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে এসে উমিচাঁদের সাহায্য নিতে হয়েছিল ইংরেজদের। নকু ধর ওরফে লক্ষ্মীকান্ত ধর পলাশির যুদ্ধে সময়, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় ইংরেজদের বহু টাকা ধার দেন। ক্লাইভও পলাশির যুদ্ধ জয়ের পর সেই সাহায্য ফিরিয়ে দেন। এছাড়া নন্দরাম সেন কলকাতার প্রথম ব্ল্যাক জমিদার। র‍্যালফ শেলডনের অধীনে থাকার সময় তাঁর উত্থান। বস্তুত এই প্রতিটি ব্যক্তি পরিচয়ের সূত্রে একটা কথা স্পষ্ট যে নগর কলকাতায় নতুন তৈরি হওয়া অর্থকৌলিন্যে বলশালী এই শ্রেণির পিছনে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিশাল ভূমিকা ছিল। সেই সূত্রেই সমাজে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তা নিয়ে রচিত হওয়া আরেকটি ছড়া হল—

"দুলোল হলো সরকার, ওক্কুর হলো দত্ত,
আমি কি না থাকব যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত।"[৯]

এই ছড়ার 'আমি' হলেন পিরীতরাম মাড়। যিনি চোখের সামনে দেখেন রামদুলাল দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ানি করে শুধু যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন তাই নন, ইংরেজদের কাছ থেকে সরকার উপাধিও লাভ করেন এবং কলকাতার নতুন সমাজব্যবস্থায় দলপতির মর্যাদাও লাভ করেন। অক্রুর দত্ত-ও অর্থ-প্রতিপত্তির জোরে পিতৃপুরুষের পদবি মুছে ফেলে দত্ত পদবি গ্রহণ করেন। চারদিকে এই যে বংশকৌলিন্যকে হারিয়ে অর্থ-সম্পত্তির জোরে সমাজের মাথায় ওঠবার হিড়িক তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ইংরেজদের উপাধি প্রদানের উৎসব। পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই বিজয়ী ইংরেজ তাদের সাহায্যকারী বাঙালিদের পুরস্কার স্বরূপ নানা উপাধি, উপহার, উপঢৌকন, সামাজিক মর্যাদায় ভরিয়ে তুলেছিল। এভাবেই ইংরেজকে সাহায্যের পুরস্কার হিসেবে ১৭৬৬ সালে ক্লাইব সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে নবকৃষ্ণ দেবের জন্য 'রাজবাহাদুর' খেতাব ও দশহাজারি মন্‌সব, সেইসঙ্গে ৩,০০০ অশ্বারোহী ও পাল্‌কি রাখবার অধিকার আনিয়ে দেন। পরের বছর 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাব, ৪০০০ অশ্বারোহী রাখার ক্ষমতা এবং স্বর্ণপদক পেলেন সম্রাটের কাছ থেকে, যার মূলে রয়ে গেল ইংরেজদের সঙ্গে আনুগত্য সম্পর্কের জোর। কিন্তু ভুইফোঁড় হঠাৎ নবাবদের কলকাতার সমাজ যে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখেনি, তার প্রমাণ এই ছড়াটি—

"কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাহি থাকে যার।
উপাধি বিষম ব্যাধি ঘাড়ে চাপে তার।"[১০]

তাই এই ছড়ার বিদ্রূপের কেন্দ্রে রয়েছেন মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। বস্তুত নবকৃষ্ণ দেবকে যদি নবগঠিত কলকাতার অর্থ কৌলিন্যের নিরিখে সৃষ্ট সমাজপতিদের প্রতিনিধি ধরি, তাহলে বিপরীতে চূড়ামণি দত্তকে বলা যেতেই পারে বনেদিয়ানার পরিচয়বাহী চরিত্র। তাই এই দুই শ্রেণির মধ্যেকার সংঘাত নিয়ে তৈরি হল ছড়া—

"যম জিনিতে যায় রে চুড়ো
যম জিনিতে যায়।
জপতপ কর কিন্তু মরতে জানলে হয়।
সবাইকে ফেলে চুড়ো যম জিনিতে যায়
নবা তুই দেখবি যদি আয়।"[১১]

একদিকে ইংরেজ কবলানো এক পুরুষে বড়োলোক নবকৃষ্ণ দেব। অন্যদিকে দত্ত পরিবারের বংশকৌলিন্যের ধ্বজাধারী চূড়ামণি দত্ত। যে নবকৃষ্ণ প্রথম জীবনে ছিলেন হেস্টিংসের ফরাসি ভাষায় শিক্ষক, তারপর কোম্পানির ষাট টাকা মাইনের 'নবমুন্‌শী'—শেষপর্যন্ত পলাশির লুণ্ঠনে ক্লাইভ তথা ইংরেজদের সাহায্যকারী—ফলে সেই সূত্রে হাতে এল অগাধ অর্থ আর বিজয়ী ইংরেজের সঙ্গে সখ্য সম্পর্কের সুবাদে জুটে গেল সামাজিক সম্মান। জীবনের সমস্ত প্রাপ্য এসে গেল হাতে। ওদিকে চূড়ামণি দত্তরা বোধহয় অসহায়ভাবেই উপলব্ধি করলেন পালটে যাওয়া সময়কে। তাই বুঝলেন ইহজীবনে টেক্কা দেওয়া যাবে না নগর কলকাতার নতুন বড়োলোকদের কিন্তু বনেদিয়ানা আর আভিজাত্যের নাছোড় অভিমান সঙ্গে নিয়ে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করে ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস দিয়ে মারতে চাইলেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে। তাই এই ছড়ার সৃষ্টি। তবে আমাদের মনে হয় যে নগর কলকাতার সাধারণ মানুষের প্রশ্রয় বোধহয় বনেদিয়ানার দিকেই ছিল। তার কারণ হিসেবে

বলা যেতে পারে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে বসা এই মানুষগুলির প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অঢেল ব্যয়, অপরিমিত বিলাস বিরক্তই করেছিল জনগণকে। নিজেদের সামাজিক সম্মান ও অর্থের জোরকে প্রমাণ করবার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতাই বোধহয় 'বাবু'-দের 'মাস' থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

"জাল, জুয়াচুরি, মিছে কথা
এই তিন লয়ে কলিকাতা।"[১২]

—সেদিনের কলকাতার সামাজিক পরিবেশকে বুঝতে এই দুই লাইনই ছিল যথেষ্ট। 'মাইগ্রেশন'-এর ফলে কলকাতার জনসমাবেশ এবং কলেবর বৃদ্ধি পেল। নবাবি, দেওয়ানি, মুৎসুদ্দিগিরি করে বড়লোক হল এক শ্রেণির মানুষ, যাদের সামনে 'মিমিক্রি'-র বিষয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা। কেমন সেই কর্মচারীরা? এরা কলকাতায় এসেই পেতেন কাঁচা টাকার সাধ। হঠাৎ নবাব হবার বাসনায় কোম্পানির অধস্তন কর্মচারী 'রাইটার'-রা কোম্পানির নাম করে বাজার থেকে প্রচুর টাকা তুলে কোম্পানিকে লুকিয়ে গোপনে ব্যাবসা চালাত এবং দু-চার বছরেই প্রায় কোটি টাকা রোজগার করত। এখন কলকাতার 'বাবু'-রা এ হেন ইংরেজদেরই গুরু মেনেছিল। তাই তাদের দেখেই জাল-জুয়াচুরি আর মিথ্যে কথার পাঠ নিলেন নবকৃষ্ণ দেব, কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণকান্ত, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিং প্রমুখরা। আর সেই ট্র্যাডিশন প্রসারিত হল উনিশ শতকে এসেও। তাই ছড়ায় পাই —

"ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার,
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার।"[১৩]

—রামদুলাল সরকার ইংরেজের বেনিয়ানি করে অর্থ উপার্জন করেন আর প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বিচিত্র জীবনে। ইনি চুঁচুড়ায় তার বাগানবাড়িতে কলকাতার প্রভাবশালী সাহেব ও বাঙালি অভিজাতদের নিয়ে বাঈ নাচের আসর বসাতেন। কিন্তু ১৮৩০ সালে জানা গেল যে কোম্পানির 'সিকিউরিটি'র কাগজ জাল করেই তার অর্থ ভাণ্ডার ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। একটা গোটা শহর এবং সেই শহরের এক শ্রেণি কীভাবে অনুকরণ ও দেখনদারির মোহে পড়ে অধঃপতিত হচ্ছে তার দলিল হয়ে আছে এই ছড়াগুলি।

বস্তুত, অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরুর দিকের কলকাতায় ব্যক্তি 'বাবু'-দের নাম, জীবন বা ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু ছড়া গড়ে উঠেছিল। ছড়াকারেরা নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বাবুদের স্বভাব চরিত্র বর্ণনা করেছেন, তার দুটি নমুনা—

"কান্তবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খায়,
তুড়ুৎ লাগাতে তায় ক্রেভারিং যায়।
হেস্টিংস্ যাহার হাতে তারে করে কাবু,
বাঙলায় হেন লোক আছে কে হে বাবু?"[১৪]

এই কান্তবাবু হলেন শ্যামবাজারের কৃষ্ণকান্তবাবু। এই ছড়ার বিষয়বস্তুও হল ইংরেজ ও বাঙালি 'বাবু'-দের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি। অন্য ছড়ায় পাই—

"বাবু বটে ঈশ্বর বাবু শম্ভু রায়,
উমেশ বাবু শুঁটকো বাবু, বসে আছে কেদারায়।
বাবুতো বাবু লালা বাবু, কোলকাতায় বাড়ী,

বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না যে ব্যাঁটা সে হাড়ি।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফতের মধু অলি,
রাগ করোনা, রায় বাবুগো, দুটো সত্য কথা বলি।"[১৫]

মনে হয়, লালাবাবু অর্থাৎ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাতি কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ স্বভাবে অন্যান্য বাবুদের মতো অপরিমেয় বিলাসের স্রোতে গা ভাসাননি বলেই এ জাতীয় ছড়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

কলকাতার 'আদিবাবু'-রা ইংরেজদের তোষণ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন এই তথ্যে কোনো ভুল নেই কিন্তু এটাও মনে রাখতে হয় যে সেই অর্থ তাঁদের স্বোপার্জিত ছিল। অথচ এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের আর কোনো উপার্জনের দায় নেই। পিতৃপুরুষের অগাধ সম্পত্তি ওড়ানোতেই মন দিলেন তাঁরা তাই যে রামদুলাল সরকার মৃত্যুর সময় তেইশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যায়, তাঁর পুত্র ছাতুবাবুর কাছে কালের নিয়মেই 'বাবুয়ানি' করা ছাড়া আর কোনো কাজ রইল না কারণ ব্যক্তিগত উদ্যমের সময়ও সেটা নয়। আর এই বাবুয়ানির অঙ্গ হয়ে এল 'বুলবুলির লড়াই'। শীতকালে মিনার্ভা থিয়েটারে বসত বুলবুলির লড়াই। ছাতুবাবু, হরনাথ মল্লিক, দয়ালচাঁদ মিত্র, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়—এঁরা হলেন উনিশ শতকের কলকাতার বুলবুলির লড়াই উৎসবের জনক। এঁদের দেখেই তৈরি হয়েছিল ছড়া—

"দুর্গাপূজা ঘণ্টা নেড়ে খোকা হলে বাজে ঢাক।
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে খাঁচায় পুল্লে কিনা কাক।।
বিষয়কর্ম গোল্লায় গেল, লড়িয়ে কেবল বুলবুলি।
প্রকৃতি বিকৃতি হায় হায়! মারা গেল লোকগুলি।।"[১৬]

—প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুধু ছড়াতেই নয়, 'সংবাদ প্রভাকর'—সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথাতেও ধরা আছে বুলবুলির লড়াই-এর বিস্তৃত বর্ণনা। উৎসব মুখর উনিশ শতকের নাগরিক কলকাতার কেন্দ্রই যেন হয়ে উঠেছিল 'বাবু বিলাস'। বিলাসের স্রোতে ব্যক্তির সমস্ত সদ্‌গুণ, সংস্কার-সংস্কৃতি গোল্লায় যেতে বসেছিল। 'বাবু'-দের একমাত্র পরিচয় তখন—

"ঘুড়ি তুড়ি যশ দান
আখড়া বুলবুল মানিয়া গান
অষ্টাহে বনভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"[১৭]

একদিকে এইভাবে বিলাসের স্রোতে ভেসে অঢেল অর্থব্যয় ও সময় কাটানোর কর্মহীন ব্যবস্থা, তার সঙ্গেই যুক্ত হল নেশার সামগ্রী। এ নিয়ে যেমন গড়ে উঠেছে ছড়া, তেমনি আবার 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র মতো রচনায় 'বাবু'-দের নেশার স্রোত আলোচনার বিষয় হয়েছে। এক এক অঞ্চলে এক এক নেশার আড্ডা। ছড়া লক্ষ করেছিল সেই ছবিও—

"বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে।"[১৮]

—এই সূত্রেই আমাদের মনে পড়ে যাবে শোভাবাজারের বাবু রামচন্দ্র মিত্রের বাড়ির উত্তরাংশের প্রসিদ্ধ আটচালাটির কথা যেখানে প্রতিদিন সন্ধেবেলা গান গাইতে আসতেন রামনিধি গুপ্ত। এই আটচালাতেই গড়ে উঠেছিল কলকাতার গাঁজাসক্তদের নিয়ে পক্ষীর দল। এরা প্রত্যেকেই

ভদ্র সন্তান, স্বভাবে সৌখিন এবং চরিত্রে 'বাবু'। কিংবদন্তী এই যে আটচালার আসরে গাঁজা সেবনে পারদর্শিতা দেখিয়ে 'পক্ষী' উপাধি পেতে গেলে এক আসনে বসে একশো ছিলিম গাঁজা খেতে হত। একবার এক ব্যক্তি শেষ ছিলিমটি টানবার সময় একটুখানি 'খুক্ খুক্' শব্দ করে কেশে ফেলেন বলে পক্ষীরাজ তাকে গুরুদণ্ড দিয়ে 'ছাতারে পাখী' নাম দেন। শেষে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর 'ছাতারে' নাম পালটে খানিক পদোন্নতি ঘটিয়ে 'স্বর্ণ ছাতারে' উপাধি দেওয়া হয়। আবার আরেকটি কাহিনি থেকে জানা যায় একবার এক পিতা তার সন্তানের খোঁজে পক্ষীর দলে এসে উপস্থিত হন এবং সন্তানকে দেখতে পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গেলে 'বাবু'টি তখন তার পিতাকে ঠোক্‌রাতে যান কারণ আসরে তিনি 'কাঠ্‌ঠোক্‌রা' হয়েছেন। বস্তুত এই কাহিনি কিংবদন্তীগুলি উনিশ শতকীয় 'বাবু'-দের জীবনে নেশার প্রবল প্রভাবকে চিনিয়ে দেয়। ফলে 'ছড়া' ও সমাজসত্য তুলে ধরার তাগিদ থেকে বর্ণনা করে 'বাবু'-দের এই স্বভাববৈশিষ্ট্যকে।

নবনির্মীয়মান কলকাতার স্বভাব বৈশিষ্ট্য আলোচনা দিয়ে শুরু করেছিলাম আমরা। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের কলকাতা কীভাবে তার নতুন প্রথা, সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠেছিল সেই আলোচনার সূত্রেই এসেছে 'বাবু'-দের কথা। 'বাবু'-দের অনুকরণপ্রিয়তা, তোষামোদি, পারস্পরিক ঈর্ষা-বিদ্বেষ-লড়াই নিয়ে গড়ে ওঠা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কিংবদন্তী এই সমস্ত কিছুকেই ছুঁয়ে গেছি আমরা। আর তারপর 'বাবু'-দের স্বভাব বর্ণনা করতে করতেই আমরা অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে পৌঁছে গেছি মূল আলোচ্য উনিশ শতকের অঙ্গনে। সেখানে এসে আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে ব্যক্তির আবরণ। এবার আর নাম নয়, চরিত্র বা স্বভাবই মুখ্য—তাও দেখে নিয়েছি আমরা। কিন্তু সবশেষে ফিরে যেতে হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়—উনিশ শতকের নবজাগরণ। উনিশ শতক বিষয়ে যারা আলোচনা করেছেন তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নবজাগরণের আলোকদীপ্ত জগৎ-সংস্কার-শিক্ষার পৃথিবী থেকে 'বাবু'-দের আলাদাই করে রেখেছেন। ঘুড়ি-বুলবুলি-বারাঙ্গনা-নেশাঘেরা 'বাবু'-দের পৃথিবীর সঙ্গে উনিশ শতকের শিক্ষিত শ্রেণির যেন কোনো যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু আমরা কী করে ভুলে যাব দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা যিনি নবজাগরণ উজ্জ্বল কলকাতার মানী ব্যক্তিত্ব হলেও সামাজিক সম্মান-প্রতিপত্তি বা ব্যাবসায়িক সাফল্যের প্রশ্নে হাত পেতেছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানি বা ইংরেজদের কাছেই। 'বাবু'-দের হয়ে ওঠবার পিছনে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ইংরেজ তোষণের কথা প্রথম থেকে বারবার বলা হয়েছে, সেই প্রবণতার উর্দ্ধে তো দ্বারকানাথও উঠতে পারেননি। তাই তো ইংরেজ কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের জজ, সিভিলিয়ান, সামরিক কর্মচারী, তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ তাবৎ সমাজের মাথা এবং সর্বোপরি গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের বোন মিস্ ইডেনের উপস্থিতিতে বিরাট নৈশভোজের আয়োজন করা হয়, তখন সেই সভার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। আসলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় শাসকের শাসনদণ্ড শাসিতের এত গভীরে প্রবেশ করে যায় যে কেবল শিক্ষার মাপকাঠিতে তার বিচার হয় না। উনিশ শতকের জটিল সময়ে দাঁড়িয়ে কে 'বাবু' আর কে নয়, এই বিচারটাই খুব কঠিন। যদি সেই ভার আমরা 'বাবুত্ব'-এর বাইরে থাকা বৃহত্তর সমাজে এনে ফেলে তাহলে দেখব যে একইভাবে দ্বারকানাথকেও ব্যঙ্গই করা হয়েছে ছড়ায়—

"বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটারি ঝনঝানি,
খানা খাওয়ার কত মজা

আমরা তার কি জানি?
জানে ঠাকুর কোম্পানি।"[১৯]

আবার সেই 'আমরা'-'ওরা'-র গল্প শুরু হয়ে যায়। যে গল্পে উনিশ শতকীয় নগর কলকাতার বৃহত্তর সমাজ ইংরেজ তোষণ-অনুকরণ, ইংরেজদের ব্যবহার, বিলাসী জীবনযাত্রার সূত্রেই 'বাবু'-দের আলাদা করে দেয়। আর এভাবেই সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক নগর কলকাতার ছড়ানো ছড়ায় 'বাবু'-দের জীবনবৃত্তান্ত যা কিনা একান্তভাবেই সমাজ এবং সময় দ্বারা চালিত এবং নির্ধারিত।

তথ্যসূত্র

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা', কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০০৭, পৃ. ৩৫।
২। পূর্ণেন্দু পত্রী, 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৩৫।
৩। Homi K. Bhaba, 'Of Mimicry and Man' The Location of Cultlure, London, Routhledge, 1994, Page 86।
৪। পূর্ণেন্দু পত্রী, 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৪৬।
৫। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯, পৃ. ১০।
৬। একই, পৃ. ১১।
৭। পূর্ণেন্দু পত্রী, 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ২২।
৮। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯, পৃ. ২১।
৯। একই, পৃ. ১৩।
১০। পূর্ণেন্দু পত্রী, 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৬২।
১১। একই, পৃ. ২৮।
১২। একই, পৃ. ৩৮।
১৩। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩।
১৪। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলকাতা প্রসঙ্গে : ছড়া গান কবিতা', কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ১১১।
১৫। একই, পৃ. ১১২।
১৬। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলকাতা প্রসঙ্গে : ছড়া গান কবিতা', কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ১১২।
১৭। পূর্ণেন্দু পত্রী, 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৫০।
১৮। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫।
১৯। পূর্ণেন্দু পত্রী, 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৫৪।

উল্লেখপঞ্জি

- অবন্তীকুমার সান্যাল, 'বাবু', কলকাতা প্রতিক্ষণ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৭।
- গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নিম্নবর্গের ইতিহাস, ৫ম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০৮।
- ছন্দা রায়, বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ সাময়িকপত্রের দর্পণে কলকাতা ১৮০০-১৮৭২, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩।
- পূর্ণেন্দু পত্রী, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮।
- পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতার গল্পসল্প, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবশিলিং ২০০২।
- বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ২য় প্রকাশ, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ২০০৭।
- বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, বাক্‌সাহিত্য, ১৯৯০, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩।
- বিশ্বনাথ জোয়ারদার, পুরনো কলকাতার অন্য সংস্কৃতি, নিউ দিল্লি, দিগঙ্গন, ২০০৯।
- ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কবি জীবনী', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।
- মণিলাল খান, ছন্দা রায়, সনৎকুমার নস্কর, সম্পাদিত, ঔপনিবেশিক ও নব্য ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯।
- সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০০৮।
- হরিহর শেঠ, কলিকাতা পরিচয়, কলিকাতা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৪১।

আশি-এর চার নারী কবি : অথ 'বিবাহ' কথা

দেবহূতি সরকার

বিবাহ প্রস্তাবনা

শতশরতের বীর্যে আমার স্বামীকে সাজাও
অগ্নিদেবতা—আমার প্রথম স্বামী ছিল সোম,
দ্বিতীয় দেবতা না, গন্ধর্ব, তৃতীয় অগ্নি
তুমি, যে আমাকে মানুষ স্বামীর হাতে তুলে দেবে।

(অগ্নি-প্রদক্ষিণ/মল্লিকা সেনগুপ্ত)[১]

বৈদিক মন্ত্রে নারীর স্বামী হিসেবে সোম, গন্ধর্ব ও অগ্নির উল্লেখ পাওয়া যায়। নারী কিন্তু মনে মনে কামনা করে তার মানুষ স্বামীটিকেই। বিবাহে অগ্নি-প্রদক্ষিণ কালে তাই অগ্নির কাছে তার প্রার্থনা "শতশরতের বীর্যে আমার স্বামীকে সাজাও অগ্নিদেবতা" যাতে ভবিষ্যৎ জীবন ভরে ওঠে দাম্পত্য শরীরময়তার পূর্ণতায়। কত আকাঙ্ক্ষা, কত শত স্বপ্ন নিয়ে নারী প্রবেশ করে তার বিবাহে, জীবনের প্রথম এক রক্তসম্পর্কহীন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে, যে সম্পর্ক কিনা একটা সময়ের পরে তার জীবনের সবটুকু হয়ে দাঁড়াবে।

সাহিত্যের নানাবিধ রূপগুলির মধ্যে কবিতা সেই সংরূপ যা কিনা জীবন ছেনে ছেনে রচিত হয়। যা স্পর্শ করে গভীর মর্মমূলে তাই পেতে পারে কাব্যভাষা। নারীর কাছে যখন 'বিবাহ' সদর্থক বা নঞর্থক ভাবে ততটাই অতলে টান দিতে পারে, তখনই তা তার কবিতায় রূপ পায়। 'বিবাহ' এই বহুকাল ধরে চলে আসা প্রথাটি শাস্ত্র মতে নারীর কাছে বৈদিক সংস্কার স্বরূপ। বাস্তবে পুরোনো বাড়ি, পুরোনো জীবন ছেড়ে একটি মেয়ে প্রবেশ করে নতুন সম্পর্কের গৃহে। তার জীবনটাই অনেকাংশে পালটে যায়। স্বামীর পদবি, তার প্রতিপত্তি, তার সামাজিক অবস্থান সবকিছুরই অংশীদার হয়ে ওঠে সে। পুরুষটির ক্ষেত্রে বিবাহে এক নতুনত্বের সূচনা হয় ঠিকই কিন্তু তার ত্যাগ অনেকটাই কম, স্ত্রীর পরিচয়ে তাকে পরিচিত হবার সামাজিক অবস্থা কখনোই তৈরি হয়নি। তাই সে বিবাহকে সহজেই রোমান্টিসাইজ করতে পারে। সত্তরের কবি মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতায় পাই সেই সুখস্বপ্নের টুকরো—

বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো,
ফিরে এসে খুব আলতো ডাকবো, বউ কই...
রাজি?

(বিবাহপ্রস্তাব/মৃদুল দাশগুপ্ত)[২]

কিন্তু নারীর কাছে বিবাহ একটি অতি জটিল সম্পর্ক সূচনা যার ওপর নির্ভর করে আছে তার ভবিষ্যৎ। রোজগারহীন নারীর একমাত্র অর্থনৈতিক অবলম্বন এই বিবাহ। তাই তার কবিতায় স্বপ্নের পাশাপাশি বেশিরভাগ জায়গা দখল করে নেয় নানা সমস্যা, চাপা কান্না, জমা ভয় আর বিবিধ প্রশ্ন। চৈতালী চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিবাহ' নামক কবিতায় দক্ষ বুননশিল্পীর মতো নানা উপমায় বুনে

নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন বিবাহকে। 'বিবাহ প্রস্তাব'-এর পাশাপাশি সে কবিতা পড়লেই তফাৎটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটি ঝরনার চারপাশে, যা কিছু রাজনীতি সবই শোভা পায়।
বটঝুরি, ছত্রাকজাতীয় পরগাছা, অল্প পা পিছলোনো পথ,
দু-চারটে রুগ্ন পরি, টিলার বাঁদিক থেকে চকিত ভূতের সরে যাওয়া,
মরশুমি রেপ ও পিকনিক।
জল কি রক্তিম তবে, তা জানি না। শুধু
ইতস্তত চকমকি পাথরের মতো
দুটো খুদে-খুদে জুতো, লাল টুপি, আলেজ্বলা ফ্রক, ফুটফুটে।
জল ভাঙে, উৎসব-শুরুতে।

(বিবাহ/চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)[৩]

বিবাহ নামক ঝরনাটিকে ঘিরে নামে নানা সম্পর্কের বটঝুরি, সাময়িক পদস্খলন, ভূতগ্রস্ত দিন রাত, দাম্পত্য ধর্ষণ, আবার পিকনিকের মতো কখনো সখনো ভালোবাসা। বিবাহকে কেন্দ্র করে নারীকে দমিয়ে রাখার যা কিছু রাজনীতি সবই জড়ো হয়। তবে রক্তাক্ত হতে হতেও চকমকি পাথরের মতো জেগে থাকে সন্তান। লক্ষণীয় কবিতাটির আশ্চর্য গঠন। কঠোর সমালোচনাও যে কত কাব্যিক হতে পারে তার অনুপম সাক্ষ্য কবিতাটি।

বিবাহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বিবাহের সমালোচনার পাশাপাশি কখনো বা আবার দেখি বিবাহকে নস্যাৎ করে ফেলতে চাইছেন কোনও কবি—

বিবাহে বিশ্বাস নেই, জানাই প্রস্তাব
এসো যেন কাঁকড়ার মতো দুইজন
খোলা আকাশের নীচে উদ্যত মিলনে
যে যার খোলের ছিলা খেলায় নির্জন

....

অভিমান কোরো, তবু বিবাহপ্রস্তাব
কখনো করব না বলে কোরো না আক্ষেপ
এই বালিয়াড়ি জুড়ে আভূমা প্রণয়
দেখো, অনশ্বর থাকবে, সমুদ্র সাক্ষী

(প্রাকৃত/সুতপা সেনগুপ্ত)[৪]

বিবাহ প্রথাকে নাকচ করে এক মুক্ত যৌনতার কথা এখানে বলছেন কবি সুতপা সেনগুপ্ত। নারী এখানে সাহসিনী, যাবতীয় সমাজ প্রথাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে, সমুদ্র সাক্ষী রেখে প্রণয়কে স্বীকৃতি দিতে চায় সে। এও এক ধরনের অবস্থান, তবে অবশ্যই তা বিবাহের সাপেক্ষে। নইলে বিবাহের কথা উঠতই না। ফলে 'বিবাহে বিশ্বাস নেই' বলার মধ্যেই বিবাহ সম্পর্কিত একটি দৃষ্টি তৈরি হয়ে গেল। বিবাহকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা গেল না চিন্তাস্থান থেকে।

বিবাহ শব্দটির অর্থ বিশেষ ভাবে বহন করা। বিশেষ ভাবে অর্থাৎ সকল দোষ, গুণ সমেত সমস্ত সুখে সংকটে পরস্পরের পাশে থাকা। বিবাহ ঘটে দুজনের মধ্যে কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে জুড়ে যায় দুটি পরিবার। জন্ম হয় নতুন প্রজন্মের। ফলে বিবাহের ভেতরে পরতে পরতে, ভাঁজে

ভাঁজে লুকিয়ে থাকে নানা জটিল মাত্রা। দেহ থেকে গৃহস্থালি, সহাবস্থান থেকে লিঙ্গরাজনীতি সবই ঘনিয়ে ওঠে বিবাহকে কেন্দ্র করে। সেইসব পরত খুলে খুব গভীরে কী যে জেগে থাকে আমরা তারই একটা বিবৃতি খুঁজতে চেয়েছি—মল্লিকা সেনগুপ্ত, সুতপা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ও সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়—গত শতকের আশির দশকের এই চারজন উল্লেখযোগ্য নারী কবির কবিতায়।

শরীর কথা বলে

"বিবাহ কী? অথর্ববেদ অতি স্পষ্ট নিরাবরণ ভাষায় বলেছে 'ক ইদং কস্মা অদাৎ? কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা। কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি। কামৈতত্ত্বে ভূমিস্ত্বা গৃহণাত্বন্তবীক্ষম্।। (৩/২৯/৬) 'কে কাকে এটি দিয়েছে? কাম দাতা, কাম প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। কামের সঙ্গে তোমাকে প্রতিগ্রহণ করছি। কাম, এই তোমার ভূমি, তোমাকে গ্রহণ করুক অন্তরীক্ষ।"[৫]

বিবাহ সম্পর্কের প্রাথমিক ভিত্তিই কাম বা যৌনতা। দুটি পরস্পর পরিচিত বা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানব মানবী যৌনতার সমাজসিদ্ধ একটি ছাড়পত্র পেয়ে যায় বিবাহের মাধ্যমে। যে যৌনসম্পর্ক বিবাহপূর্ব বা বিবাহ বহির্ভূত হলে অনায়াসে উঠে আসে অসংখ্য প্রশ্নচিহ্ন (যদিও তা হামেশাই ঘটে) কিন্তু সেই যৌনতাকেই পরিপূর্ণ ভাবে উদ্‌যাপন করা হয় বিবাহের মধ্যে। দাম্পত্য প্রেমে যৌনতার প্রসঙ্গ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি প্রশ্নাতীত। অথচ প্রকৃত সুখী দাম্পত্য যৌনতার খুব কমই অকপট কাব্যিক রূপ আমরা খুঁজে পাই নারীর কলমে। যৌনতার বহুমাত্রিক প্রকাশের মধ্যে কোথায় যেন কমতি পড়ে দাম্পত্যের। তবে তেমন ছবি যে একেবারেই নেই তা নয়। যেমন—

হংস দম্পতির আজ এইখানে সোহাগশর্বরী
চারহাত ভরে মাটি তুললাম, গাঁথা হল ভিত,
তিরধনুকের চিহ্ন আঁকলাম মাটির দেয়ালে
দ্বীপ জন্ম নেবে আজ শ্বেত ও প্রবাল ঘূর্ণিস্রোতে।

(সোহাগশর্বরী/মল্লিকা সেনগুপ্ত)[৬]

এই সোহাগশর্বরী কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত এবং তাঁর স্বামী কবি সুবোধ সরকরের যৌথ কবিতার বই। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের বিবাহের রাতে। দুই কবি তাঁদের বিবাহ তিথিতে দাম্পত্যের আগমনী গান গেয়ে গেছেন কবিতায় কবিতায়। অন্তত মল্লিকার কবিতাগুলি সবই দাম্পত্য প্রেমের। তাতে কখনও জেগে ওঠে শরীর কখনও যৌন ঈর্ষা—

কেন, কেন, কেন তুমি দ্বিতীয় নারীর নাম ডেকে ফেলো ভুলে
সম্রাজ্ঞীর চোখ থেকে রোষবহ্নি নেমে এসে ওই শ্যাম উরু
ইন্দ্রনীল করে দিক,

(ইন্দ্রনীল হোক তার উরু/মল্লিকা সেনগুপ্ত)[৭]

কোথাও বা আবার বিরহ—যা কিনা দাম্পত্য বিরহ, তাই তাতে যৌনতা বিরল নয়। মনে পড়ে, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিরহকাব্য 'মেঘদূত', কালিদাস লিখেছিলেন দাম্পত্য বিরহকে উপজীব্য করে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। এ যুগের নারীর লেখায় পেলাম তারই উলটোপিঠ—

দয়িত বিরূপ হলে কালশিটে পড়ে যায় আমার জঙ্ঘায়
দধি, খই ও শর্করা মন্ড করে ছুড়ে দিই কাকের হাঁমুখে

কৃষ্ণরেশমের মতো ঝকমক করে ওঠে ওদের পালক
এরপর যতবার কা কা করে ডেকে ওঠে ত্রিসীমানা জুড়ে
আরো ততদিন দেরি স্বামী ফিরবার।

(প্রোষিতভর্তৃকা/মল্লিকা সেনগুপ্ত)[৮]

এই যে মিলন, এই যে বিরহ, এই যে সন্দেহ, এই যে ঈর্ষা এ সবই কিন্তু এ বইতে বসতি করে প্রেমের ভিত্তির ওপর। কিন্তু যখন প্রেম চলে গিয়ে সন্দেহটাই বড়ো হয়ে ওঠে তখন জেগে থাকে শুধু পাশব শরীর সম্পর্ক। কেবলমাত্র গায়ের জোরে পুরুষটি অধিকার করে নিতে চায় নারীর শরীর যা কিনা সে পেয়েছে বিবাহ সূত্রে। দাম্পত্যে সে শারীরিক সম্পর্ক তখন পৌছে যায় ধর্ষণের পর্যায়ে। মল্লিকারই অপর কবিতায় সে ছবি স্পষ্ট—

মশারি গুঁজে দিয়ে যেই সে শোয় তার
স্বামীর কালো হাত হাতড়ে খুঁজে নিল
দেহের সাপব্যাঙ, লাগছে ছাড়ো দেখি
ক্রোধে সে কালো হাত মুচড়ে দিল বুক
বলল, শোনো শ্বেতা, ঢলানি করবে না
কখনো যদি ওই আকাশে ধ্রুবতারা
তোমাকে ইশারায় ডাকছে দেখি আমি
ভীষণ গাড্ডায় তুমিও পড়ে যাবে,
শ্বেতার শ্বেত উরু শূন্যে দুলে ওঠে
আঁকড়ে ধরে পিঠ, স্বামীর কালো পিঠ

(স্বামীর কালো হাত/মল্লিকা সেনগুপ্ত)[৯]

এ কবিতায় যে ছবিটি উঠে আসে তাকে দাম্পত্য ধর্ষণের একটি Perfect Picture বললে খুব ভুল বলা হয় না। কবিতার প্রথম পংক্তিটিই শুধু প্রেক্ষাপট, তার পরই শুরু হয়ে যায় action। স্বামীর হাতটির স্পর্শই বুঝিয়ে দেয় যে তাতে কোনো প্রেম নেই, সে হাত তাই 'কালো হাত'। সেই হাতের স্পর্শে দেহ তো জেগে উঠলই না বরং মানব শরীর নারীটির কাছে হয়ে উঠল মানবেতর কোনো প্রাণী। কালো হাত তাই শরীর নয় খুঁজে পাচ্ছে 'দেহের সাপব্যাঙ'। প্রতিবাদ করায়, সেই হাত আরও ভয়ংকর অত্যাচারী হয়ে 'মুচড়ে দিল বুক'। এতক্ষণ স্বামীর শারীরিক ক্রিয়ার পর এবার স্বামীর বক্তব্যের স্বরটি বলে দেয় 'আকাশে ধ্রুবতারা'ও যদি ইশারায় ডাকে তাহলে নারীটিরও নিস্তার থাকবে না। বলা হল না যা তা হল 'তোমার কোনো দোষ না থাকলেও তুমি গাড্ডায় পড়ে যাবে।' এই শুনে মেয়েটির প্রতিক্রিয়া কী? 'শূন্যে দুলে ওঠা'। অসম্ভব মুন্সিয়ানায় এক পাশবিক দেহ মিলনে উরুর দুলে ওঠার মধ্য দিয়ে মল্লিকা এঁকে দিলেন মেয়েটির মানসিক ভিত্তির দুলে ওঠার চিত্রটি। আর সেই ভিত্তি স্থির রাখার আকাঙ্ক্ষাতেই মেয়েটি আঁকড়ে ধরে স্বামীর পিঠ। যদিও সে জানে সে পিঠ আসলে 'কালো পিঠ'।

শ্বেতারা, তা সে স্বনির্ভর হোক বা স্বামী নির্ভর অনেক সময়ই কেবলমাত্র 'বিবাহ' নামক সম্পর্কের আশ্রয়ের স্থিতিটুকু টিকিয়ে রাখতে শত লাঞ্ছনার পরও আঁকড়ে ধরে স্বামীর কালো পিঠ। অনেক সময়ই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মেনে নেয় স্বামীর নিগ্রহ। কারণ এখনও বহু নারীর কাছে দাম্পত্য ধর্ষণের সংজ্ঞাটিই স্পষ্ট নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী দাম্পত্য ধর্ষণ এখনও ক্রিমিনাল

অফেন্স-এর পর্যায়ভুক্ত নয়, যদি না সেটি ১৫ বছরের কম বয়সের মেয়ের সঙ্গে ঘটে।[১০] অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাম্পত্য ধর্ষণটি ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যদিও পরিসংখ্যান বলে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও একাধিক দাম্পত্য ধর্ষণ ঘটে চলেছে। এ নিয়ে নারীবাদীরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন 'শ্বেতা'দের রক্ষা করতে। সেই লড়াই-এরই একটা অংশ যেন হয়ে ওঠে নারীর লেখায় 'স্বামীর কালো হাত' জাতীয় কবিতাগুলি। সরাসরি না হলেও মানুষের মনে সচেতনতা জাগাতে, 'শ্বেতা'দের অবস্থানটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই সব কবিতা।

সব ক্ষেত্রে ধর্ষণ নয়। কেবলমাত্র যৌনতার পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে কখনও কখনও দাম্পত্যে স্থিত রমণীটির মন। সে মন তখন চায় যৌনতার বাইরে শুধুমাত্র সাহচর্যের টাটকা বাতাস। তখন তাকে পড়তে হয় সমালোচনার মুখে—মারাত্মক সে সমালোচনা।

শরীরের নুন চাখা হলো খুব,
এবার কি বালিয়াড়ি? বালি আর মরাশাঁস ঝিনুকের স্বাদ?
অবিরাম সমুদ্রনুনের ঝড়ে
হারিয়ে যাওয়ার পর
জিভ জ্বলে, এত খাঁজ, সারাদিন চোখে জল আসে

সারাদিন চোখে জল, সারাদিন
শুধু চারপাশে মাথাহীন মেয়েদের ধড়, আর এইটুকু মোটে বালিয়াড়ি;
এতেই কুলোয় নাকি? ইচ্ছে করে নুনে ডুবে মরি।
অথচ ওই তো, মনে হয় খুব কাছ থেকে, হাওয়া দিচ্ছে যৌনতাবিহীন
"চলো, দেখে আসি," কতদিন বলেছি যে,

বলে, নাকি ব্যঞ্জন রুচবে না!

(*যৌনকাতর নয়/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়*)[১১]

যৌনতার নুন ছাড়া দাম্পত্যের ব্যঞ্জন এতই আলুনি কি? এই প্রশ্ন থেকেই তো একসময় মন উঠে যায় সম্পর্ক থেকে যৌনতা থেকে—

তোমারও তো প্রথা ছিল পুরুষশরীরে। তবে আজ
স্পৃহা কেন, নিস্পৃহার কোলাহল কেন,
ভ্রূণহীন অলীক সংগম যেই ছুটে আসছে
আয়না-থেকে-আয়না ভেদ করে...

(*বিবাহঋতু : ক/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়*)[১২]

যে সঙ্গম কোনও তৃপ্তির ভ্রূণ বহন করে না তাতে এক সময় নিস্পৃহাই কেবল সম্বল হয়ে পড়ে নারীটির কাছে।

দাম্পত্যে যৌন অত্যাচার থেকে যৌনতায় নিস্পৃহার ছবি দেখতে দেখতে, ভয় হয় এতটাই বিস্বাদ কি তবে সে সম্পর্ক যার জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করে থাকি? তখনই মোহময় সজীবতা নিয়ে ফুটে ওঠে 'সংরাগ'-এর মতো একটি দুটি কবিতা—

প্রবেশ করেছে যেন দৃঢ় মেঘনাদ
ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন তুলোর ওপর

চারিয়ে গিয়েছে যেন গাছের শেকড়
যেন চট্টগ্রামে ঘোর বর্ষা ঘূর্ণিঝড়
উলটেপালটে খসে পড়ে থরের মরুতে

রজনীগন্ধার শাদা চাদর বিছানো
তার ওপর নেমে আসে স্বপ্নের বিমান

ভোররাত্রে জেগে ওঠে পুরনো দম্পতি।

(সংরাগ/মল্লিকা সেনগুপ্ত)[১৩]

নারীর কবিতার কলমে দাম্পত্য যৌনতা এভাবেই তার আলো আর কালো নিয়ে আমাদের স্পর্শ করে, ভীত করে, সর্বোপরি ভাবিত করে।

বিবাহ অ-সুখ

মনুসংহিতা বলে—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিক স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোগ্নিপরিক্রিয়া।।

"স্ত্রী লোকদের বিবাহবিধি বৈদিক সংস্কার বলে কথিত, পতিসেবা গুরুগৃহে বাস এবং গৃহকর্ম তাদের (হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্যা।"[১৪]

অর্থাৎ নারীর জীবনে বিবাহই একমাত্র চরিতার্থতা। পতিসেবা ও গৃহকর্ম ছাড়া নারীর আর কোনও পুণ্য নেই। মনুর সময় থেকে কেটে গেছে প্রায় দু'হাজার বছর। কিন্তু তবু এখনও অনেক মেয়ের জীবনেই এক এবং একমাত্র কাজ বিবাহ, পতিসেবা ও গৃহকর্ম। অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী নন এমন অনেক মেয়ের কাছেই বিবাহ একটি অন্যতম জীবিকা হয়ে ওঠে। সিমোন দ্য বোভায়ার ভাষায়—"marriage, in a word, is a more advantageous career than many others."[১৫] কিন্তু বিবাহ মেয়েগুলিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিলেও তাদের নিজেদের সময় বলতে আর কিছু থাকে না। সকাল থেকে রাত অবধি স্বামী-সন্তান-পরিজনদের সেবা, নানাবিধ গৃহকর্ম আর অধিক রাতে বিছানায় স্বামীর চাহিদাপূরণের যন্ত্র হয়ে ওঠে মেয়েগুলি। ফলে মনের গভীরে কোথাও যেন জমতে থাকে অসুখ। বেটি ফ্রিডান তাঁর 'ফেমিনাইন মিস্টিক' গ্রন্থে এই অসুখের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, সমস্ত কর্তব্য পালন করেও কোনও প্রশংসা তো জুটছেই না বরং মিলছে কেবল সমালোচনা—

তোমরা ম্যাজিকপ্রিয় বড়ো, জানি;
মাঝেমধ্যে সঙ্ দেখতে ভালোবাসো, খেলা হয় খুব।
কৃষ্ণপুতুলটি তাই মেট্রোপলিসের থেকে একটু দূর সাজঘরে
সোনায় ঝিকিয়ে ওঠে বছরে অন্তত চারদিন।
তখন কি পড়ে না মনে গাজনের মাঠে সেই
ঝুঁকে-পড়া শ্মশানজবাটি, শরীরভোর কালো, লাল চোখ,
যাকে আজ, তোমার জন্যেই শুধু, ম্যাজিক দেখাবে বলে
আসতে হল বুকে হেঁটে, ধনুকের ছিলায় জড়িয়ে!

যথেষ্টের একটু বেশি গেরস্থালি এতেও না-পাই যদি,
এর চেয়ে আরো বড় উজ্জ্বল মুখোশ কিনতে
এবার তবে কি আমি পুরুলিয়া যাব?

(দেবী/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)[১৬]

এই যে নারীটি, সে ম্যাজিকপ্রিয় স্বামী, পরিজনদের মনোরঞ্জনের জন্য বুকে হেঁটে, ধনুকের ছিলায় জড়িয়ে আসে ম্যাজিক দেখাতে। সন্তুষ্ট করার সমস্ত চেষ্টা যখন বিফলে যায়, তখনই ধরা পড়ে মেয়েটির মনোগত অসুখটি। যথেষ্টর একটু বেশি গৃহস্থালির আশায় তার এই প্রাণান্তকর খেলা দেখানোর চেষ্টা। নিজের মুখকে আড়ালে রেখে চাহিদামতো মুখোশ জড়িয়ে সংসারী নারীটি দেখিয়ে চলে ম্যাজিক। কারণ নারীকে যে 'মায়া'ময় হতেই হবে। তবু যখন হাত জুড়ে আসে শূন্যতা শুধু, তখন মেয়েটির অন্তরাত্মা কথা বলে ওঠে। এবার কি তবে তাকে আরও বড়ো, উজ্জ্বল কোনও মুখোশের সন্ধানে যেতে হবে? সমস্ত নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে ক্রমাগত এক থেকে অন্যতর মুখোশ চাপিয়ে নিতে নিতে হারিয়ে যায় একটি মেয়ে। সে ক্লান্ত হয়। বিবাহ সম্পর্কিত সমস্ত মোহমুক্ত হয়ে বলে ওঠে—

না, আমায় সিঁদুর দিয়ো না। সিঁদুরে শূন্যের বোধ নেই। শূন্য মানে নীল, অবিরাম।

(বিবাহঋতু : খ, তিন/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)[১৭]

অনেক সময় সন্তানের জন্য রমণীটি মৃত সংসার ফেলে আসতে পারে না। আবার, অনেক সময় ভ্রূণের অস্তিত্বই প্রকৃত অবস্থাটিকে বুঝতে সাহায্য করে—

ডানদিকে তাকিয়ে তুমি বেশ্যাচোখে খুঁজেছিলে সিঁদুরকৌটোটি,
বাঁদিকের কাঁচ ভেঙেছিল;
পাউডারপাফের ছাঁচে প্রিয় পুরুষের মাথা সাজানো রয়েছে,
দেখে ঝুঁকতে গেলে যেই
চিরুনির গূঢ় চাপে
পেছনেই কেঁপে উঠল পাঁচমাসের ভ্রূণ;
এইভাবে সব আয়না ভেঙেচুরে
আর এখন বাকি থাকে কিছু?
—আমি সেই আয়নাটুকু ছিড়ে নিয়ে মুখে ধরি ভয়ে :
ছুঁচের-ডগায়-মাখা দেখি সিঁদুরের গুঁড়ো, মৃত।

(বিউটি পার্লার/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)[১৮]

আয়নায় যা দেখা যায় তা প্রতিচ্ছবি। মুখোশের আড়ালে থাকা চাপা কান্নাটির ছবি কখনো দেখা যায় না। চারপাশের সমস্ত বিভ্রমের আয়না ভেঙেচুরে গেলে, সেই ভাঙা আয়না মুখের সামনে ধরলে নজরে পড়ে, না মুখচ্ছবি নয়, নিষ্ফল বিবাহের ছবি। মৃত সিঁদুরের গুড়ো। কখনো বা আবার বিবাহ সময় থেকেই বিনা কারণে মেয়েটিকে শুনতে হয় নানা গঞ্জনা—

হেঁট মুন্ড সাতজন এয়ো একে একে ঘুরে এলো।...
"ঝাড়ে বংশে অলুক্ষুণে!" সাতজন এয়ো শুধু মন্ত্রের
মতো ঘুরে ঘুরে...

(বিবাহঋতু : খ, দুই/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)[১৯]

এখনো তো পছন্দ অপছন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলের বাড়ির লোকেদের। মেয়েটি, তার বাড়ি, সমস্ত কিছু নিয়ে সমালোচনা ধুয়োর মতো বাজতে থাকে। দোষ তো শুধু মেয়েদের থাকে, পুরুষ তো সোনার আংটি, তা সে বেঁকাই হোক না কেন!

'বিজ্ঞাপনের মেয়ে' সিরিজের ১১ নং কবিতায় চৈতালী চট্টোপাধ্যায় একটি চমৎকার গল্পরচনা করেন—

আমাদের বিয়ের রাত পেরিয়ে আমরা এখন সরাসরি ঢুকে
পড়েছি এক আগ্নেয় গোলকের মধ্যে। চারপাশে শব্দ করে পুড়ছে
পাটকাঠি, চিতাকাঠ; যা কিছু নির্বাণযোগ্য ছিল এতদিন, আজ বারুদ
পেয়ে হু-হু করে জ্বলে যাচ্ছে শুধু। দু-হাতে চোখ ঢেকে তোমাকে
বলে উঠি, দোহাই, আমাকে নিয়ে চলো এক নিশ্ছিদ্র বাসরকক্ষে। সাড়া
দেয় না কেউ। মুখ ফেরাতেই নজর পড়ল আয়নায়। ওখানে কী
কাছে মেয়েটি? হুবহু আমার মতো সিঁথেয় তুলছে সিঁদুর। আলতার
শিশিতে কাঠি ডুবিয়ে রাঙিয়ে নিচ্ছে পায়ের পাতা। গলি পেরিয়ে
এই অন্দরমহলের দরজা ওকে চিনিয়ে দিল কে? সে-ঘর থেকে
পালিয়ে এসে দেখি, আমারই ভাঁড়ারের আনাচে কানাচে
ফুটে আছে সেই অসতী মেয়ের পদছাপ।

(*বিজ্ঞাপনের মেয়ে, ১১/চৈতালী চট্টোপাধ্যায়*)[২০]

এই কবিতায় দেখছি বিবাহের উৎসব শেষ হলেই প্রকৃত সত্য জীবন সামনে এসে দাঁড়ায়। যাবতীয় অসন্তোষ, জমা ক্ষোভ আস্তে আস্তে ইন্ধন পেয়ে জ্বলে উঠতে থাকে। বিবাহপূর্ব জীবনের স্বপ্ন আর বিবাহ পরবর্তী বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। তাই যা কিছু দাহ্য ছিল সম্পর্কের আনাচে কানাচে তা দৈনন্দিনতার সংঘর্ষে জ্বলে উঠে সৃষ্টি করে এক আগ্নেয় গোলক। তখন কোনও নিশ্ছিদ্র বাসরঘরে গিয়ে লুকোনোর উপায়ও থাকে না। আয়নায় নিজেকে দেখে অচেনা মনে হলেও, অচিরাৎ ভুল ভাঙে, বোঝা যায়—"ধূলিকনার মতো মিশে যাচ্ছি ইথারে আর সেই পুঞ্জীভূত বাতাস অনায়াস গতিতে সেঁধোচ্ছে ওই মেয়ের গভীরে।"[২১] সকল প্রতিকূলতা সহ্য করে দাম্পত্যে সুখী না হতে পারার অপরাধে এই মেয়েগুলিকেই সমাজ 'অসতী' বলে বিজ্ঞাপিত করে। তাই এই মেয়েটিও বিজ্ঞাপনের মেয়ে।

বিবাহের উৎসবে আলো সজ্জা আর সানাই-এর সুরে যে উজ্জ্বল দাম্পত্যের ভবিষ্যৎ ছবি দেখানো হয়, আসলে সেই দাম্পত্যের গলিঘুঁজিতে কতটা অন্ধকার লুকিয়ে থাকে, তাকেই নানা কবিতায় প্রকাশ্যে এনেছেন ৮০-র দশকের নারীরা। তাদের কবিতাগুলি তাই আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি, অনেকগুলি প্রশ্নচিহ্নের সামনে।

তবু চিরন্তন

অসুখী দাম্পত্য, দাম্পত্য নির্যাতন, বিবাহে বীতস্পৃহা থেকে একটু চোখ সরিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব, এসব সত্ত্বেও বহু দম্পতি একসঙ্গে কাটিয়ে দেয় পঞ্চাশ-ষাট বছর। তাদের মধ্যে সমস্যা কি নেই? থাকলেও তা থেকে উত্তরণের পথও খুঁজে নিয়েছেন তারা। ৮০-র দশকের নারীর কবিতায় বিবাহ সম্পর্কিত শেষ কথার অন্বেষণে নেমে মনে হয় তাঁরা সম্পর্কটির ভেতরকার

নানা সমস্যার কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই তুলে ধরেছেন দাম্পত্য প্রেমের কথাও। সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দাম্পত্য' কবিতায় দেখান ঘুমের মধ্যেও যৌথতার ছবি—

ঘুমন্ত যে, সে তো একা, কোনো একা জাগ্রতের চেয়ে,
চক্ষুহীন জাগরণ তাকে রাখে ভ্রমণচঞ্চল—
এই জেনে, ও ঘুমন্ত, আমি আজ ঝরা এ-সন্ধ্যায়
মর্মখানি ভেদ করে তোমার ঘুমের মধ্যে আসি।

....

প্রদীপ উলটে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা গরম বাসনা
পড়েছে তোমার মুখে। নষ্ট হয়ে গেছ, অন্ধকার!
পোড়া ত্বক, চোখের চঞ্চল মণি পুড়ে ছাই হলে
জেগে দেখো, ও ঘুমন্ত, এ ভ্রমণে একা আছ কিনা!

(*দাম্পত্য/সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়*)[২২]

মনে হয়, এই সম্পর্কটির সমালোচনা সত্ত্বেও এর প্রতি একটা গোপন আস্থা রয়েই গেছে। বিরহকে নস্যাৎ করার বদলে এর সুস্থতাই কামনা করেন ৮০-র দশকের নারী কবিরা। মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' বইতে লিখেছিলেন—"লিভ টুগেদার করবেন না বিয়ে করবেন সে আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু যাই করুন কেউ অন্যকে ছোট ভাববেন না। লিঙ্গসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই পরিবার টিকে যাবে।... এঙ্গেলস চেয়েছিলেন পরিবারের বিলুপ্তি। একটু সংশোধন করে আমরা যদি পরিবারের কর্তা-প্রজা বা শাসক-শাসিতের সম্পর্ককে পাল্টে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সাম্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, তাহলেই পরিবার বেঁচে থাকবে, নয়তো অদূর ভবিষ্যতে তার বিপদ আসন্ন।"[২৩] এই কবিদের কাছে বোধহয় সেই সুস্থ সম্পর্কটাই একমাত্র কাম্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সহমর্মিতা ও লিঙ্গসাম্য। 'বিবাহগাথা'-য় মল্লিকা 'গতকাল' ও 'সমকাল' নামক কবিতায় বিবাহের অন্তর্গত আঁধারের কথা বলেন—

অন্ধকারের কন্যা ক্রমশ
অন্ধকারের জননী
জীবন থাকতে আলোর ঠিকানা
আলোর অঙ্ক করোনি

(*গতকাল/মল্লিকা সেনগুপ্ত*)[২৪]

তারপর থেকে কী যে হয়ে যায়
মধুঋতু খায় পিঁপড়ে
তরুণী বউকে জ্বালিয়ে হাসেন
কায়েত এবং বিপ্রে

(*সমকাল/মল্লিকা সেনগুপ্ত*)[২৫]

কিন্তু শেষ অবধি তাঁকে পৌঁছোতে হয় 'মহাকাল'-এ, যেখানে বিবাহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে দুটি মানুষের জীবন পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে।

তবু সৈকতে বসে দম্পতি
এ ওকে বলছে 'কেঁদো না'

একজীবনের আনন্দগানে
মিশে যায় ব্যাথা বেদনা
বিন্দু বিন্দু ঘামে আর নুনে
মেঘে রোদে আর বর্ষায়
মিশে যায় দুটি মানুষ মানুষী
রাগে অনুরাগে ভরসায়

একটি দীর্ঘ ভ্রমণের পথ
একা দুটি অভিযাত্রী
একটি যৌথ কর্মশিবির
তেতো দিন মধু রাত্রি

(মহাকাল/মল্লিকা সেনগুপ্ত)[২৬]

৮০-র দশকের চারজন নারী কবির বিবাহ সম্পর্কিত কবিতার নিবিড় পাঠে আমাদের মনে হয় তাঁরা বিবাহকে নানা ভাবে উদ্‌যাপন করেছেন, সমালোচনা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেননি কখনোই। আর শেষ অবধি আস্থা পোষণ করেছেন বিবাহ সম্পর্কের সুস্থতায় ও চিরন্তন যৌথতায়।

তথ্যপঞ্জি

১. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'অগ্নি-প্রদক্ষিণ', "কবিতা সমগ্র", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা ২৩।

২. মৃদুল দাশগুপ্ত, 'বিবাহপ্রস্তাব', "নির্বাচিত কবিতা", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, অফবিট প্রকাশন, ১৭ অক্টোবর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩।

৩. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, 'বিবাহ', "চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ২০০৬, পৃষ্ঠা ১১৪।

৪. সুতপা সেনগুপ্ত, 'প্রাকৃত', "সুতপা সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা", পরিবর্তিত দে'জ প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৭।

৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য, "বিবাহপ্রসঙ্গে", দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ক্যাম্প, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৭১।

৬. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'সোহাগ শর্বরী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩।

৭. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'ইন্দ্রনীল হোক তার উরু', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

৮. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'প্রোষিতভর্তৃকা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫।

৯. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্বামীর কালো হাত', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০।

১০. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধর্ষণ সংক্রান্ত ৩৭৫ ধারার ব্যতিক্রমে লেখা রয়েছে—Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape. সূত্র—www.districtcourtallahabad.up.nic.in/articles/ipc.pdf.

১১. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'যৌনকাতর নয়', "সংযুক্তা বন্দ্যোপাধায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০৫, পৃষ্ঠা ১১।

১২. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিবাহঋতু : ক', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯।

১৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'সংরাগ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩।

১৪. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক), "মনুসংহিতা", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৬৪।

১৫. Simone de Beauvoir, "The Second Sex", First Vintage Edition, London, Vintage Books, 1997, Page 450.

১৬. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেবী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪।

১৭. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিবাহঋতু : খ, তিন', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০।

১৮. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিউটি পার্লার', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০-১১।

১৯. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিবাহঋতু : খ, দুই', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০।

২০. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, 'বিজ্ঞাপনের মেয়ে ১১', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৪।

২১. ঐ, পৃষ্ঠা ১৪।

২২. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দাম্পত্য', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭।

২৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত, "স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ", প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৮৭।

২৪. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'গতকাল', "কবিতা সমগ্র", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২।

২৫. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'সমকাল', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২।

২৬. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'মহাকাল', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২-৭৩।

উল্লেখপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, 'চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ২০০৬।

২. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১২।

৩. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

৪. সুতপা সেনগুপ্ত, 'সুতপা সেনগুপ্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা', পরিবর্তিত দে'জ প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অতুল সুর, 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', প্রথম পরিবর্তিত আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৩।

২. অরূপ আচার্য (সম্পা.), এখন কবিতা : সময়ের চিহ্ন, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, একান্তর, ১৯৯৪।

৩. ঊর্মি রায়চৌধুরী, ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মনন প্রকাশন, ২০১০।

৪. পুলক চন্দ (সম্পা.), 'নারীবিশ্ব', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, গাঙচিল, ২০০৮।

৫. বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), নারীপৃথিবী : বহুস্বর, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, ২০১১।

৬. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

৭. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী (সম্পা.), 'ভারত ইতিহাসে নারী', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯।

৮. সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'বিবাহপ্রসঙ্গে', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ক্যাম্প, ১৯৯৬।

৯. সুতপা ভট্টাচার্য, 'মেয়েলি সংলাপ', প্রথম কারিগর সংস্করণ, কলকাতা, কারিগর, ২০১৩।

১০. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক), 'মনুসংহিতা', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

১১. Engels, 'The Origin of the Family, Private Property and the State', First Progress Edition, Moscow, Progress Publishers, 1948.

১২. Kate Millett, 'Sexual Politics', University of Ilinois Press, 2000.

১৩. Margaret Walters, 'Feminism A very short introduction', First Indian Edition, Delhi, Oxford University Press, 2007.

১৪. Simone De Beauvoir, The Second Sex, First Vintage Edition, London, Vintage Books, 1997.

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে 'অপরাজিত' অপুর জয়যাত্রা : ব্যক্তি-বাঙালির জীবন-পথের তীর্থযাত্রা

দেবাশিস দেবনাথ

একুশ শতকের বাল্যবেলা এখন। এই নতুন শতকের তরুণ-অরুণ আলোয় দাঁড়িয়ে গা সেঁকছে আমাদের সভ্যতা; আর হিসাব কষে দেখছে, একুশ শতকের এই প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞানচর্চা স্বাস্থ্যচর্চা পরিবেশচর্চা ইত্যাদির কোথায় কতটুকু উন্নতির উত্তাপ সঞ্চার করতে পারলাম আমরা। ঠিক এইখানে নব শতাব্দীর সাহিত্যচর্চার সম্মুখেও এসে দাঁড়ায় এই জিজ্ঞাসা। উত্তরে বলা যায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবসভ্যতার উপযোগী ও স্থায়ী যে প্রগতিকে আমরা এযাবৎকাল রচিত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে চিহ্নিত করতে পারি, সেখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপু' চরিত্র এক উজ্জ্বল মাইলফলক। গত শতাব্দী পেরিয়ে এই একবিংশ শতাব্দীতেও 'অপু' আমাদের প্রগতির প্রতীক, উন্নতির উৎসাহ।

পথের পাঁচালী (১৯২৯) ও অপরাজিত (১৯৩২) দুই খণ্ড; বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে ব্যক্তির রোমান্টিক ও আধ্যাত্মিক জীবনচেতনার এক মহাকাব্যিক বিস্তার রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতাকে ভেঙে এই ট্রিলজি নিয়ে আসে এক আশ্চর্য বাঁকবদল। এই ট্রিলজি অনুসরণে চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায় যে ট্রিলজি নির্মাণ করেন, (পথের পাঁচালী-১৯৯৫, অপরাজিত-১৯৫৬ ও অপুর সংসার-১৯৫৮); তা-ওই মহাকাব্যের আরেক আশ্চর্য পাঠান্তর। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের এই যুগান্তকারী রূপবদল, বিশ্বের দরবারে বাঙালি জীবনের ব্যক্তিক-সামাজিক দ্বন্দ্ব ও উন্নয়নের এক স্পষ্ট পথরেখা এঁকে দিয়ে গেছে। আজকের বাঙালি কিশোর-যুবকের জীবনসংগ্রামেও এই সৃষ্টির সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। প্রাসঙ্গিক করে তোলে অপুর জীবন অভিযানকে। অপুর এই অভিযানে আছে—প্রথমত, প্রকৃতির কোলে শিশুমনোবিকাশের আদর্শ ছবি; রহস্যময় শিশুমনের সুলুক সন্ধান। দ্বিতীয়ত, কিশোর ও সদ্যযুবক অপুর দাসত্বের লাঞ্ছনা ও অপমানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত, সংকীর্ণ গ্রাম্য পরিসরে নির্বিঘ্ন পৌরোহিত্যের জীবিকাস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে আধুনিক শিক্ষার আলোর সন্ধানে কলকাতা শহরে পাড়ি। চতুর্থত, মায়ের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠতা ছিন্ন হয়ে অনিবার্য বিচ্ছেদ ও দূরত্ব। পঞ্চমত, শহরজীবনের মমতাহীন যান্ত্রিক উদাসীনতায় বিপর্যস্ত অপুর লড়াই ও আত্মানুসন্ধান।—এভাবেই জীবনযুদ্ধের একটার পর একটা স্তর পেরিয়ে নারীপ্রেম, বিহার, সংসার যাত্রার প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের প্রতিভা ও মেধার উচ্চাকাঙ্ক্ষী যাত্রাপথ কীভাবে প্রতিকূলতার অন্ধকার কেটে আলোর দিকে ছুটে চলে, অপু-জীবনের সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রগণ রূপায়ণে সেই শাশ্বত চিত্রটি চিরকালীন হয়ে রয়েছে এবং আজও আমাদের ভাবাচ্ছে, উদ্দীপ্ত করছে।

শিশু অপুর দুটি চোখ : গরিব ভারববর্ষের গ্রাম্য বালকের স্বাতন্ত্র্যের সূত্রপাত

শিশুমনের সোনারকাঠির ছোঁয়ায় আমাদের বহবান এ জীবনের টুকিটাকি অতি তুচ্ছ ঘটনাও অভিনবত্ব আর চমৎকারিত্বের মাত্রা পায়। অলৌকিক কল্পলোকের মায়াজাল তাকে ডাকে, আচ্ছন্ন করে। আর কল্পনাপ্রবণ শিশু অপু এই মায়ালোকের দুনিয়াদারিতে কেবল বাংলার না, গোটা বিশ্বের

শিশুর প্রতিনিধি। কোনোভাবে রসের সৌন্দর্যহানি না ঘটিয়ে বিভূতিভূষণ শিশুমনের এই রহস্যকে ভেদ করেছেন এবং পাঠককেও সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেই রহস্যের রূপ দেখিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

অবোধ শৈশবের অর্থহীন আনন্দগীতি দিয়ে অপুর তিন উপন্যাসবাণী দীর্ঘ পথচলার মধুর সূচনা। এখানে সে দিদি দুর্গার অধিনায়কত্বের ছায়া পেয়েছে। কিন্তু সময়ে সময়ে কল্পলোকবাসী বিশিষ্ট অপু অজান্তে সেই অধিনায়কত্বের ছায়া ছেড়ে হেঁটে গেছে নিজস্ব রোদরেখা ধরে। দুর্গা অপুকে প্রথম পরিচয় করায় প্রকৃতির সাথে। তারপর দুর্গা ব্যস্ত হয়ে পড়ে পেয়ারা-নারকেল চুরিতে, তেঁতুলের আচার বানিয়ে খাওয়ায়, পুণ্যিপুকুর খেলায়। তুচ্ছ কিছু ফুলফল লতাপাতার বস্তুগত প্রাপ্তিতেই সে খুশি থাকে, এবং এখানেই তার প্রকৃতিযাত্রা শেষ হয়ে যায়। অথচ কী আশ্চর্য, অপুর প্রকৃতিযাত্রার এখান থেকেই সূচনা! অপু প্রকৃতির আত্মার সঙ্গে গভীর গহিন একাত্মতা আবিষ্কার করে বসে। প্রকৃতির সাহচর্যে এলে এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা তাকে ঘিরে ধরে। সে উদাস হয়, সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তবে এও স্বীকার্য যে, অপরপক্ষে দিদি দুর্গার চাপল্য, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, লোভাতুরতা, আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব, ছোটোখাটো চুরি, খেলাধূলায় নেতৃত্ব, আর প্রকৃতির কোলে যখন খুশি অনায়াস বিচরণ; এসব দোষগুণের সমাহার অপুর বাল্যকালের একটি মূল্যবান ও পরিপূর্ণ পাঠ। পাশাপাশি দারিদ্র্য আর তুচ্ছতায় ঘেরা গ্রাম্যজীবন অপুর গভীর দুটি চোখের সামনে বিবিধ জাদুর পসরা সাজিয়ে বসেছিল। ইন্ধন যুগিয়েছিল বিচিত্র কল্পনায়।

এই সময়ে অপুর প্রাপ্তিগুলি হল—১. একা একা রামায়ণ-মহাভারতের অভিনয়, ২. গ্রামের 'আতুরি বুড়ি'-র সঙ্গে গল্পের ডাইনিকে একাকার করে প্রবল ভীতিসঞ্চার, ৩. বাবার সঙ্গে প্রথম গ্রামের বাইরে গিয়ে বহির্বিশ্বের প্রতি তৃষ্ণাসঞ্চার, ৪. শকুনের ডিমের সাহায্যে আকাশে ওড়ার আজববিদ্যায় পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রয়াস, ৫. গ্রামে যাত্রাগানের পালা দেখে সুপ্ত কবিত্বশক্তির প্রথম উন্মোচন ও সাহিত্যপ্রতিভার জাগরণ, ৬. মা-পিসিমার কাছে বিভিন্ন গল্প শোনা ও বিচিত্র গল্প পাঠ, এবং ৭. নিশ্চিন্দিপুরের বাস তুলে ভাগ্যান্বেষণে কাশীযাত্রার ফলে অজানাকে জানার সুবর্ণসুযোগ। এইসব ঘটনাপ্রবাহ তার হৃদয়পুরের বাল্যভূমিতে কল্পনায় উৎকৃষ্ট বীজ বুনে দিয়ে গেছে। এই বীজের যোগ্য ফসল ফলবে অপুর আসন্ন কৈশোরে।

> "...অপুর মনে থাকে না জীবনের দৈন্যের কথা। 'তুমি কে?' 'আমি অপু'। 'তুমি বড় ভাল ছেলে, কী বর চাও?' অপু কোনো বর চায় না। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। সে শোনে 'শরৎ মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা নীল নির্জন আকাশপথে, এক উদাস, গৃহবিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।' অপু কোনো বর চায় না—এখানেই তার স্বাধীনতা, তার স্বাতন্ত্র্য, এখানেই কলোনির কেরানি-রক্তের গঞ্জনা থেকে তার মুক্তি। এ মাপের চরিত্র বাংলা উপন্যাসে এর আগেও নেই, পরেও নেই।"

(সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; দে'জ নভে. ১৯৯৫; পৃ. ২৬৩)।

এই অপু লতাগুল্মবনবাদাড়ঘেরা দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি। সে এই দেশের গ্রামীণ জলবায়ু আর চিরপরিচিত উপকরণ থেকেই অনায়াসে আহরণ করে কল্পনার পুষ্টি, সৃজনের উদ্দীপনা। আজও আমাদের দেশের শিশুদের মধ্যে যেখানে যখন কল্পনা, তার ডানা মেলার পরিসর

পায়, সেখানেই যেন আরেকটি অপুর জন্মসম্ভাবনা উঁকি মারে। এখানেই বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র সার্থকতা। এখানেই অপু পুনঃ পুনঃ প্রাসঙ্গিক।

বিভূতিভূষণের কলম থেকে সত্যজিতের ক্যামেরা : শৈশবের নবপাঠ

শিশুমনোজগৎ উন্মোচনের এই বিভূতিভূষণীয় পাঠের এক অভিনব পাঠান্তর ঘটে যায় ১৯৫৫ সালে। ১৯২৯-এ রচিত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রায় নাম্নী এক মহান শিল্পীর হাত ধরে উঠে এল চলচ্চিত্রের পর্দায়। এখন আমরা সত্যজিৎ রায়ের সেই আত্মপ্রকাশের লোভনীয় বর্ণনা থেকে বিরত হয়ে সত্যজিৎ রায় পুনরাবিষ্কৃত 'অপু' চরিত্রের দিকে তাকাব। বিভূতিভূষণের কাহিনিকে প্রয়োজন মতো সংক্ষিপ্ত করেছেন সত্যজিৎ। তাতে অবশ্য অপু চরিত্র নির্মাণে কোথাও কোনো ঘাটতি হয়নি। বরং যোগ্য মানুষের হাতে পড়ে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের যুগান্তকারী চিত্রকল্প ও নাট্যমুহূর্তের জন্ম দিয়ে কাহিনিটি নিজেকে নবকলেবরে প্রতিষ্ঠা করে গেছে। এই প্রসঙ্গে যে ভুবনজয়ী দৃশ্যমালা 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে ছড়িয়ে আছে; তার মধ্য থেকে এখানে অসাধারণ তিনটি দৃশ্য আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আরেকবার ফিরে দেখা যাক।

প্রথমেই আসা যাক দুর্গা-অপুর রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার দৃশ্যটিতে। অপুর মনে রেলগাড়ি বিষয়ে যে অপার কৌতূহল রয়েছে, সেটি বোঝাতে সত্যজিৎ আগে একটি দৃশ্য নির্মাণ করলেন।

'পথের পাঁচালী' চিত্রনাট্যের প্রাসঙ্গিক অংশ

সর্বজয়া—চুলটা কখন বাঁধা হবে শুনি? বোস।

স্লেট থেকে মুখ তুলে অপু দুর্গার দিকে চেয়ে দুষ্টু হাসি হাসে। দুর্গা জিভ বের করে তাকে ভ্যাঙায়। অপু আবার উবু হয়ে লিখতে থাকে।

ওদিকে ইন্দির প্রদীপের শিখার কাছে ছুঁচ ধরে তাতে সুতো পরানোর চেষ্টা করছে।

সর্বজয়া দুর্গার চুল আচঁড়ায়।

দুর্গা—মা, তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?

সর্বজয়া—মাথা নাড়াস না।

দুর্গা—রাণুদি কিন্তু জানে।

সর্বজয়া—এই তো চুলের ছিরি! তেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই আর চারগুছির বিনুনি!

সর্বজয়া দুর্গার চুল আঁচড়াতে থাকে।

দুর্গা—মা জানো। — রাণুদিকে দেখতে আসবে!

অপু বুঝতে পারে না।

অপু—কে আসবে রে?

হরিহর হিসেবের খাতার পাতা ওল্টায়।

ইন্দির তখনো সুঁচে সুতো পরানোর চেষ্টা ক'রে চলেছে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে হরিহরকে দাওয়ার দিকে চেয়ে দেখে।

রেলগাড়ির বাঁশি শোনা যায়। অপু উৎকর্ণ।

অপু—দিদি

দুর্গা—উঁ?

অপু—তুই রেলগাড়ি দেখেছিস?

দুর্গা মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে।

অপু—কোথায় রে?

দুর্গা—ওই ত—সোনাডাঙার মাঠ, তারপর ধান খেত, তারপর রেলের রাস্তা—

অপু—একদিন যাবি?

হরিহর এর মাঝে হঠাৎ বলে—

হরিহর—দেখি বাবা কি লিখলে?

অপু স্লেট এগিয়ে দেয়। হরিহর খুশি।

হরিহর—বাঃ! বেশ হয়েছে। আচ্ছা, এবার লেখ—'ওই ভূত, বাপরে!'

এই দৃশ্যটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় রেল-এর সঙ্গে অপু চরিত্রটির এক নিবিড় ও প্রতীকী সম্পর্কের সূচনা করলেন। অপু-ট্রিলজির পরবর্তী দুটি ছবি 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার'-এ এই রেল অপুর জীবন পথের বিভিন্ন বাঁকে বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে আসে।

> "এই ঐন্দ্রজালিক মুহূর্তটির মতো কোনো মুহূর্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে এখনো পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি, পৃথিবীর চলচ্চিত্রেও সম্ভবত অতি বিরল। ... হঠাৎ সেই স্থানু স্তব্ধতার বুক চিরে দূরে বহু দূরে প্রাণের একটি মৃদু স্পন্দনের মতো কোথায় একটি চলমান রেলগাড়ির শব্দ এল ও... মিলিয়ে গেল। রেখে গেল একটি বালকের প্রাণে একটি কল্পনার রেখা। প্রবহমাণ গতির রেখা। ... বালকের এই অনুভবটি ঠিক মতো ভাষায় প্রকাশ নয়, যেন সংগীতের মতোই অনির্বচনীয়, এবং সত্যজিৎ রায় তাঁর অনবদ্য চলচ্চিত্রের শব্দ ও ছবির দর্পণে এটিকে ঠিকই বেঁধে ফেলেছেন অবিস্মরণীয়ভাবে। নিঃসন্দেহে এটি অপু চিত্রত্রয়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এবং ট্রেনের চিত্রকল্প ও মোটিফের এইটাই শুরু। ...যেহেতু ঠিক যখন অপু মন দিয়ে শ্লেটে কী লিখছিল তখনই দূরে শুনতে পেল 'ঝিক ঝিক' ট্রেনের শব্দ—তাই ট্রেনের সঙ্গে অপুর শিক্ষারও একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। 'অপরাজিত' ছবিতে দেখব যে, বৃহত্তর জগতের আকর্ষণে, যে 'প্রগতি'র টানে শিক্ষার মধ্য দিয়ে অপু তার জীবনকে-ভাবনাকে ক্রমশ প্রসারিত করে দিয়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তরে—এই ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দটি তার শুরু। যেন মনে হয় বাল্যের এই দূরশ্রুত নৈশ ট্রেনের শব্দটি অপুকে পরবর্তীকালে প্রতিদিন এক বৃহত্তর জীবনের ডাক দিত। ... এই সিকোয়েন্সটি মূল গ্রন্থে নেই ... এটি সত্যজিৎ রায়ের মৌলিক অবদান, ...চরমভাবে চলচ্চিত্রীয়।"

(অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়; প্রতিভাস, ১ম প্রকাশ, অখণ্ড সং, জুলাই ২০১২, পৃ. ৫৯)।

তারপর একদিন আসে সেই স্বপ্ন সফল হওয়ার সুযোগ, সেই বিশ্বজয় করা দৃশ্য। সাদা আকাশে কালো ধোঁয়া ওগলাতে ওগলাতে সশব্দে চলে যায় সেই যন্ত্রদানব, চলে যায় অজানা

আশ্চর্য পৃথিবীর দিকে। চলে যাওয়ার পরও সেই পথটির পানে চেয়ে থাকে অপু, চেয়ে থাকে হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে বাংলার, ভারতের বা বিশ্বের শাশ্বত শৈশব। আজ মনে হয়, রেলগাড়ির দিকে চেয়ে থাকা ওই চোখদুটি শুধু অপুর চোখ নয়, তা দরিদ্র ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নাগরিকের দুটি গ্রামীণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী চোখ। নিশ্চিন্দিপুরের শ্লথ জীবনের মাঝখান চিরে এই ছুটে চলে যাওয়া—অপুর দুচোখে বুঝি রেখে যায় অচেনা জগতের রোমাঞ্চ, আর চেনা জীবনের গতিহীনতার অবুঝ বিষাদ।

কিন্তু দুর্গা? বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সে তো রেল দেখতে পায়নি! সেখানে যে দুর্গাকে পাওয়া যায়, সে বড়োই অভাগা। তার দারিদ্র্য, অবহেলা আর অশিক্ষাপীড়িত গ্রামীণ মেয়ে-জীবনের সীমিত স্বাদ-সন্ধানটুকুতেও মৃত্যু এসে থাবা বসিয়ে যায়। সুতরাং ট্রেনের মাধ্যমে বৃহত্তর জীবনের প্রতি যে প্রতীকী তাৎপর্য অপুকে ঘিরে আবর্তিত হয়, সেখানে দুর্গাকে নিয়ে আসাটা মোটেই মানানসই হবে না। তাহলে প্রশ্ন জাগে, দীর্ঘ উপন্যাসের সিনেমা উপযোগী সংক্ষিপ্তকরণে সত্যজিৎ রায় যখন অপু-দুর্গাকে সোনাডাঙার মাঠে একদা অকস্মাৎ একত্রে রেলগাড়ি দেখার সুযোগ করে দিলেন, তখন কি দুর্গার জীবনসত্য ব্যাহত হল না?

> 'মূল উপন্যাসে আছে মৃত্যুর আগে দুর্গার শেষ সজ্ঞান উক্তিটিই হচ্ছে 'ট্রেন' নিয়ে —রোগশয্যায় সে অপুকে ডেকে বলে, 'অপু', সেরে গেলে একদিন আমাকে রেলগাড়ি দেখাবি?' ...মেয়ে বলে গ্রাম্যরীতি অনুযায়ী সে শিক্ষা পেল না, অবহেলা পেয়েছে পদে পদে—এবং অকালে মারা গেল, জীবনকালের মধ্যে সে ট্রেন দেখতে পেল না, এবং তার অতৃপ্ত কামনা নিয়েই সে চলে গেল—এটাই 'ট্রেনে'র প্রতীকী তাৎপর্যের সঙ্গে খাপ খায়। সুতরাং এখানে বিভূতিভূষণই সর্বাংশে সঠিক। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে দুর্গাকে দিয়েও ট্রেন দেখিয়েছেন কিনা তা নিয়ে একটা দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেছেন। (এবং সব কিছুর শেষে) ছবিতে দুর্গার শেষ কথা, 'ভালো হলে একদিন রেলগাড়ি দেখতে যাব, আগে থেকে যাব-তাহলে ঠিক দেখতে পাব।' অর্থাৎ এতক্ষণে বোঝা যায় দুর্গা সেবার ট্রেন দেখতে পায়নি।"

(অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়; প্রতিভাস, ১ম প্রকাশ, অখণ্ড সং, জুলাই ২০১২, পৃ. ৭০)।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, হঠাৎ ঘাসের বনে দুজনে ট্রেনের শব্দ শুনতে পেয়েই ছুটতে শুরু করেছিল। কিন্তু একটু যেতেই দুর্গা পা মচকে পড়ে গিয়েছিল। মোহাবিষ্ট অপু দাঁড়ায়নি। সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়োচ্ছে। এরপর ভুবন মাতানো সেই দৃশ্য। সাদা কাশের বনের ওপার থেকে শরৎ আকাশে কালো ধোঁয়া মাখাতে মাখাতে ছুটে এল ট্রেন। এবং সেই দীর্ঘ লং-শটে দুর্গা নেই, অপু একা! এরপর ক্যামেরা যখন লাইনের বিপরীত দিক থেকে দৃশ্যটি দেখায়, তখনো ছুটন্ত রেলের কামরার ফাঁকে ফাঁকে ওধারে শুধু অপুকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। না, দুর্গা তখনো পৌঁছাতে পারেনি। সুতরাং বিভূতিভূষণের রচনায় রেলগাড়িকে কেন্দ্র করে অপু ও দুর্গার যে ভিন্ন অবস্থান এবং পৃথক জীবনসত্য উঠে আসে, সত্যজিৎ রায় অতি যত্নে তা লালন করেন। শুধু তাই নয়, ওই 'ট্রেন'কে মোটিফ করেই 'অপু-ট্রিলজি'কে অনন্য মাত্রা দান করেন। এই 'ট্রেন' প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামতটি আমাদের আরও সমৃদ্ধ করে যায়।

> "তাঁর (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) বিষয় ছিল জীবনসত্য। তাঁর বিষয় ছিল জীবনসত্যের অশেষত্বকে অনুধাবন। সে অশেষত্বের প্রেক্ষাপটে—সেই অসীমত্বের প্রেক্ষাপটে রোম বার্লিন লণ্ডন এবং চিংড়িপোতার খাল, নিশ্চিন্দপুরের মাঠ ঘাট সমান সত্য হয়ে ওঠে। ...এই সত্যকে প্রতিফলিত করতে গেলে বাস্তব সমস্যার দ্বারা অস্পৃষ্ট এক শিশুর স্বাধীন উন্মোচনকে দরকার—দরকার দুর্গার মতো এক বালিকাকে, যার অন্বিত হবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল ভারতীয় রেলগাড়ির এনে দেওয়া দূরের স্বপ্ন"

(সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; দে'জ, নভে. ১৯৯৫; পৃ. ২৬১)।

অপুর এই রেলগাড়ি দেখার দৃশ্যকে পৃথিবীর চলচ্চিত্র বিপ্লবের নিরিখে অন্য আরেক ভাবে দেখেছেন কেউ কেউ। যেমন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> "সত্যজিৎ রায় ...শিকড় ছিন্ন করে উদ্বাস্তু হওয়ার প্রক্রিয়াকে শতাব্দীব্যাপী কি তারও বেশি গ্রামজীবনের ধ্বংসের মধ্যে দেখেন। ... এই ভয়ানক ট্রাজেডিকে সত্যজিৎ বাস্তববাদী একরৈখিকতায় ধরেন না : দারিদ্র্য-দুঃখের মধ্যেও একটা প্রকৃতির ভূমিকাকে বড় করেন। ঔপনিবেশিক প্রগতি বা আধুনিকতার সঙ্গে ঐ প্রকৃতির সংঘাতকে দেখান রেলগাড়ির চাকার ফাঁক দিয়ে নুয়ে পড়া ঘাস, ফুলকে দেখিয়ে। দভঝেঙ্কোর মতো না হলেও, এক ধরনের লিরিক্যাল স্বর বিচ্ছিন্ন ধাক্কায় ছবিতে নিয়ে আসেন ... যে বাস্তবতা আনেন, তা ইতালীয় নব্য বাস্তবতা নয়, আবার ১৯৫৫ অবধি ভারতীয় চলচ্চিত্রে ক্রমবিকশিত বাস্তব থেকে আলাদা ... এ যেন চলচ্চিত্রের ছন্দ-গতি-ধ্বনি সম্বলিত অন্য টেক্সট।"

(পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপরেখা : বাণীশিল্প, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৭৭)।

মিষ্টির বাঁক নিয়ে চিনিবাস এসেছিল অপুদের বাড়ির ধারে। লোভাতুরা দুর্গা অপুকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়েছিল বাবার কাছে পয়সার জন্য। অপু ব্যর্থ হয়ে দিদির কাছে ফিরে আসে। চিনিবাস আর সময় নষ্ট না করে হাঁটা লাগায় ধনী মুখুজ্জেবাড়ির দালানের দিকে। মিষ্টির লোভে দুর্গা অপুকে নিয়ে চিনিবাসের পিছন পিছন চলতে থাকে। আবার অপুর পশ্চাতে হাঁটা লাগায় তাদের নেড়ি কুকুর। সারিবদ্ধ সকলের ছায়া পড়ে জলে। অসহায় দারিদ্র্য আর সরল শৈশবের এক অনবদ্য কৌতুক মাখানো করুণ দৃশ্য জন্ম নেয়। কিন্তু এভাবেই সত্যজিৎ এই দৃশ্যের ইতি টানলেন না। আমরা দেখি,—মিষ্টিওলাকে দেখে বড়োবাড়ির দালানে ছোটোদের হৈচৈ আর বড়োদের কেনাকাটার উৎসব লেগে গেছে। সেই ফাঁকে একটু মিষ্টি পাবার আশায় দুর্গা মোক্ষম সময় বুঝে তক্ষুণি মুখুজ্জেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছে। দুর্গা তার ভাইটিকেও মিষ্টান্ন আস্বাদনের এই সম্ভাব্যতার দিকে ডেকেছিল। কিন্তু মুখচোরা অপু আর এগোয়নি। সে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে মুখুজ্জেদের বড়ো দরজায়। আর নিশ্চুপে দেখে গেছে সকলের খেলা। হয়তো বা নিজের অজান্তে দেখেছে সে বৈষম্যভরা সমাজেরও খেলা। কিন্তু ক্ষমতার কৃপা থেকে দূরেই থেকেছে। এখানেই এই দৃশ্যকে আর কেবল করুণ বলা যায় না। এখানে শিশুর আত্মমর্যাদাবোধের নিজস্ব ব্যাকরণটি নিভৃতে গঠিত হতে থাকে। অপু চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে সত্যজিতের এমন অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি চলচ্চিত্র সমালোচকদের বারবার বিস্ময়াবিষ্ট করেছে।

> "পরিবেশ সৃষ্টিতে এমন ...আবেদন...পৃথিবীর যেকোনো দেশের যেকোনো শ্রেণির যেকোনো মনের ওপর ছোঁয়া দেবেই। বিন্যাসের ধারাটিকে নিওরিয়ালিজম বলে আখ্যাত করা যায় — যুদ্ধোত্তর কালে ইতালির দে সিকা প্রমুখ মণীষীবৃন্দের প্রচেষ্টায় যে ধারার প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাদের পিছনে ফেলে এমন উঁচু ধাপে গিয়ে পৌঁছেছেন, যার ধারে কাছে কিছু আছে বলে জানা নেই।"

(পঙ্কজ দত্ত; পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি—পথের পাঁচালী; চলচ্চিত্র ১৫ সমালোচনা; সম্পাদনা-অজয় সরকার; বাণীশিল্প, ১ম প্রকাশ, ২০০৫)।

মনে করা যাক ছবির সেই দৃশ্য, যেখানে—জ্যৈষ্ঠের শেষ আর আষাঢ়ের আগমনকাল। আকাশ ঈষৎ মেঘলা। দুইধারে চাষের ক্ষেত, মাঝের সংকীর্ণ মেটে রাস্তা ধরে অপু চলেছে দুর্গার হাত ধরে পাঠশালায়। এই তার প্রথম পাঠশালায় যাওয়া। অনেকক্ষণ ধরে পর্দায় এই হেঁটে যাওয়া চলতে থাকে। কোনো শব্দ নেই। ধীরে ধীরে দূরে চলে যায় দুইজন। সেই যাওয়াটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন জাগে,—কেন সেই পথ এত জনহীন? গরিবের ঘরে বিদ্যালাভের ইচ্ছা আর বড়ো হওয়ার স্বপ্ন ব্যক্তির একার লড়াই-এর ছবিটাই আঁকছিল বলে?—কেন সে পথ এত সংকীর্ণ? আর্থিক অনটন আর গ্রামীণ অশিক্ষার কঠিন বাধা বিদ্যালাভের রাস্তাটাকে মোটেও চওড়া হতে দিচ্ছিল না বলে? তাই যদি হয়, তবে সে লড়াই-এর প্রাসঙ্গিকতা আজকের ভারতেও খুব একটা কমেছে কি? অপুর ওই পাঠশালার দিকে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য আজও এক নীরব বিপ্লব। পার্থক্য বলতে, বিংশ শতাব্দীর দুর্গা অপুকে পাঠশালায় রেখে বাড়িতে চলে এসেছিল। আজ একবিংশ শতকের দুর্গা তার ভাইটিকে স্কুলে রেখে নিজে হয়তো ঘরে ফিরে আসবে না। এবার নিজের জন্যেও সে বই-খাতা হাতে রোজ যাবে এই পথে। অন্তত যেতে চাইবে।

নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে কাশীবাস : কৈশোরের সংকটে শৈশবের শুশ্রূষা

স্থির উপার্জন ও ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দের করুণ আশায় হরিহর স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে কাশীবাসী হলেন। কাশীর গঙ্গার ঘাটে কথকতা করে আর পাঁচালি শুনিয়ে পুণ্যার্থীদের কৃপায় হরিহরের একপ্রকার কেটে যাচ্ছিল। তবে অপুর দিক দিয়ে বিচার করলে সে দিনগুলি মোটেও কোনোক্রমে বা একপ্রকারে কাটছিল না। বরং বহুবিচিত্র মানুষে সদাব্যস্ত কাশীর জনবহুল মন্দির, গলি, রাস্তাঘাট অপুর বিশ্বগ্রাসী দুটি চোখের সামনে নিত্যদিন প্রদর্শন করছিল রঙিন সরস এক চলমান চিত্রমালা। কৈশোরে প্রবেশ করেছে অপু। এই সময়টায় তার সঙ্গে নেই গ্রাম্য প্রকৃতির নিবিড় তন্ময়তা। কিন্তু কাশীর দিনগুলির এই বিচিত্র বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে পুষ্টি জোগাচ্ছে, পরিণত করে তুলছে। ঠিক এই সময়েই হরিহরের আকস্মিক মৃত্যু সর্বজয়া ও অপুকে কঠোর ও নিষ্ঠুর এক পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড় করায়। এসময় এক ধনীগৃহে সর্বজয়া রাঁধুনির কাজ নেয়। অপু জানল, কাকে বলে দাসত্বের লাঞ্ছনা। মনিবের আশ্রমের অবহেলা এবং একদিন বড়োবাবুর বেত্রাঘাত কিশোর অপুর আত্মমর্যাদাবোধে প্রবল ঝড় তোলে। অপুর পিতৃহীন কৈশোরে, বয়ঃসন্ধির মূল্যবান ওই সময়-পরিধিতে এভাবে একদিকে এল গ্লানি, অপমান, অসহায়তা; অন্যদিকে কাশীনগরের রাস্তায় রাস্তায় বাঁধন-শাসনহীন ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা। পরিস্থিতিটা কুসঙ্গে প্রবেশ এবং বিপথে বয়ে যাওয়ার জন্য অতিমাত্রায় অনুকূল ছিল। কিন্তু আমরা দেখি, ওই অনুকূল পরিবেশ অন্তত অপুর কাছ থেকে কোনো আনুকূল্য পেল না। অপুর স্বপ্নময় নীরব কৌতূহলী চোখদুটো আর নিষ্পাপ মনটা তবুও নিষ্কলুষ ও অক্ষত রইল। কিন্তু কী করে? একটু ভাবলেই সেই উত্তর খানিকটা আন্দাজ করা যায়। অপু আসলে বহিরঙ্গে অভাবী

হলেও অন্তরঙ্গে ছিল ধনী। নিশ্চিন্দিপুরে তার গোটা শৈশবটা সর্বদিক থেকে পেয়েছিল পরিপূর্ণ পুষ্টি। মা-বাবা-পিসিমার নিখাদ স্নেহ, দিদির অধিনায়কত্বের নির্মল ছায়া, প্রকৃতির রহস্যময় কোলে অভাব বিচরণ; গ্রামজীবনের তুচ্ছতার মধ্যেই অপার বিস্ময়, ঘরে গল্পপড়া ও শোনার উদার অবকাশ, আর অবশ্যই তার কল্পনায় ডুবে যেতে পারার বিশিষ্টতা। এই সব জলে-বাতাসে-খনিজে-সারে অপুর মনোভূমি হয়েছিল সুগঠিত। শৈশবের এই পুঁজি তার কৈশোরের অনাবৃষ্টির সময়টুকুতে চালিয়ে যেতে পেরেছিল অন্তরগত জলসিঞ্চন। তাই কাশীবাসে একদা বিরুদ্ধ জলবায়ুও অপুর কোমলতা ও চরিত্রসুগন্ধকে হরণ করতে পারেনি। তার সহজাত সংযম, তার আশৈশব অর্জিত সম্ভ্রম ও সম্মানবোধ, তার পারিবারিক সুংস্কারের শৃঙ্খলা ও পিতৃদত্ত রুচিবোধ তাকে আগলে রাখল।

কাশী থেকে মনসাপোতা : হেডমাস্টার, গ্লোব ও হ্যারিকেন

সর্বজয়া অপুকে নিয়ে শেষমেশ কাশী থেকে এল মনসাপোতায়, জ্ঞাতির আশ্রয়ে। এবার আর পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি নয়। এবার মনসাপোতায় কয়েক বাড়িতে কিশোর অপুর বাঁধাধরা ঠাকুরপুজোর কাজ। একদিন অপু পুজো সেরে ঘরে ফেরার পথে নতুন এই জায়গার বালকদের হৈ হুল্লোড় আর স্কুল যাওয়া লক্ষ করে। সে ওই স্বাভাবিক জীবনটার জন্য নীরবে ব্যথিত তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। রাতে শুয়ে থাকা অপুর মনখারাপের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে সর্বজয়া। সর্বজয়ার কোনো প্রশ্নেই অপু মুখে কিছু বলে না। মা জানতে চায়, তার কি শরীর খারাপ? কাশীর জন্য মন খারাপ লাগছে? নিশ্চিন্দিপুরের জন্য মন খারাপ করছে? পুজোর কাজে কি কোনো সমস্যা, সে ঠিকঠিক সেগুলো করতে পারছে তো? সবেতেই ঘাড় নেড়ে মাকে সে নিশ্চিন্ত করে। তারপর স্বভাব-অন্তরমুখী অপু মায়ের কোলে সহসা মুখ গুঁজে ফিসফিসিয়ে বলে, "মা, আমি স্কুলে যাব"। ইতিমধ্যে সে কাজ ও পড়া একই সঙ্গে কীভাবে চালাবে তা পরিকল্পনা করে রেখেছে। কাজ অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান অটুট রেখে তবেই সে পড়বে, সে মাকে দিয়ে রাখে। এইখানেই বোঝা যায় কিশোর অপুর পরিণতি। শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন আর রুটিরুজির বাস্তবতাকে সে একসঙ্গে চালিয়ে নিতে শিখে গেছে। অপুর পরবর্তী জীবন-যৌবনের ঘটনাপ্রবাহকে এবার স্মরণ করলে উপলব্ধি করা যাবে, তার কৈশোরকালে রপ্ত করে ফেলা এই যুদ্ধ-কৌশলটি তার আগামী জীবনের কতটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

> "বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক 'মিস্টিক' মতবাদের বায়বীয় আবেগ ছিলো, সত্যজিৎ রায় তাঁর অপুকে এবং অপুর জগৎকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে বাস্তবতাবাদের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'অপরাজিত' ছবিতে একটি গ্রাম্য ছেলের বেড়ে ওঠা, তার সংগ্রাম, তার চেতনার বিস্তৃতি, তার যৌবনপ্রাপ্তি, এবং আরও কঠোরতর সংগ্রাম, পরিণতিতে পুরানো মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে চলা দৃপ্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে...এ...একটি অপরাজিত জীবন। এ ছবিতে সামান্য ক্ষণের জন্যে হলেও কলকাতা-পর্বে, যে কলকাতাকে দেখলাম, সিনেমার পর্দায় সর্বপ্রথম সেই সত্যিকারের কলকাতা দেখা।"

(অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়; চলচ্চিত্র ভাবনা; ফিল্ম স্টাডি সেন্টার, আসানসোল; ১ম প্রকাশ, ১লা আষাঢ়, ১৩৯২; পৃষ্ঠা ৫৯)।

অপুর বিদ্যা অর্জনের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রামীণ ভারতীয় বাঙালি-কৈশোরকে উন্নয়ন আর সংগ্রামের রাস্তা চিনিয়ে দিয়ে যায়। এই পথে সে নিজে পথপ্রদর্শকরূপে

পায় তাদের স্কুলের জহুরি-হেডমাস্টারমশাইকে। স্কুল ইন্সপেক্টরের সামনে অপুর বিদ্যাভ্যাসের দৃষ্টান্ত গোটা বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করে। তারপর থেকেই তিনি অলক্ষ্যে অপুর প্রতি যত্নশীল হয়ে ওঠেন। প্রিয় ছাত্রকে ডেকে বলেন, শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়লেই হবে না। তিনি এই ছাত্রের যোগ্য হাতে ইংরাজি সাহিত্য, দেশ বিদেশের ভূগোল; নর্থপোল আর আফ্রিকার আশ্চর্য কথা লেখা বই তুলে দেন। ছুটতে শুরু করে বুভুক্ষু অপূর্বকুমার রায়ের জ্ঞানতৃষ্ণার ঘোড়া। সে রাত্রিবেলা হ্যারিকেনের আলোয় উত্তেজিত কণ্ঠে দু-তিনটি বল হাতে মাকে সূর্যগ্রহণ বোঝায়। সর্বজয়া অবশ্য কিছুই বোঝে না। সেই শুধু ছেলের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

একদা আসে সেই সন্ধিক্ষণ। অপু স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। হেডস্যার তাকে ডেকে জানালেন আরেকটি আনন্দ সংবাদ! সে জেলায় সেকেন্ড হয়েছে। তাই সরকার থেকে সে মাসে দশটি করে টাকা স্কলারশিপ পাবে। তবে শর্ত একটাই। কলেজে পড়লে তবেই জুটবে সেই টাকা। অপু যেন স্বপ্নে আপ্লুত। কিন্তু এরপর হেডস্যার আসেন বাস্তব প্রশ্নে। সে আরও পড়বে তো? কারণ এবার যে তাকে তাহলে মনসাপোতা ছেড়ে, সংসার চালানোর বাঁধা কাজ ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে! পাশাপাশি তিনি অপুর হাতে তুলে দেন একটি গ্লোব। এটি তার ভালো রেজাল্টের উপহার। এবার অপুর সামনে মাকে রাজি করানোর পালা। সর্বজয়া রয়েছে সেই হ্যারিকেনের জগতে, যেখানে অপু এনে রাখে তার শিক্ষার জগতের গ্লোব।

অপুর স্বপ্নে সর্বজয়ার সংকট : অনিবার্য বিচ্ছেদের সুর

সর্বজয়াকে রাজি করিয়ে অপুর কলকাতা যাত্রা,—এটি 'অপরাজিত' উপন্যাস ও ছায়াছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মাতা-পুত্রের সম্পর্কের একটি বাঁকবদল। গ্রামে পৌরোহিত্যের মাধ্যমে বাঁধা অন্নসংস্থানের নিশ্চিন্ত যে জীবন, তা ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিত কলকাতা শহরে অপুর পড়াশোনা করতে যাওয়া সর্বজয়া মানতে চায় না। চিরটাকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত সর্বজয়া আবার অশনি সংকেত দেখে। গভীর অস্তিত্বের সংকট সর্বজয়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নাছোড়বান্দা ছেলের জেদাজেদিতে মেজাজ হারিয়ে চড় মেরে বসে। আবার রাতে রাগ ভাঙিয়ে ছেলেকে ভাত খাওয়ায়। অপুর জেদের কাছে পরাস্ত হয়ে তার কলকাতা যাওয়ার বাক্স গুছিয়ে দেয়। হাতে দেয় সেই কাশীতে রাঁধুনির কাজের মাইনে থেকে সযত্নে জমানো কটি টাকা।

চলচ্চিত্রের এই পর্বে সত্যজিৎ এক অসামান্য চিত্রমুহূর্ত নির্মাণ করেন। অপু চলে গেলে কীভাবে অর্থ আসবে, কীভাবে হবে তার জীবনধারণ,—অনিশ্চিত অন্ধকার সেই ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়ে মাটির ঘরটির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বিধবা সর্বজয়া। সামনে মাটির দাওয়ায় টিমটিম করে জ্বলছে কালি পড়া রুগ্ন হ্যারিকেন। সে হ্যারিকেন যেন সর্বজয়ারই প্রতিভূ। সর্বজয়া আর তার হ্যারিকেন, এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে সেই ছোট্ট গ্লোব। ম্রিয়মাণ সর্বজয়া আর মলিন হ্যারিকেনের মাঝে চকচক করে দাঁড়িয়ে আছে গ্লোব, তার গায়ে গোটা পৃথিবীর ডাক। মাকে রেখে সেই পৃথিবীর দিকে চলে যাবে মায়ের শেষ সম্বল অপু। তবু পৃথিবীরই শাশ্বত সহজ নিয়মে, অপুর সেই গ্লোবকে বিপন্নতার মধ্যেও যতটুকু সম্ভব আপনার আলো দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলবে অনুজ্জ্বল সর্বজয়ার কালিপড়া হ্যারিকেন।

'অপরাজিত' চিত্রনাট্যের প্রাসঙ্গিক অংশ

অপু গ্লোবটা দেখিয়ে—

অপু—এটা কি বল তো মা?

সর্বজয়া উত্তর না দিয়ে উঠে চলে যায়।

অপু চুপ করে বসে থাকে। ঘরের মধ্যে সর্বজয়া দাঁড়িয়ে। অপু পিছনে এসে দাঁড়ায়।

সর্বজয়া—তুই কলকাতা যাবি?

অপু—যাব না? সবাই ত যায়। সেইজন্যই ত মাষ্টারমশাই ডেকেছিলেন। সব ঠিকানা-টিকানা দিয়ে দিলেন। বল্লেন কোনো অসুবিধা হবে না।

সর্বজয়া—আর খরচটা কে জোগাবে শুনি?

অপু—খরচ আবার কি? কলেজে হাফ ফ্রি হয়ে যাবে। মাসে মাসে দশ টাকা পাব.....

সর্বজয়া চলে যায়। অপু খাটে বসে পড়ে।

অপু—একটা চাকরি জুটিয়ে নেব।

সর্বজয়া ট্রাঙ্ক খুলতে খুলতে—

সর্বজয়া—আর আমি....আমি কি গাঙের জলে ভেসে এয়েচি? তুই পুজো আর্চা বন্ধ করে চলে যাবি, আর এরা আমাকে মাথায় তুলে রাখবে না?

অপু—তাই বলে কি আমি পড়ব না নাকি? বসে বসে ঠাকুর পুজো করব?

সর্বজয়া—দোষ কি তাতে? পুরুতের ছেলে ঠাকুরপুজো করবি না ত কি লাটসাহেবি করবি?

অপু—হ্যাঁ, তাই করব।

সর্বজয়া—চুপ!

অপু—চুপ বৈকি.....তুমি যা বলবে তাই হবে না?

সর্বজয়া—একশবার হবে।

অপু—না।

সর্বজয়া অপুর দিকে এগিয়ে যায় এবং অপুকে চড়·মারে।

পরমুহূর্তেই সর্বজয়া অনুতপ্ত।

অপু ঘর থেকে গালে হাত দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। অপু দাওয়া পেরিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।

খানিক বাদে দরজায় এসে দাঁড়াল।...

সর্বজয়ার মৃত্যু, অপুর মুক্তি

কলেজের ছুটিতে কলকাতা থেকে মায়ের কাছে এসেছে অপু। রাতে খাওয়ার পর মা তার সাথে গল্প করতে চায়। হাত থেকে বই রেখে রাখে। অপু মায়ের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কলকাতায় ছাপাখানায় নাইট শিফট-এ হাড়ভাঙা কাজ করে দিনে কলেজ করে অপু। অনেকদিন পর ঘরের চেনা আরামে তার ক্লান্ত দেহে ঘুম চলে আসে। এদিকে সর্বজয়া বলে চলে : "যখন তুই কোন কাজ পাবি, তখন আমি তোর কাছে গিয়ে থাকবো। তুই আমাকে রাখবি তো বাবা?" অপু ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে : "হ্যাঁ নিশ্চয়ই"। এরপর সর্বজয়া আরও কত কথা বলে। ছেলেকে এ সময়ই

সর্বজয়া প্রথম জানায় ইদানীং তার অসুস্থতার কথা। বলতে বলতে যখন জিজ্ঞাসা করে, সর্বজয়া অসুস্থ হলে অপু দেখতে আসবে কিনা, তখন সর্বজয়া আবিষ্কার করে—অপু অনেকক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের অসহায়তা আর গোপন ব্যথা ও ভয়ের কথা অপুর জানা হল না আর।

সে মাকে বলেছিল পরদিন সকালে ঠিক সময়ে ডেকে দিতে। কিন্তু সর্বজয়ার মাতৃহৃদয় চায়নি অপু আজই দূর শহরে ফিরে যাক। তবু প্রথমটায় সর্বজয়া তাকে ডেকেছিল। সে না ওঠায় মায়ের মায়া তার আর ঘুম ভাঙায়নি। দেরিতে ঘুম ভাঙলে, অপু মাকে বকাঝকা করে উর্দ্ধশ্বাসে রেল স্টেশনে ছোটে। টিকিট কাটে। কোনোক্রমে ট্রেনও পেয়ে যায়। কিন্তু পরের দৃশ্যে দেখি সে বাড়ি ফিরে এসেছে। শুধু মায়ের কাছে আরেকটা দিন থাকতে, মাকে আনন্দ দিতে।

এইখানে কাহিনিকার ও চলচ্চিত্রকার আমাদের বোঝাতে চান যে,—অপু আসলে মায়ের প্রতি মোটেও নিষ্ঠুর নয়। মাকে বিপন্ন করে তার কলকাতা পাড়ি দেওয়া আসলে কালের অনিবার্যতা। অপুর এই যাওয়া আসলে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে অশিক্ষার ঘন অন্ধকার কেটে পাশ্চাত্য সভ্যতাজারিত আধুনিক শিক্ষার দিকে আগামী প্রজন্মের হেঁটে যাওয়া। সেখানে নিঃসঙ্গ ও আত্ম-উদাসীন সর্বজয়ার অকালমৃত্যু অপুর আপাত নিষ্ঠুর প্রগতির পালে আরও কিছুটা স্বচ্ছ বাতাস জুগিয়ে যায়।

> "তার কাছে বেঁচে থাকার আর কোনও কারণ বাকি নেই। যখন অপুই আর নিজের নেই, পর হয়ে গেছে, তখন সে আর কেন, কী জন্যে, কীসের আশায় বাঁচবে। কিন্তু কঠোর সত্য এটাই যে, হয়তো দুজনের মধ্যে কেউই বেঠিক নয়। তারা দুই প্রজন্মের আলাদা আলাদা মানুষ ..... তাদের জীবনের মূল দুটি ভিন্ন জীবনশৈলীতে অবস্থান করছে। জীবনের এই প্রাণান্তক কিন্তু অনিবার্য বিচ্ছেদটা নিদারুণভাবে সত্যি।"

(মহেন্দ্র মিশ্র; পথের পাঁচালী এবং, আনন্দ, ১ম সং, ২য় মুদ্রণ, নভে. ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৩৮)।

ভাবতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি যে, ... মায়ের মৃত্যু অপুর বুকে অজ্ঞাতেই এক মুক্তির আস্বাদ দিয়ে যায়। মায়ের মৃত্যুতে ভেতরে ভেতরে বন্ধন মুক্তির এই নীরব আনন্দ অপুকেও বিস্মিত করে। মনে মনে সে আত্মধিক্কারও করে। অন্যভাবে বিচার করলে, যৌবনে এসে মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ আসলে একদিকে যেমন জ্ঞানপিপাসার্ত অপুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা; অপরদিকে এ দূরত্ব যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম। শুধু তাই নয়, কালের বিচারে এই মৃত্যু সামন্ত কাঠামোর গ্রাম-সংসক্তি থেকে মুক্তিরও সূচক।

সতনিষ্ঠ বিভূতিভূষণ, আপসহীন সত্যজিৎ আর ভারতীয় মন

এই সত্যটাকে কিছুতেই এড়ানো গেল না যে, সর্বজয়ার মৃত্যু অপুকে একপ্রকার স্বস্তিই দিয়ে গেল। এখানেই বিভূতিভূষণের জয়।

জয় সত্যজিতেরও। 'অপরাজিত' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বলছেন : "সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ মিশ্রিত, এমনকি মায়ের মৃত্যু সংবাদ প্রথম যখন সে পাইল, বাড়ির তারের খবর জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মস্তেন একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস, একটা বাঁধন ছেঁড়ার উল্লাস অতি অল্পক্ষণের জন্যে নিজের অজ্ঞাতসারে ... তাহাকে এড়াইবার উপায় নাই।" এখানে পাঠকের সম্মুখে জীবনের কঠিন সত্যটা অকপটে লেখক মেলে ধরলেন। তাতে আপাতভাবে পাঠকচিত্তে অপু চরিত্রের

অবস্থান নড়ে গেলেও লেখক আপন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিকট থাকলেন সৎ। সত্যজিৎও নিজের পথে সেলুলয়েডে এই নিষ্ঠুর জীবনসত্যের পক্ষেই ক্যামেরা ধরলেন। এর ফল হয়েছিল উল্টো। 'অপরাজিত' সিনেমা হিসেবে 'পথের পাঁচালী'র থেকে পরিণত কাজ হলেও এ দেশের দর্শক তা প্রথমে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করেনি বা মেনে নেননি।

> " 'পথের পাঁচালী'...বিশ্বের দরবারে সত্যজিৎ রায়ের তৈরী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু আমার মনে হয়, যে ছবিটা সব চাইতে জীবন্ত, সব চাইতে জটিল, সব চাইতে সমকালীন সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির তুলনায়, তা স্বাভাবিক কারণেই 'অপরাজিত'।
>
> (মৃণাল সেন; তৃতীয় ভুবন, আনন্দ, প্রথম আনন্দ সং - এপ্রিল ২০১১; পৃষ্ঠা ৩০)।
>
> "বিভিন্ন লোক ছবিটি ভাল না চলার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। ..... সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে দিল্লীতে তিনখানা বাংলা ছবি পাঠানো হয়েছিল। দুই উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পাঠানো হয়নি। .....যতদূর মনে পড়ে, আটই বা নয়ই সেপ্টেম্বর ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রে ফল বের হল, (ভেনিসে) 'অপরাজিত' ছবি শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে গোল্ডেন লায়ন পেয়েছে। ..... 'দুই ছবির আগে বা পরে কোনো বছরের ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একই সঙ্গে তিনটি পুরস্কার প্রাপ্তি আর কোনো ছবির ক্ষেত্রে ঘটেনি। ...... ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব জগতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র উৎসব। ..... আমরাও পরাজয়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম।"
>
> (অনিল চৌধুরী; অপরাজিত'র কথা, এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯১, পৃষ্ঠা ৩৪৯)।
>
> "বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক অগ্রগতির সঙ্গে 'অপরাজিত'র মননশীলতা, দুর্ধর্ষ পরিমিতিবোধ, ও চলচ্চিত্র ভাষার নিখুঁত ইঙ্গিতময়তাই সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবিগুলির পথ বেঁধে দিয়েছিল।"
>
> (নির্মাল্য আচার্য; সম্পাদকের কথা, এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা-১৩৯১, পৃষ্ঠা ৩৫২)।

বিদেশের দর্শকরা এ ছবি দেখে নির্মাতাকে ধন্য ধন্য করলেও ভারতীয় দর্শক তখনও ততটা পরিণতমনস্ক নন। অপুর এই নিষ্ঠুরতা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা হয়তো আশা করেছিলেন, অপুর কোলে মাথা রেখে সর্বজয়া শেষ নিশ্বাস ফেলবে। অপুও মায়ের জন্য চোখের জলে ভাসাবে। কিন্তু বাস্তব তো হিসাব কষে জীবনের সকল আবেগ, সকল মূল্য চোকানোর দায় পালন করে না। এবং অপরাজিত-র কাহিনিকার বা চলচ্চিত্রকার কারওই মানুষের ইচ্ছাপূরণের বা মন জোগানোর অভিপ্রায় ছিল না। তাই দেখা যায়, অপু মনসাপোতায় এসে শীঘ্রই ফিরে যায়। মায়ের শ্রাদ্ধের কাজ সে কলকাতায় কালীঘাটে সেরে নেবে। এবার সামনে তার জীবন সংগ্রামের মুক্ত ময়দান। সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশীর মতো অনেক সম্ভাবনা সত্ত্বেও দিনশেষে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে দ্বিধাদীর্ণ মনে গ্রামের মধ্যেই পড়ে থাকবে না। সে শশীর চেয়ে অনেক একাগ্র, বাস্তববাদী (pragmatic) এবং সাহসী।

আজ যে উজ্জ্বল বাঙালি-যুবা দারিদ্র্যের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে শিক্ষার হাত ধরে অচেনা নগরে পাড়ি দেয় উন্নয়নের দুর্নিবার আকর্ষণে, তাদের পূর্বগামী অপু। 'অপরাজিত' অপু, জীবনকে দেখার, জীবনের সার্থকতা খোঁজার টানে সব শ্রম-বিচ্ছেদ-অভাব-মৃত্যু নীরবে স্বীকার করে হাঁটতে থাকে সামনের দিকে। আমাদেরও হাঁটতে শেখায়। আজও।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (গ্রন্থনামের বর্ণক্রমানুসারে)

আমাদের কথা (১ম সংস্করণ, ২০০৮), বিজয়া রায়, আনন্দ পা. প্রা. লি. কলি-৯।

কম্পোজিশন (৩য় সংস্করণ, ২০০৫), ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলি-৯।

কালের প্রতিমা (১ম সংস্করণ, ১৯৭৪), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ, কলি-৭৩।

চলচ্চিত্র সমালোচনা (১ম সংস্করণ, ২০১১), অজয় সরকার, বাণীশিল্প, কলি-৯।

চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ (৩য় সংস্করণ, ১৯৯৮), ধীমান দাশগুপ্ত, বাণীশিল্প, কলি-৯।

তৃতীয় ভুবন (১ম সংস্করণ, ২০১১), মৃণাল সেন, আনন্দ পা. প্রা. লি. কলি-৯।

পথের পাঁচালী নেপথ্য কাহিনি (১ম সংস্করণ, ১৯৯৩), চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পা. প্রা.লি. কলি-৯।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (পূর্ণমুদ্রণ, ২০০৬-৭), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি, কলি-৯।

বাঙালীর চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি (১ম সংস্করণ, ২০০১), রজত রায়, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলি-৯।

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫), সরোজ বন্দোপাধ্যায়, দে'জ, কলি-৭৩।

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা-১ (১ম সংস্করণ, ২০১১), সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ ঘোষ, প্রতিভাস, কলি-৯।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ, ১৯৯৯), রুশতী সেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলি-২০।

বিষয় চলচ্চিত্র (১ম সংস্করণ, ১৯৮২), সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পা. প্রা. লি. কলি-৯।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপরেখা (১ম সংস্করণ, ১৯৯৭), সম্পাদনা : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী শিল্প, কলি-৯।

ভারতীয় সিনেমা (১ম সংস্করণ, ২০০৯), সুরেন্দ্রনাথ সাহা, সপ্তর্ষি, শ্রীরামপুর, হুগলী।

সত্যজিৎ রায় : জীবন আর শিল্প (১ম সংস্করণ, ২০১১), সম্পাদনা : সুব্রত রুদ্র, প্রতিভাস, কলি-৯।

সত্যজিৎ রায় : তথ্যপঞ্জি (১ম সংস্করণ, ২০০১), দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলি।

সত্যজিতের চিত্রনাট্য (১ম সংস্করণ, ২০০২), ক্ষেত্র গুপ্ত, সাহিত্য প্রকাশ, কলি-৩৪।

হে চলমান চিত্রমালা (১ম সংস্করণ, ২০০৩), সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কোডেক্স, কলি-৮৪।

Deep Focus (1st impression, 2012), Satyajit Ray, Haper Collins, Naida 201301.

Our Films Their Films (1st impression, 2009), Satyajit Ray, Orient Black Swan Pvt. Delhi-110002.

The Cinema of Satyajit Ray (2nd Edition, 2001), Chidananda Dasgupta, NBT-India, New Delhi-110016.

পত্র-পত্রিকা

আনন্দলোক—সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা, ৯ই মে, ১৯৯২, সম্পাদনা : দুলেন্দ্র ভৌমিক, কলি-১।

এক্ষণ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯০, সম্পাদনা : নির্মাল্য আচার্য, কলি-৯।

এক্ষণ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯১, সম্পাদনা : নির্মাল্য আচার্য, কলি-৯।

ক্যানভাস, কলকাতা বইমেলা সংখ্যা, ২০১০, সম্পাদনা : কৌস্তভ দে, কলি-১০৭।

চর্যা উদ্যোগ, সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ২০১১, সম্পাদনা : সমীরণ মুখোপাধ্যায়, কলি-১৫১।

চলচ্চিন্তা, মে-জুন, ১৯৯১, সম্পাদনা : বিজন সেনশর্মা, ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট, কলি-৮৭।

চিত্রভাষ, বর্ষ ৪৫, অক্টোবর সংখ্যা, ২০১০, সম্পাদনা : জ্যোতিপ্রকাশ মিশ্র, কলি-১৩।

দেশ, সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা, ২৮ মার্চ, ১৯৯২, সম্পাদনা : সাগরময় ঘোষ, কলি-১

পশ্চিমবঙ্গ : ত্রয়োদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব (নভেম্বর, ২০০৭), সম্পাদনা : সুপ্রিয়া রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, কলি-১।

সাপ্তহিক বর্তমান, সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা, ২ মে, ১৯৯২, সম্পাদনা : বরুণ সেনগুপ্ত, কলি-১৪।

প্রবন্ধ

আমাদের সত্যজিৎ রায়—তরুণ মজুমদার, দিবারাত্রির কাব্য, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১২ বর্ষ, ২০০৪, পৃ. ৪১।

এ জীবনটাই স্বপ্ন, সর্বজয়ার জীবনটাই সত্যি—করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দলোক, ১ মে ১৯৯৯, পৃ. ২২।

চিত্রনাট্য—সত্যজিৎ রায়, দেশ, ১৭/০৬/১৯৯৫, পৃ. ৪।

চিত্রনাট্য—সত্যজিৎ রায়, চিত্রবীক্ষণ, জানুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ৫।

পথের পাঁচালী : খিদে ও খাওয়ার চালচিত্র—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অন্তঃসার, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ১১০।

সত্যজিৎ রায়ের শেষ সাক্ষাৎকার—অনুলিখন : অভিজিৎ দাশগুপ্ত, আনন্দলোক, ১ মে ১৯৯৯, পৃ. ৬।

সত্যজিতের লোকেশন—দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সিনেমা এবং, ১ জানু ২০১১, পৃ. ৪০।

ভারতীয় প্রবাদের দর্পণে জননী

তনিমা সাহা

"মা এই বিশেষ অনুভবটির সঙ্গে সূক্ষ্ম সব স্পর্শ গন্ধ স্বাদ আনন্দ নির্ভরতা শান্তি অভিমান অনুযোগ একে অপরকে জড়িয়ে ডালপালা বিস্তার করেছে।" ('মা গো!' শীর্ষক রচনা : জয় গোস্বামী) মা এই একাক্ষর শব্দে লুকিয়ে আছে অপত্য স্নেহের পুঞ্জীভূত রূপ। এমন স্বার্থহীন স্নেহ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কারো কাছে আশা করা যায় না। বিশ্বজুড়ে সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মাতৃভাবনা। জীবন-সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মা হল সৃষ্টি-প্রবহমানতার আধার,—তাঁর ভূমিকাকে প্রকৃতি তাই অপরিহার্য করে তুলেছে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগ নিগূঢ়। তিনি কল্যাণী ও অভয়া। পৃথিবীর তামাম প্রবাদে তো বটেই, সমগ্র লোকসাহিত্যেও 'মা' তাই এক ও অদ্বিতীয়া রূপে অধিষ্ঠিতা। মা চরিত্রের রয়েছে নানান রূপ তথা বিবর্তন। যে মা সন্তানগতপ্রাণা, তিনিই আবার দেখা যায় সন্তানের বিয়ের পর সন্তানের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণে রত। তাঁর তখন ধারণা জন্মায় পুত্র তাঁর নিজের কেউ নয়। পরের বাড়ি থেকে মেয়ে এসে বাছাকে কেড়ে নিয়েছে। তখন যত দোষ গিয়ে পড়ে ওই পুত্রবধূর ওপর। পাশাপাশি সৎমাও প্রবাদে চিত্রিত হয়েছেন নানাভাবে। আবার এমন অনেক চরিত্র এসেছেন যাঁরা হয়তো জননী নন, কিন্তু জননী স্থানীয়া। পিসি, জেঠী, খুড়ি, মামী প্রভৃতি জননী স্থানীয়াদেরও প্রবাদ নানাভাবে মূল্যায়ন করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কথা একটিই এবং তা হল জননীর বিকল্প কেউ নন এবং হতেও পারেন না। মায়ের চেয়ে অন্য কেউ দরদ দেখিয়ে আপন বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে তাই প্রবাদ সতর্ক করে দিয়েছে। এমনকি সেই জননী স্থানীয়াকে 'ডাইনি' বলতেও প্রবাদের বাধেনি। জননীর এই সামগ্রিক রূপটি কেমনভাবে বিধৃত হয়েছে তা সদৃষ্টান্ত আলোচনায় স্থান পাবে বর্তমান প্রবন্ধে। মাতৃ চরিত্রের রূপ উন্মোচনে কেবল যে আমরা বাংলা প্রবাদের সাহায্য নিয়েছি তা নয়, প্রয়োজনে প্রাদেশিক নানান প্রবাদেরও দ্বারস্থ হয়েছি আমরা। বাংলা প্রবাদের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে 'মা'-এর আন্তর্জাতিক রূপ সন্ধানে আমরা প্রয়াসী হব বর্তমান আলোচনায়।

জীবনে মানবীয় সম্পর্কের সূচনা মা-কে ঘিরে, মায়ের স্নেহাঞ্চলে থেকেই। বাংলা প্রবাদে তাই মাকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছে :

পিতা শুধু বীর্য দাতা
পালন ধারণ কর্ত্রী মাতা।।[১]

মায়ের আঁচলের ছায়ায় থেকে পরিবারে এবং সমাজে সন্তানের অবস্থিতি সুখাবহ। মাতৃহীন শিশুর প্রতি মায়ের মতো সুনজর কেউ-ই রাখতে পারে না। তার জীবনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে অনাদর-উপেক্ষা-অবহেলা। অমূল্য মাতৃস্নেহকে আশ্রয় করে সংসারে শিশু আপন সত্তাকে বিকশিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্যের চোখেও হেয় প্রতিপন্ন হয়। তাই প্রবাদে বলা হয়েছে :

মা নাই যার
না নাই তার।[২]
('না' অর্থাৎ নৌকা)

অথবা

অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নেই মা
অনেক দুর্ভাগ্য যার নেই অন্ন-ছা।[৩]

সংসারে সন্তানের ওপর যার প্রভাব সবথেকে বেশি ক্রিয়াশীল তিনি হলেন মা। তাই বলা হয় :

মা গুণে পোয়া, ভুঁই গুণে রোয়া।[৪]

মাতৃ অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশই হল সন্তানস্নেহ।

মাছ চেনে গভীর জল, পাখি চেনে ডাল।
মায়ে জানে পুতের মায়া জীয়ে যত কাল।[৫]

মা হলেন সন্তানগতপ্রাণা। এমনকি সন্তান যদি অবাধ্য কিংবা মাতৃভক্তিহীন হয়, তবুও। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে এই বিখ্যাত গানের কলিটি :

কুপুত্র যদি বা হয়
কুমাতা কখনো নয়।[৬]

তাই তো একটি প্রবাদে বলা হয়েছে —

মায়ের হাড় যদি মাটিতে থাকে পোঁতা
মাটি থেকে বলে—বাছা আমার কোথা?[৭]

সংসারে অনেকেই আমাদের প্রতি মমতার প্রকাশ দেখিয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছদ্ম-মমতা। ছলনার নামান্তর। তাতে স্নেহের আতিশয্য থাকলেও প্রকৃত ভালোবাসার বীজ সঞ্চিত থাকে না। যা থাকে কেবল জননীর মধ্যে। জননীর স্নেহ-ভালোবাসা কপটতা শূন্য। মা কোনো ছল জানেন না। তাঁর সন্তান স্নেহ অপার্থিব। কোনো কারণ ব্যতিরেকেই তাঁর স্নেহসুধা প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয় সন্তানের ওপর। তাই একটি প্রবাদে মাতৃস্নেহকে অশ্বত্থের ছায়ার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে :

অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া
মায়ের মায়াই মায়া[৮]

অশ্বত্থের চিরসবুজ পাতার ছায়া যেমন সব ঋতুতেই লভ্য, তেমনি মাতৃস্নেহও চিরভাস্বর। আমৃত্যু তা সন্তানের ওপর বর্ষিত হয়।

মায়ের স্নেহ অকৃত্রিম। তাই মায়ের চেয়ে বেশি কেউ সোহাগ দেখাতে এলে প্রবাদ আমাদের সতর্ক করে বলেছে :

ক. কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।[৯]

খ. চিঁড়ে বল মুড়ি বল ভাতের বাড়া নয়
পিসি বল মাসি বল মায়ের বাড়া নয়।।[১০]

গ. লতা খাও পাতা খাও ভাতের সমান নয়
পরের মারে মা ডাকিলে মায়ের সমান নয়।[১১]

ঘ. মা নেই যার জেঠিখুড়ি, ভাত নেই যার চিঁড়ে মুড়ি।[১২]

ঙ. মায়ের চেয়ে দরদ বেশী তারে বলি ডান।[১৩]

সন্তানের কাছে জননী ভগবানের আশীর্বাদ। মাটির এই পৃথিবীতে তিনি ঈশ্বরের বাস্তব রূপের পরিচায়ক। যিনি সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে সন্তানকে রক্ষা করেন। বিপদের সময় পরিবারের আর সকলে আমাদের পাশ থেকে সরে গেলেও মা কিন্তু সন্তানকে এক মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে দেন না। প্রতিনিয়ত তাকে এই আশ্বাস দিতে থাকেন যে সকল প্রতিবন্ধকতা একদিন দূর হবে, নতুন প্রভাতের সূর্য তাঁর সন্তানের সকল প্রতিকূলতাকে বিনাশ করবে। মায়ের এই স্নেহমধুর কণ্ঠ, এই আশ্বাসবাণী জীবনে শান্তিবর্ষণ করে। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরে চলে যায়। তাই প্রবাদ বলে :

মায়ের বাণী ডাবের পানি।[১৪]

ডাবের সুশীতল জল যেমন গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে সমস্ত ক্লান্তি দূর করে শরীরকে শীতলতা দান করে, তেমনই জীবনের দারুণ দুর্দিনেও মায়ের কণ্ঠস্বর, তাঁর স্নেহপূর্ণ বাণী সমস্ত হতাশা দূর করে সন্তানকে নতুন পথের দিশা দেখায়।

মায়ের স্নেহ-মাধুর্যের উপমান হয়ে প্রবাদে বারে বারে এসেছে প্রাকৃতিক নানান উপাদান—

ক. মায়ের মুখ তাড়ায় দুখ।[১৫]

অথবা

খ. মায়ের রাও দক্ষিণা বাও।[১৬]

এর কারণ প্রকৃতির অকৃত্রিম, ছলনাহীন, সর্বংসহা, কল্যাণী রূপ মানববিশ্বে আমরা মায়ের মধ্যেই পাই।

জন্মের পর শিশুর লালন-পালন, বৃদ্ধি সবই মায়ের স্নেহস্পর্শে। মায়ের দুধই সদ্যোজাত সন্তানের বৃদ্ধির সহায়ক। প্রবাদে তাই বলা হয়েছে :

মাতার সমান নাই শরীরপোষিকা।[১৭]

অনুরূপ প্রবাদ রয়েছে আরও কয়েকটি—

ক. কোঁহের (পাঁজরের) গুণে বাছুর।[১৮]
(মা স্বাস্থ্যবতী হলে সন্তানও বলিষ্ঠ হয়)

খ. মায়ের কোলে আয়ু বর্তায়।[১৯]

তাই রাজ্যজয়ের সুখের চেয়েও মাতৃস্নেহ অধিকতর কাম্য—

রাজ্যের সুখ, মায়ের বুক।[২০]

সন্তানের মঙ্গল কামনায় মা যেমন কোমল চিত্তের পরিচয়বাহী আবার তেমন পুত্র-কন্যাকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে ফেরানোর ক্ষেত্রে সেই কোমল হৃদয়া জননী দৃঢ় চিত্তের অধিকারিণী। কোমলস্বভাবা নারী যখন সন্তান রক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন সে হয়ে ওঠে দৃঢ় চিত্ত, শক্তিশালী নারী। জাপানি প্রবাদে এর উল্লেখ পাই :

ONNA WA YOWASHI, SARE DO HAHA WA TSUYOSHI.[২১]

মা-হারা সন্তানের বেদনা মর্মান্তিক। মা ছাড়া সন্তানের জগৎ ধূ ধূ মরুভূমির মতোই শূন্য। পরিবারের কারুর এক পশলা স্নেহের বৃষ্টিও সেখানে বর্ষিত হয় না। মা-হারা সন্তান আর সকলের কাছে 'আপদ' বলেই প্রতিভাত হয়। পরিবারের কেউই তার ওপর সুনজর দেখাতে পারে না। প্রবাদেও পাই তার উল্লেখ :

ক. হাটে মাঠে ঘুরে এলাম, ঘাটে নাই মা।
রণে বনে ফিরে এলাম, ঘরে নেই মা।[২২]

খ. চিলে নেয় বাচ্চা তার
মুরগী নেই সাথে যার।[২৩]

গ. অভাইগ্যার মা মরে আগে।[২৪]

উপরিউক্ত প্রবাদগুলির মাধ্যমে মা-হারা সন্তানের জীবন কতটা সংকটপূর্ণ হতে পারে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সন্তানের ওপর মায়ের দায় সবথেকে বেশি। কন্যাসন্তানের বিয়ের ক্ষেত্রেও তাই পিতার তুলনায় মাতার চাড়ই বেশি থাকে। কন্যাকে ভালো পাত্রের হাতে সমর্পণের দায় মা-কে রাতদিন চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। সেটা নিজের জীবনের তীব্র অভিজ্ঞতার দরুন তো বটেই, আবার পাড়ার মহিলারাও তাকে বারবার কন্যার বিয়ের বিষয়ে ভয় খাইয়ে কন্যাদায়ের এক বিকট ছবি তুলে ধরে। এমনকি কোনও কোনও হবু মাকে হয়তো নববধূ হিসাবেই শুনতে হয়—

যতদিন মেয়ে আসছে না পেটে
যা খাওয়ার খেয়ে নাও,
যতদিন বউ আসছে না ঘরে
পরে নাও যা যা চাও।[২৫]

আলোচ্য প্রবাদটিতে কন্যাসন্তানের মাতা ও পুত্রসন্তানের মাতা হিসাবে উভয় রূপের ভবিষ্যত দিনের বর্ণনা দিয়ে ভাবী বধূকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সমধর্মী প্রবাদের সন্ধান পাই মারাঠি ও ওড়িয়া ভাষাতেও।

ক. জাহা খাইবু খাইযা বোহূ আসিবা জাএ
জাহা পিন্ধিবু পিন্ধিয়া ঝিঅ জিবা জাএ। (ওড়িয়া)[২৬]

খ. লেকে হোঈ তো খাবে, সুন যেঈ তো ল্যাবে। (মারাঠি)[২৭]

কন্যা মায়েরই প্রতিরূপ। মায়ের স্বভাব-দোষ, গুণ সব কিছুই কন্যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। তাই বিবাহের সময় মায়ের স্বভাব-গুণ বিচার করে কন্যা নিয়ে যাওয়ার প্রথা আমাদের দেশে বহু প্রাচীন। পাত্রপক্ষ তাই মেয়ের মায়ের গুণ দেখে তবেই কন্যাকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যায় এবং এই বিশ্বাস ও সংস্কার এতটাই বলিষ্ঠ যে হেন ভাষা নেই যাতে একথা বলা হয়নি। নীচে কয়েকটি ভাষার প্রবাদের উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে কীভাবে লোকসমাজে এই ধারণাটি স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

ক. তাইয়ন্তে মগুডু, নয়িয়ন্তে বাল। (কন্নড়)[২৮]

খ. টিক বলধা ওলাই মাটি, মাক ভালেহে জীয়েক জাতি। (অসমিয়া)[২৯]

গ. ঠাম তেবী ঠীকরী, নেমা তেবী দীকরী। (গুজরাতি)[৩০]

ঘ. ঘড়ে সরীখী ঠীকরী, মা সরীখী ডীকরী। (গুজরাতি)[৩১]

ঙ. মায় তশী বেটী, গহূ তশী রোটী। (মারাঠি)[৩২]

উপরিউক্ত সমস্ত প্রবাদেই মায়ের চরিত্রগুণ বিচার করে কন্যা ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথাই

ব্যক্ত হয়েছে। জাপানি প্রবাদেও মা-এর স্বভাব গুণ বিচার করে তবেই বধূ ঘরে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

MUSUME WO MIRU YORI AHA WO MIYO.[৩৩]

বিভিন্ন বিদেশি ও আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদের মাঝে বাংলা প্রবাদেও এই ধারণার রূপটি খুঁজে নেওয়া যেতে পারে।

ক. গাই শুনে ঘি, মা শুনে ঝি।
গাছ শুনে গোটা, বাপ শুনে বেটা।[৩৪]

খ. ...দই কিনি তার মাঝোত খাল, কইনা আনি যার মাওটা ভাল।[৩৫]

অনুরূপ প্রবাদ পাই তামিল ভাষাতে—

তল্লিনিচুচি পিল্লনূ, পাডিনিচুচি বর্রেনূ তীসিকো বলেনু।[৩৬]

তবে মায়ের স্বভাব-চরিত্র দেখে মেয়ে ঘরে নিয়ে গেলে যে সর্বক্ষেত্রেই মেয়েটি মায়ের স্বভাব গুণসম্পন্ন হবে এ ধারণা ভুল। একটি তামিল প্রবাদে তার উল্লেখ পাই :

আত্তাড়েত্ তননীর তুরৈয়িল পার্ত্তাল, মকড়ৈ ব্‌ট্টিল পড়ি বেন্ডাস্।[৩৭]

কন্যা মায়ের প্রাণের সম্পদ হলেও কন্যার বিবাহের পর তার স্বামী সোহাগের আতিশয্য জননীকেও অনেক সময় ঈর্ষাতুরা করে তোলে। চট্টগ্রামের একটি প্রবাদে পাই তারই পরিচয়।

ঝিয়ে দিয়ে বাঁওরি মাস্তো রীষ (হিংসা)
ফেলাই রাখ বাঁওরি জুড়াইলে দিস।[৩৮]

নারী-মনস্তত্ত্বের এই জটিল রূপ প্রবাদের ঐশ্বর্য, তার আধুনিকতার নির্ভুল প্রমাণ।

মায়ের কাছে মেয়ে পরম ধন হলেও বাপের কাছে মেয়ে বোঝা স্বরূপ। কন্যাসন্তানের জন্মানো মানেই বাপের পয়সা খরচের ভয়। সোমথ মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখা দায়। তাই অনেক টাকা কন্যাপণ দিয়ে তবে সেই দায় থেকে নিষ্কৃতি মেলে। বাপের কাছে কন্যা তাই অভিশাপ স্বরূপ। কন্যা-দায় এড়াতে তাই অনেক বাবা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান যে তার যাতে কন্যাসন্তান না হয়। এ প্রসঙ্গে একটি রাজস্থানী প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে—

দেনো ভালো ন বাপরো, বেটী ভলী ন এক,
পৈণ্ডো ভালো না কোস রো সাহব রাখে টেকা।[৩৯]

তাই মায়ের অবর্তমানে কন্যার পিতা জীবিত থাকলেও সেই কন্যা অনাথ। কারণ 'মা মরলে বাপ তালুই'। মায়ের স্নেহস্পর্শ কন্যার মাথা থেকে সরে গেলে তার যে কী দুর্দশা হয় তার উল্লেখ পাই এক তামিল প্রবাদে :

তায় শেত্তাড় মগড় তিক্কট্রাড়।[৪০]

এর ওপর যদি মেয়ের একটা সৎমা জোটে তাহলে তো আরওই বিপদ —

সোতিক বেটী ওলক টোঁটী, বিকৈতী ন ত সড়লে গহৈনতী। (বিহারি)[৪১]

উপরিউক্ত প্রবাদটির মূল বক্তব্য হল সতীনের মেয়ে ওলের শাকের মতো। যদি বিক্রি না হয় তাহলে পড়ে থেকে থেকে পচে যাক।

মায়ের স্নেহ যতটা গাঢ়, বিমাতার বিতৃষ্ণা ততটাই অসহনীয়। মা-হারা সন্তানের জীবনে বিমাতার আবির্ভাব অভিশাপের নামান্তর। যার উল্লেখ পাই বেশ কিছু প্রবাদে :

ক. সৎমার বাণী, তল দিয়ে মূল কাটে, উপরে ঢালে পানি।[৪২]

খ. সৎমার ছেদ্দা, পান্তা ভাতে ঘি।
মাথাটা মুড়িয়ে এসো তেলপলাটা দি।[৪৩]

গ. সৎমার মুখ নাড়া
মরার উপর যেন খাঁড়া।[৪৪]

ঘ. হতাইয়ের বুক, দোজখের দুখ।[৪৫]

ঙ. বিমাতা বিষের ঘর।[৪৬]

শুধুমাত্র সতীনের পুত্র বা কন্যা নয়, সতীন কন্যার স্বামীর প্রতিও দেখা যায় বিমাতার বিষ নজর। কপট স্নেহ।

হতাইমা ফিরি চায়
জামাইড্যা নি চইল্যা যায়।[৪৭]

সৎমার ছলনা, নিষ্ঠুরতা সহ্য না করে সন্তান অনেক সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রবাদে পাই তার পরিচয় :

ক. সৎ মা যখন 'পুত' বলে
শুকনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে।[৪৮]

খ. হতাইর চাল, মানের ভাঙ্গে ডাল। (ময়মনসিংহ)[৪৯]

গ. সৎমার আদরে সর্ব অঙ্গ বিদরে।[৫০]

জননী সন্তানগতপ্রাণা হলেও সন্তান কিন্তু মায়ের দুঃখ বোঝে না। যে মায়ের হৃদয় সন্তানের দুঃখে কাঁদে সেই মা-কেই কষ্ট দিতে সন্তানের একটুও বাধে না। এক সন্তানের জননীর থেকে বহু সন্তানের জননীর দুর্দশা আরও অধিক। প্রবাদ বলে :

ক. অনেক পুতের মা অন্ন পায় না।[৫১]

খ. অনেক সন্তান যার, পাপের সাজা তার।[৫২]

গ. এক পুতের মা রাজত্ব করে, সাত পুতের মা ভিক্ষা করে।[৫৩]

ঘ. এক ছেলে তার সোনাদানা
পাঁচ ছেলে তার পোঁদে টেনা।[৫৪]

এক পুত্রের জননী যে সবসময় সুখের স্বর্গে বাস করেন তা কিন্তু নয়। জননীর কাছে 'এক পুত অন্ধের নড়ি' হলেও পুত্র কিন্তু মা-কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। জননী সন্তানের নিকট তখন 'বোঝা'-য় পরিণত হয়। বহু 'বৃদ্ধাশ্রম' এর সাক্ষী। এক্ষেত্রে মনে পড়ে যায় বিখ্যাত গায়ক নচিকেতার সেই বহুল প্রচলিত গানের লাইনটি :

ছেলের আমার, আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম
আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম।

গানটিতে অকৃতজ্ঞ পুত্রের প্রতি জননীর ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা প্রবাদে খুঁজে পাই গরিব মায়ের বিলাসী পুত্রের বড়োলোকি চালের জন্য মায়ের নীরব যন্ত্রণার কথা। হতভাগিনী সেই মায়ের দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ বিলাসী ছেলের বাবুয়ানি কঠোর বিদ্রূপের বিষয় হয়েছে প্রবাদে :

ক. মা পায় না ছেঁড়াকাঁথা সেলাই করবার সূতা
ছেলের পায় দেখ গিয়ে চোদ্দ সিকের জুতা।[৫৫]

খ. মা খায় ধান ভেনে, ছেলে খায় এলাচ কিনে।[৫৬]

গ. বাপ মা পায় না ভাত
আমরা ফুল হুংবার (শুঁকবার) জাত। (ময়মনসিংহ)[৫৭]

পুত্র-কন্যার দুর্ব্যবহারে মায়ের অন্তর্বেদনা অলক্ষ্যে থাকে :

ঝাড় জ্বলে জঙ্গল জ্বলে সবাইরে দেখে
মায়ের অন্তর জ্বলে কেহনা যে দেখে। (চট্টগ্রাম)[৫৮]

যে সন্তানকে মা পৃথিবীর আলো দেখান, সমস্ত বাধা বিঘ্ন থেকে সযত্নে রক্ষা করে নিজের আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখেন বিয়ের পরে অনেক সময় সেই সন্তান মায়ের কাছে পর হয়ে যায়। আপন হয়ে দেখা দেয় স্ত্রী। স্ত্রী-এর কথায় মা পুত্রের চোখের বালিতে পরিণত হয়। আর তখন স্বভাবতই শাশুড়ি মায়ের সব রাগ গিয়ে পড়ে পুত্রবধূর ওপর। যে ছেলে এতদিন আপন ছিল বাইরের মেয়ের আগমনে তার চরিত্রের এ ধরনের পরিবর্তন কোনো জননীই সহ্য করতে পারেন না। আর তখন আধিপত্যপ্রবণা জননীকে বলতে শুনি :

পুতের বিয়ে আপনি দিলাম বউ ঘরে এল
সঁপে দিলাম গেরস্থালী গিন্নীপনা গেল।[৫৯]

এ নিয়েই সংসারে শুরু হয় অশান্তি। এক্ষেত্রে সব মায়েরই অবশ্য একই অভিযোগ যে ছেলের কোনো দোষ নেই, সব দোষ ওই পুত্রবধূর। কারণ—

কি করবে পুতে
নিত্যি সে যে কানভাঙানির কাছে যায় শুতে।[৬০]

বউকে কাছে পেয়ে যেসব পুত্র মাকে অবহেলা করে প্রবাদে সে সমস্ত অকৃতজ্ঞ সন্তানদের ক্ষমা করা হয়নি। মায়ের প্রতি কর্তব্যপালনে পরান্মুখ সন্তানকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

ক. মায়ের পেটে ভাত নাই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।[৬১]

খ. মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।[৬২]

গ. মা মরেন দোষ নাই, বউ বাঁচলে বাঁচি।[৬৩]

ঘ. গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।[৬৪]

ঙ. বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা।।[৬৫]

পুত্রের পর হয়ে যাওয়া কোনো জননীই সহ্য করতে পারেন না। প্রবাদে পাই তাই তার নিদর্শন :

ক. যদ্দিন খাওয়াইছি দুধ, তদ্দিন আছিল পুত
বউ আইল ঘরে, পুত নিল পরে। (ময়মনসিংহ)[৬৬]

খ. কলির কাইল্যা পোলাপান
বউয়েরে কয় সপরী আম
বাপ-মা পচা ফল
যায় যাউক রসাতল।[৬৭]

—আর তাই শাশুড়ি মায়ের সব রাগ পুত্রবধূর ওপর। কারণ ওই পুত্রবধূই পুত্রের পরিবর্তনের কারণ। তাই চক্ষুশূল বউয়ের শুধু 'চলন বাঁকা' নয়, শাশুড়ির কাছে তার 'বদন'ও 'বাঁকা'। পেটের মেয়ের প্রস্ফুটিত শতদল সম রূপের সামনে পরের বাড়ির মেয়ের মুখ নিতান্তই বিশ্রী। প্রবাদে শাশুড়ি মায়ের এইরূপ মনোভাবটি ব্যাঞ্জনালাভ করেছে এইভাবে :

পদ্মমুখী ঝি আমার পরের বাড়ি যায়।
খেঁদীমুখী বউ এসে বাটার পান খায়।[৬৮]

বউয়ের গলার স্বরটুকু পর্যন্ত শাশুড়ির কানে কর্কশ শোনায়—

বউয়ের গলার স্বর কেমন?
শালিখ কেঁকায় যেমন।[৬৯]

বউমার সব কিছুই খারাপ শাশুড়ির দৃষ্টিতে। তার প্রমাণ পাই প্রবাদে :

ক. বউ তো নয় হীরে। কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।[৭০]

খ. বউ না রে বউ না, গরল ডাকিনী। দিন হলে মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী।[৭১]

গ. বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তুর্কি ঘোড়া যেমন।[৭২]

নববধূ শাশুড়ির কাছে রূপগত সমাদর লাভ করতে না পেরে সাংসারিক কাজকর্মের মাধ্যমে শাশুড়ি মায়ের মন জয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু সেই কর্ম শাশুড়ির বিদ্রূপের শিকার হয় এভাবে :

বউটি ভালো বটে,
টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে।[৭৩]

কোনও প্রবাদে দেখি শাশুড়ি লোকজনের সামনে বউটিকে খুব সমাদর করছে। কিন্তু আড়ালে তার লুকিয়ে আছে অভিসম্পাত।

বউমা, ক্ষীর রইলো খাবে।
খাবে তো যমের বাড়ি যাবে।।[৭৪]

বউয়ের খাওয়া-দাওয়াকে বিদ্রূপ করা হয়েছে —

মেঘে মেঘে বেলা যায়।
সিয়ান বউ সাতবার খায়।।[৭৫]

বউয়ের স্বভাবকে নিকৃষ্ট রূপে প্রচার করতে শাশুড়ি ননদে ইতর প্রাণী বিশেষের সঙ্গে বউয়ের সাদৃশ্য দেখায়—

বউ বিড়াল মাছি
তিন নাহি বাছি।।[৭৬]

নববধূর প্রতি ভালোবাসাবশত ছেলে তার রান্নাবান্না একটু পছন্দ করে। যে ছেলে এতদিন মায়ের রান্নার তারিফ করে এসেছে, আজ পরের মেয়ের আগমনে সেই ছেলেরই রুচির পরিবর্তন হয়, আর তাই নিয়ে শাশুড়ির মনের মধ্যে জমে ওঠে ক্ষোভ। বউমার তৈরি রান্নায় বেশি নুন ঢেলে সেই খাদ্যকে বিস্বাদ করে ছেলের কাছে বউকে খারাপ করতে চায় ঈর্ষাপ্রবণা জননী। একটি প্রবাদে পাই তারই উল্লেখ :

মা রান্ধে যেমন তেমন, বোন রান্ধে ছি!
রেঁধে রেখেছে মাগীর ঝি, নুন ঢেলে দিই।।[৭৭]

বাড়ির গাই গরুর মেয়ে বাচ্চা ও মেয়ে মানুষের পুত্রসন্তান হলে সবাই খুব খুশি হয়। স্বভাবতই বউ যখন পুত্রসন্তান প্রসব করে তখন তার প্রতি স্বামীর যত্ন শতগুণ বেড়ে যায়। শাশুড়ির ক্ষোভ তাতে বাড়ে, কারণ তিনিও একসময় পুত্রের জননী হয়েছিলেন, কিন্তু এত যত্ন বোধ করি সে সময় পাননি, তাই তাঁর ক্ষোভ :

বউ বিয়োলে বেটা গাই বিয়োল নই,
আহা সে কাহিনী সই কারবা আমি কই।।[৭৮]

এমনকি ক্ষোভবশত পুত্রবধূর মৃত্যুকামনা করতেও শাশুড়ির বাধে না। শাশুড়ির চোখে বউয়ের মৃত্যু কারুণ্যের নয়। কেননা সমাজে—

বউ মরে উলু পড়ে
ঘরে ঘরে বিয়ে করে।।[৭৯]

বলা হয় সংসারে 'নারীনাং ভূষণাং লজ্জা'। কিন্তু শাশুড়ি ননদের অত্যাচারে গৃহবধূ সেই লজ্জার আভরণ ত্যাগ করে হয়ে ওঠে প্রতিশোধপরায়ণ নারী। সে তখন শাশুড়ির মৃত্যু কামনা করে তীব্র অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কারণ সে জানে যে শাশুড়ি যতদিন না মরছে ততদিন তার জীবনে সুখের ছায়া পড়বে না, স্বামীকে সে কোনোদিন নিজের মনের মতো করে পাবে না। আর তাই লজ্জাশীলা গৃহবধূ তখন নিজের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাংলা প্রবাদে শাশুড়ির অত্যাচারে নববধূর এই পরিবর্তিত মানসিকতাটা ধরা পড়েছে :

জা জাউলী আপনা উলী ননদ মাগী পর।
শাশুড়ি মাগী মরলে পরে হব স্বতন্তর।[৮০]

শুধু তাই নয়, শাশুড়িকে সরিয়ে নববধূর আকাঙ্ক্ষা থাকে—

একলা ঘরের গিন্নী হব।
চাবি কাঠি দুলিয়ে নাইতে যাব।।

আর তার জন্যই—

কাঁখে কলসি চড়ক পাক।
কেবল গিন্নী হবার জাঁক।।[৮১]

শাশুড়ি-বধূর এই অম্লমধুর সম্পর্ক, আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতি, হিংসা-দ্বেষ এর বাস্তবধর্মী রূপ শুধু বাংলা নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বিদেশি প্রবাদেও সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে। মায়ের নাড়ির টানের সামনে যে বউদেরও খেলো হয়ে যেতে হয় তার পরিচয় পাই আলোচ্য প্রবাদটিতে :

মা চায় আঁত পানে, মাগ চায় ট্যাঁক পানে।[৮২]

এখানে বলা হয়েছে মা সন্তানদের দিকে চাইলেও বউয়ের নজর কিন্তু কেবল স্বামীর ট্যাকের দিকে। অসমিয়া, তেলেগু, গুজরাতি ও কাশ্মীরি প্রবাদেও এর রূপ খুঁজে পাই আমরা :

ক. মাও চাই মুখল, খৈনী চাই হাতলৈ। (অসমিয়া)[৮৩]

খ. তল্লি কুডুপ চুচুনু, পেন্ডলামুঁ বীপুচুচুনু। (তেলেগু)[৮৪]

গ. অনুব্রুনে, জেনুবুনে, রানিহুন্দে মদনো। (কাশ্মীরি)[৮৫]

প্রবাদের জগতে শাশুড়ি বধূর সম্পর্কটি চিরকালই তিক্ততার সুরে বাঁধা। শুধুমাত্র বাংলা নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদেও এর সমর্থন খুঁজে পাই আমরা।

ক. মামিয়ারুম্ শাগাড়ো মনক্কবলৈয়ুম্ তীরাদো? (তামিল)[৮৬]

খ. জবান সাসু মরে নঁহী, নে বহুনো দহাডো বড়ে নঁহী। (গুজরাতি)[৮৭]

শাশুড়ি মরলে তার বউয়ের থেকে সুখী কেউ হয় না। যে শাশুড়ি চিরটাকাল বধূকে শাসনে রেখে তার ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে সেই শাশুড়ির মৃত্যু স্বভাবতই বধূর চোখে আনন্দাশ্রুর উদ্গীরণ ঘটায়।

ক. সাসুসাঠী রড়ে সূন, বাঈ সুটলে মী কাচাতুণ। (মারাঠি)[৮৮]

খ. তিকড়ে সাসূ আচকে দেত হোতি, কান্দে কাপতানা সূণ রড়ত হোতী। (মারাঠি)[৮৯]

শাশুড়ি মারা যাওয়া মানে শুধু আপদবালাই দূর হওয়া নয়, এতে প্রাপ্তিরও ব্যাপার আছে—

সাসূগেলী ঠীক ঝালে, তুপাচেগাডগে হাতী আলে। (মারাঠি)[৯০]

কোনো কোনো বউ সামান্য এইটুকু পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। তাদের উদ্দেশ্য থাকে 'একলা ঘরের গিন্নী হব'। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদে এর রূপটি দেখে নিতে পারি আমরা :

ক. সাসুগেলী ঠীক ঝালে, ঘরদার হাতী আলে। (মারাঠি)[৯১]

খ. সাসূ মুবাঁ ঝাপড়াঁ, নে ঘর বার য়য়া আপনা। (গুজরাতি)[৯২]

তাই অনেক মেয়ে চায় এমন ছেলেকে বিয়ে করতে যার মা-বাবা নেই। যাতে পুরো সংসারের একক আধিপত্য তার হাতেই আসে।

ক. অত্তে ইল্লদবড্ডু ঐশ্বর্যবনে, সোসে ইল্লদবড্ডু সৌভাগ্যবন্ডে আরু ইল্লদবড্ডু বারণবন্ডে। (তেলেগু)[৯৩]

প্রবাদে শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কটিতে অত্যন্ত সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে। সেখানে ভালো শাশুড়ির সন্ধান আমরা পাই না। সকলেই খারাপ এবং বউমারা সকলেই ভালো যেটা বাস্তবক্ষেত্রে অনেকাংশেই সত্য নয়। সংসারে খারাপ শাশুড়ি যেমন আছে তেমন আছে খারাপ বৌমা-ও। অন্যদিকে ভালো বৌমার পাশাপাশি অনেক ভালো শাশুড়িরও আমরা দেখা পাই সংসার জীবনে। যদিও প্রবাদে তার পরিচয় সেভাবে মেলে না, সেখানকার সব শাশুড়িই দুষ্টস্বভাবা। বৌদের ওপর অত্যাচার করেই তারা সুখ পায়। তাই দেখি পরিবারের কেউ বউয়ের রান্নার সামান্যতম একটু প্রশংসা করলেও শাশুড়ির গায়ে ফোসকা পড়ে।

ক. ঘী সুধারৈ সাগনে নাঁব্ বহুরো হোয়। (রাজস্থানী)[৯৪]

খ. ঘিয়ো বনাবে গেরিয়াঁ, বড্ডী বহূ দা নাম। (পাঞ্জাবী)[৯৫]

পান থেকে একটু চুন খসলেই শাশুড়ি রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে বৌমার ওপর চড়াও হয়। সামান্য ভুলেরও ক্ষমা মেলে না—

ছাসমাঁ মাঘন জায় নে বহূ ফুবড কহেবায। (গুজরাতি)[৯৬]

যখন কোনও দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না তখনও শাঁশুড়ি মা বৌয়ের নিন্দা করতে ছাড়েন না। একটি গুজরাতি প্রবাদে তার সন্ধান পাই—

বহুনাঁ লক্ষণ বারনামাথী জানায়।[৯৭]

রাজস্থানী প্রবাদেও এর রূপ খুঁজে পাই আমরা :

বহুরা লঘণ বারনৈসূঁ ওড়খী জৈ।[৯৮]

শাশুড়ির ভালো করতে গেলেও বউদের বিপদ :

মামিয়ার উডৈ কুলৈন্দাল্ বায়ালুয্ শোল্লক্কুডাদু কৈয়ালুয কাট্টক্ কূভাদু। (তামিল)[৯৯]

শাশুড়িরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বউদের জব্দ করে বাপের বাড়ি না যেতে দিয়ে। শাশুড়ি জানে যে এটাই বউদের জব্দ করার মোক্ষম অস্ত্র। অত্যাচারিতা বউদের কাছে বাপের বাড়ি স্বর্গতুল্য। পিতা হতদরিদ্র হলেও —

ক. মাহেরচী পেজ আনি সর্বদাস তেজ।[১০০]

খ. সাসরী জাতা কুচকুচ কাটে, মাহেরী য়েতা হরীখ বাটে।[১০১]

শাশুড়িমা সবসময় এটাই চায় যে তার পুত্র যেন সর্বদা সুখে, দুধে-ভাতে থাকুক। যাবতীয় সংকট, দৈন্য যেন বউকে পোয়াতে হয়। একটি তেলেগু প্রবাদে পাই তার পরিচয় :

কোড়ুকু বাগুন্ডবলে কোডলু মুগুমুয়য়বলে।[১০২]

ছেলে যখন রাতে বউয়ের পাশে শুতে যায় তখন জননী বেশি অসহায় বোধ করে। তাঁর মনে তখন এ ধারণাই জন্মায় যে তাঁর ছেলেকে এবার কাছে পেয়ে পুত্রবধূ নির্ঘাত তাঁর নামে কানভাঙানি করবে পুত্রের কাছে। আর তখন জননী ছেলের চোখের বিষে পরিণত হবে। এহেন শাশুড়ির চোখে ছেলে-বউয়ের গোটা সম্পর্কটাই অশালীন বলে মনে হয়। রাজস্থানী ও হিন্দি প্রবাদেও এর উল্লেখ পাই আমরা :

ক. করাতক কুতিয়া। মাহ বিলাঈ, চৈত মেঁ চিড়িয়াঁ, সদা লুগাঈ।[১০৩]

খ. কাতিক পিল্লী মাঘ সিয়ারিন চইত চিরইয়াঁ সদা কহারিন।[১০৪]

তাই রাত্রিতে খাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর, ছেলে বউয়ের শুতে যাওয়ার সময় শুরু হয় শাশুড়ির গজগজ—

ক. জিকড়ে সুঈ তিকড়ে দোরা। (মারাঠি)[১০৫]

খোদ দেবভাষাতেও শাশুড়ি-বউয়ের বচসার বর্ণনা দান করা হয়েছে :

প্রায়ঃ শ্বশ্রূস্নুষয়োর্ণ দৃশ্যতে সৌহৃদং লোকে।

আর আঞ্চলিক ভাষাগুলোতেও এরকম আপ্তবাক্যের দেখা মেলে প্রায় মুড়ি-মুড়কির মতোই :

ক. আনিক্কু ইনঙ্গিন পোন্নুম মামিক্কু ইনঙ্গিন পেণ্ণুম অরুমৈ। (তামিল)[১০৬]

খ. অত্তমগ্গী, বেমূল তীপু লেদু। (তেলেগু)[১০৭]

শাশুড়ি-বধূর সম্পর্কের তিক্ততা জাপানি প্রবাদেও দেখা যায়। শাশুড়ি বধূকে বাপের বাড়ি যেতে দিতে চায় না। আর যেতে দিলেও তা রাতের অন্ধকারে, সারাদিনের সংসারের সব কাজকর্ম মেটানোর পর। আবার উলটোদিকে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফেরার পথে কিন্তু বধূকে সাত সকালেই বাপের ঘর থেকে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়। নইলেই জোটে শাশুড়ির কাছে লাঞ্ছনা, অত্যাচার। নিম্নোক্ত প্রবাদটিতে নববধূর বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা এবং দীর্ঘক্ষণ সেখানে কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

YOME NO ASADACHI, MUSUME NO YODACHI.[১০৮]

একটি জাপানি প্রবাদে বউকে কুকুর ও শাশুড়িকে বাঁদর বলে অভিহিত করা হয়েছে। জাপানে বাঁদর ও কুকুরের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। প্রায় শত্রুতার সম্পর্ক। নিম্নোক্ত প্রবাদটি সেই ধারণারই পরিচয়বাহী :

YOME TO SHOTOME, INU TO SAR U.[১০৯]

এইভাবে অলিখিত মৌখিক সাহিত্য প্রবাদ জননীর বিচিত্রধর্মী রূপকে যেভাবে প্রখর বাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়ন করেছে তা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায়। আমাদের চির-পরিচিত মাতৃ চরিত্রকে নতুন ভাবে চিনতে সাহায্য করে।

সূত্র নির্দেশিকা

১। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯১। পৃ. ৯৭

২। সুদেষ্ণা বসাক। 'বাংলার প্রবাদ'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮। পৃ. ২০

৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২

৪। জয়শ্রী ভট্টাচার্য। 'বাংলা প্রবাদে নারীমন'। কলকাতা, সাহিত্য দর্পণ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৯। পৃ. ৭০

৫। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৪৬

৬। সুশীলকুমার দে। 'বাংলা প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, এ. মুখার্জি এন্ড কোং, ১৩৫২। পৃ. ১৩৭

৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪০

৮। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৪৬

৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১১। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১২। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৬

১৭। সুশীলকুমার দে। 'বাংলা প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, এ. মুখার্জি এন্ড কোং, ১৩৫২। পৃ. ১১৯

১৮। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৪৭

১৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৭

২১। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'প্রবাদ প্রসঙ্গ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি। পৃ. ২৭৮

২২। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৪৭

২৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৭

২৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৭

২৫। সুশীলকুমার দে। 'বাংলা প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, এ. মুখার্জি এন্ড কোং, ১৩৫২। পৃ. ১৩৪

২৬। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১। পৃ. ৫৮

২৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৯

২৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৯

২৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৫

৩০। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৫

৩১। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৫

৩২। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৬

৩৩। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'প্রবাদ প্রসঙ্গ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি। পৃ. ২৭৫

৩৪। শ্রী গোপাল দাস চৌধুরী ও শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেন। 'প্রবাদ প্রবচন', সম্পা। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বুকল্যান্ড, ১৩৬৭। পৃ. ৫৮

৩৫। কাজী দীন মুহম্মদ। 'লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮ পৃ. ৮০

৩৬। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১। পৃ. ১০৭

৩৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৮

৩৮। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৪৯

৩৯। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১। পৃ. ৫০

৪০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫০

৪১। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১০

৪২। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৪৮

৪৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১০

৪৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৪৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৪৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৪৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৪৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৪৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৫০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৫১। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৮

৫২। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৯

৫৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪৯

৫৪। সুশীলকুমার দে। 'বাংলা প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, এ. মুখার্জি এন্ড কোং, ১৩৫২। পৃ. ৩৮

৫৫। উমেশচন্দ্র দত্ত। 'বাঙ্গালা প্রবচন'। উমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বামাবোধিনী, ১২৯৩। পৃ. ১৯০

৫৬। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৫০

৫৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫০

৫৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫০

৫৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫০

৬০। সুদেষ্ণা বসাক। 'বাংলার প্রবাদ'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮। পৃ. ৪৯

৬১। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯১। পৃ. ৫৮

৬২। আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলার লোকসাহিত্য'। প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯ সন। পৃ. ৭৯

৬৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৬

৬৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৬

৬৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৭

৬৬। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৫০

৬৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫১

৬৮। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯১। পৃ. ৮৭

৬৯। সনৎকুমার মিত্র, 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। পৃ. ৭৫১

৭০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫১

৭১। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫১

৭২। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫১

৭৩। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১। পৃ. ৬৫

৭৪। জয়শ্রী ভট্টাচার্য। 'বাংলা প্রবাদে নারীমন'। কলকাতা, সাহিত্য দর্পণ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৯। পৃ. ১১১

৭৫। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১। পৃ. ৬৭

৭৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৩

৭৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৩

৭৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৮

৭৯। লক্ষ্মী সাহা। 'বাংলা লোকসাহিত্যে স্বজন সম্পর্ক'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮। পৃ. ৭০

৮০। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১। পৃ. ৫৭

৮১। কাজী দীন মুহম্মদ। 'লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮। পৃ. ৫৮

৮২। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১। পৃ. ৫

৮৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০১

৮৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০১

৮৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০১

৮৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২০

৮৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২০

৮৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২০

৮৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২০

৯০। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২১

৯১। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২১

৯২। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২১

৯৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১৫

৯৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২২

৯৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২২

৯৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২২

৯৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২২

৯৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২২

৯৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২২

১০০। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৩

১০১। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৩

১০২। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৬

১০৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৬

১০৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৮

১০৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৮

১০৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৫

১০৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৫

১০৮। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'প্রবাদ প্রসঙ্গ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি। পৃ. ২৭৬

১০৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭৯

গ্রন্থপঞ্জি

১। অঞ্জনাভ দত্ত। 'ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১লা বৈশাখ, ১৪১১।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলা লোকসাহিত্য'। প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯ সন।

৩। উমেশচন্দ্র দত্ত। 'বাঙ্গালা প্রবচন'। উমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বামাবোধিনী, ১২৯৩।

৪। উমেশচন্দ্র দত্ত। 'প্রবাদ বিচার'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বামাবোধিনী, কার্ত্তিক, ১৩০০।

৫। কাজী দীন মুহম্মদ। 'লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী। ১৯৬৮।

৬। শ্রী গোপাল দাস চৌধুরী ও শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেন। 'প্রবাদ প্রবচন', সম্পা। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বুকল্যান্ড, ১৩৬৭।

৭। জয়শ্রী ভট্টাচার্য। 'বাংলা প্রবাদে নারীমন'। কলকাতা, সাহিত্য দর্পণ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৯।

৮। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। 'বাংলা সাহিত্যে মা'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৯৭৩।

৯। দীনেন্দ্রকুমার সরকার। 'প্রবাদের উৎস সন্ধানে'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে বুক স্টোর, ১৯৮৬।

১০। দুলাল চৌধুরী। 'চাকমা প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, লোকনিকেতন, ১৯৮০।

১১। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯১।

১২। মোহম্মদ হানীফ পাঠান। 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতি'। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৩৮২।

১৩। রেভারেন্ড জেমস্ লঙ। 'প্রবাদমালা'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ক্যালকাটা বুক অ্যান্ড ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৬৯।

১৪। লক্ষ্মী সাহা। 'বাংলা লোকসাহিত্যে স্বজন সম্পর্ক'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮।

১৫। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। 'প্রবাদ প্রসঙ্গ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৫।

১৬। সুশীলকুমার দে। 'বাংলা প্রবাদ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, ১৩৫২।

১৭। সৌগত চট্টোপাধ্যায়। 'লোকসংস্কৃতি : অন্তরমহল বারমহল'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৮।

১৮। সৌমেন দাশ। 'তুলনামূলক লোকসাহিত্য : পদ্ধতি ও প্রয়োগ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, আগস্ট, ২০০৬।

১৯। সত্যরঞ্জন সেন। 'প্রবাদ রত্নাকর'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যানস, ১৯৫৭।

২০। সুদেষ্ণা বসাক। 'বাংলার প্রবাদ'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।

পত্র-পত্রিকা

১। 'প্রবাদে কথন', (লোকায়ত গবেষণা পত্রিকা), অশ্বিনী মল্লিক, শারদ সংখ্যা, ১৯৯৭।

২। 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('নারী ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সনৎকুমার মিত্র, সম্পা. জানুয়ারি ২০০০।

৩। 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা' ('মা ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা), সনৎকুমার মিত্র, সম্পা. ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা।

বাংলা কিংবদন্তীতে নারী

নন্দিনী রায়

'মনুসংহিতা'-র সপ্তম অধ্যায়ের ৭৭নং শ্লোকে রাজার বিবাহযোগ্য রমণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্যাং সর্বণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্।"[১]

অর্থাৎ, সেই গৃহকে আশ্রয় করে (রাজা) সমানবর্ণা, সুলক্ষণা, উচ্চকুলজাতা, মনোরমা রূপবতী ও গুণবতী রমণীকে বিবাহ করবেন।

নারীর সৌন্দর্য, কোমল-মধুর রূপটি যুগ যুগ ধরেই সমাদৃত ও বন্দিত। বাংলা লিখিত সাহিত্যের ধারাতেও প্রাচীন যুগের চর্যাপদ থেকে শুরু করে অতি-সাম্প্রতিককালের সাহিত্যেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সাহিত্যের কালপ্রবাহের প্রতিটি ধারাতেই নারীমন ও নারীমননের কথা, নারীদের পেশা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্বালা-যন্ত্রণা, সমাজে তাদের অবস্থান ও পদমর্যাদা আর সূক্ষ্ম নারী-মনস্তত্ত্বের কথা ফুটে উঠেছে সাহিত্যিকদের কলমের আঁচড়ে। আবার, কখনও এই কলম ধরেছেন স্বয়ং নারী-ই।

লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা লোকসাহিত্যের প্রতিটি ধারাতেই নারীর সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। নারীসৌন্দর্য, নারীবন্দনার পাশাপাশি লোকসাহিত্যে নারী-নির্যাতনের স্বরূপটিও দুর্লভ নয়। 'শঙ্খমালা' গল্পের কাঠুরানি চরিত্রটি বলে—"মেয়ে হয় মার্‌বো, ছেলে হয় রাখ্‌বো।"[২] দেখা যাচ্ছে, নারী হয়েও নারীর প্রতি কতটা বিদ্বেষের মনোভাব। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন রূপরীতি বিশ্লেষণ করলেই সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তবে আমাদের আলোচনা বাংলা কিংবদন্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা লোককথার প্রতিটি শাখার মতো কিংবদন্তীতেও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নারীজাতি আদ্যন্ত সক্রিয়। সৌন্দর্য, সাহস আর বুদ্ধিমত্তার জীবন্ত বিগ্রহ বাংলা কিংবদন্তীর নারী। নির্ভীকতা ও দক্ষতার আশ্চর্য সমীকরণ ঘটেছে নারী চরিত্রগুলিতে। তবে এই বিষয়ে গভীরে অনুপ্রবেশের পূর্বে আমরা কিংবদন্তীর সাধারণ স্বভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব।

কিংবদন্তী হল সত্য, মিথ্যা ও সম্ভাবনার ত্রিবেণী-সঙ্গম। মারিয়া লিচ সম্পাদিত SDFML অভিধানে কিংবদন্তী সম্পর্কে বলা হয়েছে—"Legend has since come to be used for a narrative supposedly based on fact, with an intermixture of traditional materials, told about a person, place or incident."[৩] বিশেষ কোনও স্থান, ঘটনা বা ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত বিচিত্র জনশ্রুতি হল কিংবদন্তী। আধুনিক সমালোচকের মতে, "ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে লৌকিক কথাসাহিত্যের রূপ-ধারণকারী লোককাহিনিকে কিংবদন্তী বলা হয়।"[৪] কিংবদন্তীতে অলৌকিকতার প্রশ্রয় থাকে, অতিরঞ্জনও আছে। কিংবদন্তীর মানে যেমন সন-তারিখে সীমায়িত ইতিহাস নয়, তেমনই আকাশ-কুসুম কল্পনাও নয়। তাই অনেকের মতে—কিংবদন্তীগুলি হল অর্ধেক ইতিহাস আর অর্ধেক কল্পনা। লোকবিশ্বাস হল কিংবদন্তীর ভিত্তিভূমি।

আকৃতিতে সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির, নির্দিষ্ট কোনও রচয়িতার সন্ধান মেলে না, কিংবদন্তীগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমষ্টি মনেরই সৃষ্টির ফসল। কিংবদন্তী যাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়, সেই ঘটনাস্থল, ব্যক্তি বা বস্তু স্বচক্ষে দেখা যায়। পরিধিও বিশাল ও বহুমুখী। স্থাননাম, ব্যক্তিনাম ও বস্তুনাম, জলাশয়, ডিহি-ডাঙা, দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ, মেলা-উৎসব, বন-জঙ্গল ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রচুর কিংবদন্তী আছে। লোককথার অন্যান্য শাখার মতোই কিংবদন্তীর মধ্যেও বিধৃত থাকে সংশ্লিষ্ট জাতির জীবন-সংগ্রাম, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার এবং সর্বোপরি, তাদের গোষ্ঠীগত সমাজ মননের প্রতিচ্ছবি।

কিংবদন্তীর দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে আমরা অবিভক্ত বাংলার প্রতিই ইঙ্গিত করছি। বাংলা কিংবদন্তীগুলিতে ঘটেছে অজস্র নারীচরিত্রের সমাগম। এদের পরিচয় নানারকম। কেউ ঐতিহাসিক নারী, কেউ বা পৌরাণিক। স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে রয়েছে পার্থক্য। চারিত্রিক বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বাংলা কিংবদন্তীগুলিতে আমরা কেমন ধরনের নারীদের সঙ্গে পরিচিত হই, সমাজে তাদের অবস্থান-ভূমিকা-পদমর্যাদা কীরূপ, তারা কেন স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, কেন শ্রোতা-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম, তাদের চরিত্রগত বৈচিত্র্য—এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধটিতে অনুপুঙ্খ আলোচনায় ব্রতী হব।

নারীর রূপজ সৌন্দর্যের মোহে যুগ যুগ ধরে মুগ্ধ হয়েছে পুরুষজাতি। আর, সর্বগুণসম্পন্না হয়েও অসৌন্দর্যের কারণে নারীকে বারংবার হতে হয়েছে উপেক্ষিত। 'কহ কৌশিকী'[৫] নামাঙ্কিত কিংবদন্তীটিতে দেখি, রাজা হরিপালের কন্যা রাজকুমারী কানেড়ার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন মহাপ্রতাপ গৌড়েশ্বর ধর্মপাল। কিন্তু কানেড়ার দুঃসাহসিক প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেন না ধর্মপাল। রাজা ধর্মপাল প্রেরিত সেনাবাহিনীর সেনাপতি লাউসেনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন রাজকুমারী কানেড়া। এই অনুরাগ একপক্ষের নয়, ছিল উভয়পক্ষেরই। কানেড়া হন লাউসেনের সহধর্মিণী। আবার, রাজকন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে রাজপুত্ররা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনার অনতিদূরে কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী সীতা পাথর অঞ্চলে 'জামাই মারনী'[৬] নামক স্থানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত কিংবদন্তীটিতে দেখি, এক রাজার সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্যের সংবাদ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লে তাকে বিয়ে করার জন্য বিভিন্ন রাজপুত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল। নারীর অপরূপ রূপ দেখে কখনও বা পুরুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কামার্ত হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রামের পাহাড়তলি অঞ্চলে অবস্থিত 'ভেলুয়া সুন্দরীর দিঘি'[৭] সংক্রান্ত কিংবদন্তীতে আছে—অপরূপ সুন্দরী ভেলুয়া একদিন যমুনার তীরে গেলে তার অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হয় যমুনা দিয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়া চট্টগ্রাম নিবাসী এক সদাগর। পুরুষটি নদীর পাড় থেকে ভেলুয়াকে চুরি করে নিয়ে যায়। আবার, 'মহীপালের দিঘি'[৮]-র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে একটি অপহরণ কাহিনি। রঙ্গপুরের সন্নিহিত দিনাজপুর নামক স্থানে অবস্থিত দীঘিটি পালবংশের অন্যতম বিখ্যাত নৃপতি মহীপাল নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। গ্রাম্য কন্যা লীলা যখন ঐ দীঘিতে স্নানরতা, তখন তাকে নৃপতি মহীপাল অপহরণ করেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ'[৯] গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। এই ঘটনা নৃপতি চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের পাশাপাশি সাধারণ গ্রাম্য নারীর অসহায়ত্বের দিকটিও উন্মোচন করেছে। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর ধামের 'ব্রহ্মকুণ্ড'[১০] সম্পর্কে শোনা যায়, একসময় ব্রহ্মা তাঁর কন্যাকে কামাতুর চোখে দেখেন। এই পাপবোধ থেকে শান্তিলাভের আশায় তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তিনি নানা জায়গা ঘুরে বক্রেশ্বরধামে এসে এই কুণ্ডে

স্নান করে পাপবোধ থেকে মুক্তিলাভ করেন। পরপুরুষ তো দূরের কথা, পিতার স্নেহপ্রবণ দৃষ্টিতেও জায়গা করে নিতে দেখি কাম-লালসাকে। এর থেকে লজ্জাজনক, অসহায়ত্ব নারীর আর কী হতে পারে!

আমাদের দেশে যখন মুসলমান রাজত্বের রমরমা, তখন বারংবার যবনের কু-দৃষ্টির কোপে পড়তে হয়েছে হিন্দু রমণীদের। এই প্রকার লালসা-নিষিক্ত কামনা জড়িত হয়ে আছে 'সরকার ঝি'[১১] দীঘিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত জনশ্রুতিটিতে। আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ সেরেস্তার কর্মচারী রাজারাম সরকারের সুন্দরী বাল-বিধবা কন্যার প্রতি লোভের হাত বাড়াল সৈন্যাধ্যক্ষ লাল খাঁ। সরকার-কন্যা বুদ্ধির জোরে লাল খাঁ'র কাছে আত্মসমর্পণের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেন ও শর্ত আরোপ করেন, সেনহাটীর জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য একটি দীঘি খনন করার। খনন কার্য সমাপ্ত হলে সেই দীঘির জলেই আত্মবিসর্জন করে আপন সতীত্ব রক্ষা করেন সরকার-ঝি। এই কাহিনিটিতে নারীর বুদ্ধিমত্তা, সতীত্ব রক্ষার প্রয়াসের যুগল মিলন ঘটেছে। দক্ষিণ বাঁকুড়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় শস্য উৎসব 'টুসু'[১২]-কে কেন্দ্র করে প্রচলিত জনশ্রুতিটিতে দেখি, অসাধারণ সুন্দরী যুবতী টুসুর প্রতি এক মুসলমান শাসনকর্তার লোলুপ দৃষ্টি পড়লে সতীত্ব রক্ষার নিমিত্তে টুসু নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বগুড়ায় অবস্থিত 'শীলাদেবীর ঘাট'[১৩] সংক্রান্ত কিংবদন্তীটিতে পাই, রাজা পরশুরামের কন্যা শীলাদেবীকে পিরশাহ বিয়ে করতে চাইলে রাজকন্যা তাঁর কঙ্কণের আঘাতে পিরশাহ-কে পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করেন এবং নিজেও জলে আত্মত্যাগ করেন। বাংলাদেশের ঝিনাইদহে অবস্থিত হরিহরা গ্রামের রাজার অপরূপা সুন্দরী কন্যা শৈলবালাকে[১৪] বন্দি করে পাঠানরা সেনাপতি দৌলত খানের শিবিরে পাঠিয়ে দেয়। সেনাপতি শৈলবালার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন শৈলবালা। পরিণামে, শৈলবালাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ দেখতে পাই, পুরুষের প্রণয়-প্রস্তাব যখনই নারীরা প্রত্যাখান করেছে, তখনই নারীদের কপালে ঘনিয়ে এসেছে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ।

নারীর রূপসৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ ভুলেছে তার ধর্ম ও কর্তব্যবোধ। বিস্মৃত হয়েছে শুভ-অশুভের ফারাক সম্পর্কে। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ হুগলির যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন রাজা শোভাসিংহের প্রগল্‌ভ জীবনের বিলাসরাত্রির সঙ্গিনী অতিরূপসী লালবাঈকে। লালবাঈ-এর জন্য রাজা রঘুনাথ পরিবার, কর্মচারী, প্রজাবৃন্দসহ ইসলাম ধর্মগ্রহণেও প্রস্তুত। তাঁর নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। ধর্মবোধ থেকে রাজা যখন বিচ্যুত, রানি তখন স্বমহিমায় নিজের রাজ্য ও রাজ্যবাসীর সুরক্ষায় অটল। 'পতিঘাতিনী সতী'[১৫] হয়ে তিনি সহমৃতা হয়েছেন। রূপসী নারীর কুটিল অভিপ্রায়ের পাশাপাশি প্রজাকল্যাণকামী ও দেশবাসীর ধর্মরক্ষায় অবিচল, কর্তব্যবোধে উজ্জ্বল নারীর পরিচয়ও আমরা পেয়ে যাই।

'মেহের হামারা'[১৬] শীর্ষক কিংবদন্তীটিতে দেখি, পরস্ত্রীর রূপসৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ, দুর্বার আকর্ষণে নির্দোষ শের আফগানকে হত্যা করেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির। কিন্তু শের আফগানের সুন্দরী স্ত্রী মেহেরউন্নিসা আগ্রার বাদশাহি প্রেমকে উপেক্ষা করে গভীর রাত্রে ভূতপূর্ব স্বামীর কবরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রেমের স্মারক উপহার রেখে যায়।

সামাজিক বিভিন্ন ক্ষতের শিকার হতে হয়েছে নারীকে। মুর্শিদাবাদের বোলডাঙার কাছে ন'পুকুরের 'ডুমনিতলার মা'[১৭]-কে ঘিরে গড়ে ওঠা কিংবদন্তীটিতে দেখি, এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী যুবক দেশ পর্যটনে বের হয়ে অনাথিনী এক কুমারীর প্রণয়াসক্ত হয়ে সেই পল্লিকুমারীর পাণিগ্রহণ

করলেন। কিন্তু দুর্যোগকালে নিজ স্ত্রীকে কাঁচা বাঁশের ছিলকা নিপুণ হস্তে তুলে ফেলতে দেখে ভাবেন, তিনি নিশ্চয়ই দৃষ্টি-বিভ্রমে নীচজাতির মেয়েকে (ডোম রমণীকে) বিবাহ করে ফেলেছেন। অগত্যা বংশগৌরবে গরবী যুবকটি স্ত্রীকে অরণ্যে নির্বাসন দিয়ে পালিয়ে যান। বংশ-গরবীর সকল উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে সংঘটিত জেহাদ শিলীভূত হয়ে রয়েছে ডুমনিতলার মায়ের মূর্তিতে। তাই আজ জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ সেই দেবীকে ভক্তিভরে পুজো অর্পণ করেন।

এই ব্রাহ্মণ ভূস্বামী কন্যা লীলা ও সুতানুটিতে ইংরেজের প্রথম কুঠি স্থাপনকারী জোব চার্নক-কে নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতিটিতে[১৮] দেখি, কৌলিন্য প্রথার ফলে তিন বৎসরের শিশুকন্যা লীলাকে শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে এক বয়স্ক ব্রাহ্মণের কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল। সেই স্বামী চলে গেলেন বারাণসী ধামে। লীলা যে স্বামীকে জীবনে ভালো করে দেখল না, জানল না, অথচ সেই স্বামীর চিতাকে তাকে ওঠানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল জনসমাজ। এমনই বিচিত্র সামাজিক রীতি-নীতি। আবার, 'গোবিন্দধামের মেলা'[১৯] সংক্রান্ত কিংবদন্তীটি থেকে জানা যায়, দস্যুদ্বারা নবোঢ়ার আক্রান্ত হওয়ার কথা, বর্তমানে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্তের ঘটনা দুর্লভ হলেও বেড়েছে ইভ্-টিজিং-এর মতো জ্বলন্ত সমস্যা। এ-ও তো সমাজে নারী-অবমাননার এক মারাত্মক হাতিয়ার। কিংবদন্তীতে আবার নারী কখনও হয়ে উঠেছে ভোগ্যপণ্য। বাংলাদেশের জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজা[২০] সম্পর্কে কিংবদন্তী হল, তিনি ছিলেন ভোগী ও নারীপ্রেমিক। তিনি যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন, তখন প্রতিটি সিঁড়ির ধাপে ধাপে একটি করে সুন্দরী নারী দাঁড়িয়ে থাকত, তিনি তাদের স্পর্শ করে উঠতেন। রাজার দুই স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রজাদের সুন্দরী নারী ভোগ করতেন। পুরুষের বাসনা-লালসার কাছে নারী কতটা অসহায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়ত্বের করুণ কাহিনিও এভাবে ফুটে উঠেছে বাংলা কিংবদন্তীতে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে দিতে হয়েছে সতীত্বের পরীক্ষা। দক্ষিণ বাঁকুড়ার জনপ্রিয় কৃষি উৎসব 'ভাদু'[২১]-কে কেন্দ্র করে জনশ্রুতি আছে যে, মানভূম পঞ্চকোট রাজ্যের কন্যা ধর্মপরায়ণা ভাদু দেব দেউলে রাত্রিযাপন করলে রাজপরিবারে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটে ভাদুর আত্মহননে। বিনা অপরাধে কেবলমাত্র আপন সতীত্ব প্রমাণ করবার জন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে রাজকন্যা ভাদু। রাজ-পরিবারে নারীর পরিণতি যদি এতটা করুণ হয়, তাহলে সমাজের নিচুতলার মানুষগুলোকে বলা বাহুল্য মেয়েদের তো পদে পদে নিজেদের সতীত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার পাশাপাশি তার প্রমাণও দিতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

নারীর প্রেমিকাসত্তার পরিচয় মেলে বাংলা কিংবদন্তীতে। নিখাদ প্রেম মানে না জাত-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বাধাকে। বাংলাদেশে প্রবাহিত খোয়াই নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা কিংবদন্তীটিতে[২২] পাই, মন্ত্রীকন্যা ক্ষেমাই ভিন গাঁয়ের বণিক যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হলে মন্ত্রী কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বগোত্রীয় এক যুবকের সঙ্গে ক্ষেমাইয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু ক্ষেমাই ভালোবাসার টানে গৃহত্যাগী হয়ে প্রণয়ের তাগিদে খরস্রোতা নদীতে আত্মবিসর্জন দিল। 'সখিসোনার পাঠশালা'[২৩] সম্পর্কিত কিংবদন্তীটিতে রাজকুমারী হয়েও রাজা বিক্রমজিতের কন্যা সখিসোনা কোটালপুত্র অহিমানিককে ভালোবেসে রাজ্য ছেড়ে চলে যান কোটালপুত্রের সঙ্গিনী হয়ে। এক্ষেত্রে ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয় শ্রেণিবৈষম্য। যথার্থ প্রেমিকাসত্তার কাছে পরাস্ত হয় বিত্তবৈভব, ধন-সম্পদ। আর তাই তো, শাহজাদি আমিনা আমির হুসেন খাঁ-র পরিবর্তে তুচ্ছ সামান্য বৃত্তিভুক মনসবদার ওসমানকে ভালোবাসে।[২৪] পদমর্যাদা, আর্থিক সংগতি সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায় শাশ্বত প্রেমের কাছে।

প্রেম যে মানস-প্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম, তার উজ্জ্বল নিদর্শন যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ রডার কাহিনি।[২৫] দস্যুতা পরিত্যাগ করে যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের প্রভুত্ব স্বীকার করবার কারণ ইতিহাস যা-ই নির্দেশ করে থাকুক, কিংবদন্তী রডার এই বিশ্বস্ততার পশ্চাতে আবিষ্কার করেছে এক বঙ্গললনার প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়মাধুর্যকে, যে প্রেম দুর্দান্ত দস্যু রডাকে রূপান্তরিত করেছে প্রেমিকে। এ-তো নারীর প্রেমের এক শক্তিরই পরিচয়।

স্বামীর যথার্থ অর্ধাঙ্গিনীরূপে নারী আবির্ভূত হয়েছে বাংলা কিংবদন্তীতে। ধর্মপ্রাণা ও পতিব্রতা নারীর পরিচয় মেলে বক্রেশ্বরধামের উষ্ণ প্রস্রবণ 'জীবিতকুণ্ড'[২৬] সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনিটিতে। ধর্মপ্রাণা চারুমতী স্বামী সর্ব-এর প্রাণ ফিরে পাবার জন্য মহাদেবের তপস্যা করলে তাঁর ভক্তিতে মুগ্ধ হন মহাদেব। ফলে সর্ব পুনরায় প্রাণ ফিরে পান। অর্থাৎ চারুমতী কেবল ধর্মপ্রাণই ছিলেন না, ছিলেন পাতিব্রত্যের আদর্শ নিদর্শন। কবিগানের শিল্পী রাধাবল্লভ সরকার[২৭]-কে নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতিতে আছে, শিল্পীর পায়ের ব্যথা-যন্ত্রণা ভোগ করেন তাঁর স্ত্রী। শিল্পী নিজের ব্যথা স্ত্রীর উপর অর্পণ করেন গানের আসরে শ্রোতাদের তাঁর সুকণ্ঠের গানের আস্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না করবার উদ্দেশ্যে। এ-ও তো পাতিব্রত্যেরই চিহ্ন। স্বামীর নিন্দা করলে প্রতিবাদে মুখরা হয়ে উঠেছে নারী। দক্ষযজ্ঞের সময় অনুপস্থিত শিবের নিন্দা শুনে তো সতী দেহত্যাগই করেছেন। কিন্তু স্বামী অন্যায়-আচরণ করলে স্বামীর বিরুদ্ধেই শানিত ধ্বনি উচ্চারণ করেছে বাংলা কিংবদন্তীর নারী। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইংরেজতোষণ, যা দেশদ্রোহিতারই নামান্তর, তার বিরুদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠা মহিষীই গর্জন করে উঠেছেন।[২৮]

বাংলা কিংবদন্তীতে নারী এসেছে বিভিন্ন রূপে—কখনও প্রেমিকা, কখনও জায়া কিংবা জননীরূপে। কখনও ঘটেছে জায়া ও জননীরূপের মধ্যে দোলাচলতা। মাতৃস্নেহের নিকট পরাভূত হয়েছে দৈবশক্তি। 'গণেশ জননীর আবির্ভাব'[২৯] শীর্ষক কিংবদন্তীটিতে ইন্দুমতী প্রথানুযায়ী গঙ্গায় শিশুপুত্র সমর্পণ করে উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করে ওঠেন। সেই মায়ের আর্তকণ্ঠের চিৎকারে গঙ্গার তরঙ্গই সেদিন শিউরে উঠে চূর্ণ হয়ে গেল। ফিরিয়ে দিল ইন্দুমতীর সন্তান। মায়ের স্নেহের দুর্বার শক্তির নিকট পরাভব ঘটেছে দেবীর শক্তির ও প্রচলিত সংকীর্ণ প্রথার।

স্বামী-সন্তান পালনের পাশাপাশি বাংলা কিংবদন্তীতে এসেছে নারীর প্রজাপালন, অতিথি-পরায়ণতা, দেশপ্রেমের প্রসঙ্গটিও। প্রজাবৎসল রানিদের প্রজাকল্যাণের স্বার্থে দিঘির জলে আত্মোৎসর্গের করুণ কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে 'রানির দিঘি'[৩০], বাংলাদেশের নেত্রকোনায় অবস্থিত 'কমলারানির দিঘি'[৩১] সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীতে। আবার, সম্ভ্রান্ত, উচ্চবর্ণের কাছে যারা উপেক্ষিত, ব্রাত্য, তাদের কল্যাণার্থে রানি দিঘি খনন করিয়েছেন, এমনকি সর্বসুখে সুখী রানি মধুমঞ্জরী[৩২] কেবলমাত্র প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন এবং প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তার চোখ থেকে নির্গত হয়েছে চোখের জল। এ-তো নারীর শুচিস্মিত, কল্যাণী মূর্তির স্বরূপ। রংপুরে অবস্থিত 'আঁদনীর চর'[৩৩]-কে কেন্দ্র করে গনে ওঠা কিংবদন্তীতে নারীর অতিথি-পরায়ণা সেবাময়ী রূপটি ফুটে উঠেছে।

বাংলা কিংবদন্তীর নারী সৎ ও সাধুকে সম্মানিত করতে জানে, আবার নিষ্ঠুরকে শাস্তিও প্রদান করে। কামতাপুর রাজ্যের শেষ রাজা নীলাম্বরের[৩৪] দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা করেই তাঁর মন্ত্রীর স্ত্রী ক্ষেমাদেবী পুত্রহন্তা হওয়া সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক নৃপতিকে মুক্ত করেন মুসলমানের কারাগৃহ থেকে। নারীর নেতৃত্বদানের দক্ষতার পরিচয় পাই চুয়াড় বিদ্রোহের নেত্রী কর্ণাগড়ের রানি শিরোমণিকে[৩৫]

নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তীটিতে। ইংরেজদের চাটুকার গোবর্ধন দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় দলের পরাজয় ঘটালেও রানি সসম্মানে অঙ্গীভূত হয়েছেন ভগবতী মহামায়ার বিগ্রহমূর্তিতে।

নারীর বহুবিধ চারিত্রিক গুণাবলির পাশাপাশি নারীর কিছু খারাপ স্বভাবের নিদর্শনও মেলে বাংলা কিংবদন্তীগুলিতে। নারীই হয়ে উঠেছে নারীর শত্রু। 'বহরা মণ্ডলার বুড়ি'[৩৬] সংক্রান্ত কিংবদন্তীটিতে পাই, খেপুর মা নামক এক বুড়ির কুট্টিনি বৃত্তি। তার কাজ ছিল সুন্দরী নারীদের জাহাঙ্গির বাদশাহের সেনাপতিদের বজরায় নিয়ে আসা। আবার, নারীর কুটিল মনের পরিচয়ও পাই 'আশাবরী'[৩৭] নামক একটি লোহার লাঠিকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনশ্রুতিটিতে। তাজ খাঁ'র স্নেহের আত্মভোলা ভাই সিকন্দরকে সহ্য করতে পারতেন না তাঁর এক মহিষী। তাই সিকন্দরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করতেও পিছপা হননি তাজ খাঁ'র সেই মহিষী। ঈর্ষা-কুটিলতা-ষড়যন্ত্রের জালে পরিপূর্ণ এক নারীমনের অন্ধকার বিবরের পরিচয় এর থেকে আমরা পাই।

কোনও কোনও নারীকে বাংলা কিংবদন্তীতে চিহ্নিত করা যায় তাদের পেশা ও বৃত্তির দ্বারা বিশেষ পরিচয়ের মাধ্যমে। বাংলা কিংবদন্তীতে আছে বারাঙ্গনা হীরা নটীর[৩৮] পরিচয়। বেনাপোলের ভূস্বামী বৈষ্ণব বিদ্বেষী রামচন্দ্র খাঁ বারাঙ্গনা হীরা নটীর সহায়তায় ভক্ত হরিদাসের। চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা করলেও তা নিষ্ফল হয়। পরিবর্তে, হরিদাসের হরিনাম জপের মধুর ঝঙ্কার হীরাকে পরিণত করেছে ভক্তিপ্রাণা এক সন্ন্যাসিনীতে। আবার, 'গীতগোবিন্দম্'-এর রচয়িতা জয়দেব ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী যে সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তা-ও প্রচার করেছে কিংবদন্তী।[৩৯]

আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ ঠিক কেমন ছিল, তার দিকেও ঈঙ্গিত করেছে বাংলা কিংবদন্তী। রানি কমলাবতীকে[৪০] নিয়ে চলিত কাহিনিটিতে আছে, রাজা পদ্মনাভের সহোদরা কেউকা মেনে নিতে পারেননি পদ্মনাভের বিবাহকে আর পদ্মনাভের স্ত্রী কমলার প্রতি ঈর্ষা তো সেক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। আসলে কেউকার উদ্দেশ্য নিজপুত্রকে পদ্মনাভের রাজ্যের উত্তরাধিকারী করা। উদ্দেশ্যপরায়ণা নারীর পাশাপাশি কেউকা মাতৃস্নেহেও বিভোর। পারিবারিক পরিধিতে শাশুড়ি-বধূ সম্পর্ক তিক্ততা ও মধুরতায় পরিপূর্ণ। পুত্রবধূ সন্তানহীনা হলে অবিরত নির্যাতিত হতে হয় শাশুড়ির কাছে—এই করুণ বাস্তব সত্যের পরিচয় মেলে 'পোয়াতিবিল'[৪১]-কে ঘিরে গড়ে ওঠা কাহিনিটিতে। একজন মা হয়েও শাশুড়ি বোঝে না বৌয়ের মা না-হতে পারার যন্ত্রণাটা। নদীয়ার চাঁদের কুমির হওয়া সম্পর্কিত কাহিনিটিতে[৪২] দেখি স্ত্রীর আবদারে স্বামীর কুমিরে পরিণত হওয়া আর সেই কারণে মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদ।

ভাই-বোনের সম্পর্ক স্নেহের, আবদারের আর ভালোবাসার। বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার 'ভাই-বোনের দিঘি'[৪৩] এক করুণ কাহিনির বার্তাবাহক। ভাই-বোনের পারস্পরিক নির্ভরতা ও একে-অপরকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হওয়ার পরিচয় মেলে এই করুণ আখ্যায়িকায়। আবার, ভাই-বোনের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে কখনও যৌনতার আধার। কোচবিহারে প্রচলিত একটি জনশ্রুতিতে[৪৪] পাই, কোচবিহারের এক রাজকুমার রাউনা সাবালক হয়ে তার বাবার কাছে শর্ত জানায় যে, সে তার বোন রাউনিকে বিয়ে করবে। বোন এতে আপত্তি জানালেও বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে রাউনি আত্মহত্যা করল। এই যে সহোদরাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব, এ-তো আসলে যৌন সম্পর্ক স্থাপনেরই ইঙ্গিতবাহী। নারী এক্ষেত্রে নারাজ থাকলেও তার স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার লোকের যে বড্ড অভাব।

ঐতিহাসিক ও লৌকিক নারীর পাশাপাশি বাংলা কিংবদন্তীতে এসেছে পৌরাণিক ও লৌকিক

বিভিন্ন দেবীরা। একেবারে লৌকিক দেবীদের নামানুসারে হয়েছে বিভিন্ন স্থানের নাম। যেমন—আসানসোলের প্রাচীন উপজাতিদের দেবী ঘাঘরি বুড়ি, ননী বুড়ি, কোলাবুড়ির নামানুসারে হয়েছে স্থাননাম যথাক্রমে—ঘাঘরিবুড়ি, নুনিগ্রাম, থেলোকোলা[৪৫] গ্রাম। আর, শাঁখা পরানো নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলিতে তো স্বয়ং দেবী আবির্ভূতা হচ্ছেন গ্রাম্য বালিকার সরল বেশে। দেবী চরিত্রের মধ্যেও ঈর্ষার বোধটি যথাযথভাবে অঙ্কিত। এমনকি, রূপসৌন্দর্যে সাধারণ মানবীকে ঈর্ষা করতেও পিছপা হননি দেবী মহামায়া। বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামেরই একটি কিংবদন্তীতে[৪৬] এই ঘটনার সমর্থন মেলে। কোচবিহার জেলার দেবী ভাণ্ডানীকে ঘিরে সংগ্রথিত কিংবদন্তীটিতে আবার অনার্য শস্য দেবী ভাণ্ডানীর সঙ্গে পৌরাণিক দেবী দুর্গাকে সংযুক্ত করে আর্যীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।[৪৭]

সুতরাং বলা যায়, বাংলা কিংবদন্তীর জগতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে নারীর বিভিন্ন রূপে ও মূর্তিতে। নারীর প্রেমিকাসত্তা, কল্যাণীমূর্তি, জায়া ও জননীরূপ সবই ধরা পড়েছে বাংলা কিংবদন্তীর দেশে। দেবী-মানবী-ঐতিহাসিক চরিত্রের বিচিত্র সহাবস্থান ঘটেছে বাংলা কিংবদন্তীর শাখাটিতে।

সমাজের আদিপর্বে গোষ্ঠীর স্বার্থে নারীর অবস্থানটি প্রয়োজনীয় ছিল। নারীর উর্বরাশক্তি ও প্রজনন ক্ষমতা পুরুষের কাছে প্রেয়। তাই সে প্রয়োজনে ও কৃতজ্ঞতাবোধের তাগিদে প্রণত হয়েছে নারীর নিকট। ধীরে ধীরে নারীর পদমর্যাদার উন্নতি ঘটলেও আদৌ তা কতটা বাস্তবে কার্যকর হয়েছে তা মতামত সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে কন্যাভ্রূণ হত্যা আমাদের এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন করে দেয়।

বাংলা কিংবদন্তীগুলি নারীবাদ বা পুরুষবাদের কোনও ইশতিহার নয়। তারা সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা, গোষ্ঠীমননের ধারা, মানব চরিত্রের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যগুলিকে কেবল জনসমাজের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছে। বাংলা কিংবদন্তীগুলিতে নারীর অবমূল্যায়নের অজস্র নিদর্শনের পাশাপাশি মেলে নারীর নির্ভীক মানসিকতা, বীর্য, সতীত্ব, বাৎসল্য, মাতৃত্ব, তিতিক্ষা, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয়। শারীরিক কর্মদক্ষতার সঙ্গে শ্রী ও মাধুর্যের মিশ্রণ পরিপূর্ণ করেছে রমণীয়ত্বকে। নারীর কুটিল স্বভাব ধিকৃত হয়েছে। আর সুলক্ষণা, স্বভাবে মধুর, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় উজ্জ্বল নারী আদায় করেছে সামাজিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা।

তথ্যসূত্র

১। অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী। 'মনুসংহিতা, সপ্তমোহধ্যায়'। কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৪। পৃষ্ঠা ঃ ১৫১।

২। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। দ্বাবিংশ সংস্করণ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলির্শাস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৭-২৭৮।

৩। Maria Leach ed. 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend' (in one vol.) New York, Funk and Wagnalls, 1984, Page-612.

৪। শীলা বসাক। 'বাংলার কিংবদন্তী'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৩। পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

৫। সুবোধ ঘোষ, 'কিংবদন্তীর দেশে'। কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১১। পৃষ্ঠা ঃ ১৭-২১।

৬। শীলা বসাক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যাক)। পৃষ্ঠা ঃ ৪১।

৭। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ২০৩।

৮। অন্তরা মিত্র। 'জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার-বিশ্লেষণ'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৪। পৃষ্ঠা ঃ ৩১৮-৩১৯।

৯। দীনেশচন্দ্র সেন। 'বৃহৎবঙ্গ'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৬। প্রথম খণ্ড। পৃষ্ঠা ঃ ২৬২।

১০। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৩১৯।

১১। অন্তরা মিত্র। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৩১৯।

১২। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ১৮১।

১৩। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৩১।

১৪। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৬৭-৬৮।

১৫। সুবোধ ঘোষ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৭১-৭৭।

১৬। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৩০-৩৩।

১৭। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৩৪-৩৭।

১৮। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ১১৯-১২৩।

১৯। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫।

২০। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৮৩।

২১। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ১৮১।

২২। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ২৪৫।

২৩। সুবোধ ঘোষ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ২২-২৫।

২৪। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৩৮-৪৩।

২৫। অন্তরা মিত্র। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৩১৭-৩১৮।

২৬। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৩১৮।

২৭। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ২৭৭।

২৮। অন্তরা মিত্র। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৩।

২৯। সুবোধ ঘোষ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ১৭১-১৭৬।

৩০। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ২২৪।

৩১। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ১৮২-১৮৩।

৩২। সুবোধ ঘোষ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৭৮-৮১।

৩৩। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ২৯২-২৯৪।

৩৪। সুবোধ ঘোষ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ১৫৮-১৬৪।

৩৫। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫-১৭০।

৩৬। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ২৬৮।

৩৭। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে'। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জুন ২০১০। পৃষ্ঠা ঃ ১৪১-১৪২।

৩৮। অন্তরা মিত্র। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৩১৭।

৩৯। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৩১৬।

৪০। শীলা বসাক। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ২৪৮-২৪৯।

৪১। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ২০৫।

৪২। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ২৭-২৮।

৪৩। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ১৯০-১৯১।

৪৪। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ৩০৬।

৪৫। ঐ। পৃষ্ঠা ঃ ২৩।

৪৬। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'লোককথার সাতকাহন'। কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১১। পৃষ্ঠা ঃ ৭৫-৭৬।

৪৭। অন্তরা মিত্র। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮ সংখ্যক)। পৃষ্ঠা ঃ ৩২৭-৩২৮।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। অন্তরা মিত্র। 'জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার-বিশ্লেষণ'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৪।

২। অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী। 'মনুসংহিতা, সপ্তমোহধ্যায়'। কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৪।

৩। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। দ্বাবিংশ সংস্করণ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮।

৪। দীনেশচন্দ্র সেন। 'বৃহৎবঙ্গ'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৬। প্রথম খণ্ড।

৫। দীনেশচন্দ্র সেন। 'বৃহৎবঙ্গ'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৬। দ্বিতীয় খণ্ড।

৬। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'লোককথার সাতকাহন'। কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১১।

৭। বরুণকুমার চক্রবর্তী। 'লোকসংস্কৃতির সুকুল সন্ধানে'। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জুন ২০১০।

৮। বিনয় ঘোষ। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, সপ্তম মুদ্রণ, মার্চ ২০১০। প্রথম খণ্ড

৯। বিনয় ঘোষ। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮। দ্বিতীয় খণ্ড

১০। বিনয় ঘোষ। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, পঞ্চম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৯ তৃতীয় খণ্ড।

১১। বিনয় ঘোষ। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'। চতুর্থ সংস্করণ। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ২০০৭ চতুর্থ খণ্ড।

১২। শীলা বসাক। 'বাংলার কিংবদন্তী'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৩।

১৩। সুবোধ ঘোষ। 'কিংবদন্তীর দেশে'। কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১১।

English Book

1. Maria Leach edited. 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend' (in one vol.). New York, Funk and Wagnalls, 1984.

আঞ্চলিক ভাবনাবিশ্বের প্রেক্ষিতে ভবতোষ শতপথীর কবিতা-বিচার

পৌলোমী রায়

চির প্রবহমান মানবের ধারা। সেখানে প্রকৃতি থাকে পটভূমি হিসাবে। মানুষ আর প্রকৃতি নিয়ে রচিত হয় এক সম্পূর্ণ প্রতিবেশ। প্রকৃতির মাঝেই মানুষ প্রাচীনকাল থেকে উন্মুক্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেছে নিজের মতো করে। আবার প্রকৃতির সাথে সাযুজ্য রেখে বদলেছে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অভ্যাস। প্রকৃতির সঙ্গো মানুষের এই যে সম্পর্ক, তাই আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য বহন করে। আমাদের এই সময়ের বাংলা সাহিত্যে বহুল চর্চিত একটি বিষয় হল আঞ্চলিক বাংলা উপন্যাস। তারই সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আমরা বিচার করব আঞ্চলিক বাংলা কবিতার গতিবিধি, বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং ভবিষ্যৎকে। মুখ্যত বাংলা আঞ্চলিক কবিতার আঁতুড়ঘর হিসাবে চিহ্নিত করা যায় রাঢ় বাংলার পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকে। শহরে যে এই কবিতার চর্চা হয়নি তা নয়। তবে রাঢ় বাংলার কবিতাই স্বধর্মগত কারণে আঞ্চলিকতাকে বেশিমাত্রায় স্পর্শ করতে পেরেছে। এই রাঢ় বাংলারই একজন অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক কবি হলেন ভবতোষ শতপথী।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ বর্ধিষ্ণু চাষি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ভবতোষ শতপথী। শৈশবে নাম রাখা হল ভবতারণ। বাবা শ্রীপতিচরণ শতপথী, মা বিনোদবালা দেবী। যৌবনে কবির পিতা শ্রীপতিচরণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পেডি সাহেবের হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। পিতার সূত্রে কবির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল গভীর দেশাত্মবোধ। তবে তিনি বিপ্লবের অতিরিক্ত উগ্র পন্থায় দেশের সেবক হতে চাননি। বরং তিনি সেবা করতে চেয়েছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্তে ছড়িয়ে থাকা আটপৌরে দরিদ্র মানুষকে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা-অসহায়তা-বঞ্চনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন কবিতায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলেবেড়ার অনতিদূরে জামবনী, যার একটি গ্রাম টুলিবড়। সেখানে অনেক মাহাত আদিবাসী পরিবারের মধ্যে শতপথীরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ। তবু বর্ণবোধের কলুষতা থেকে অনেক দূরে থেকে শৈশবে ভবতোষ সব শিশুকেই তাঁর খেলার সাথী করতে পেরেছিলেন এবং তাদের রুচি-ভাষা-সহ যাপিত জীবনের সাথে স্বচ্ছন্দে মিশে যেতে পেরেছিলেন অনায়াসেই। সেখান থেকেই আঞ্চলিকতার প্রতি কবির গভীর টান। তার প্রকাশ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো উপন্যাসে না হয়ে হল কবিতায়। যেখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধরা পড়ল মৃত্তিকাসম্পৃক্ত অখণ্ড জীবনের ধারাভাষ্য। লোকায়ত কবি ভবতোষ শতপথীর সমগ্র কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকল অনন্য কাব্যগ্রন্থ 'অরণ্যের কাব্য' (প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর, ২০০৪)। এরই অন্তর্গত 'শিরি চুনারাম মাঁহ্‌ত', 'চেম্‌না মঙ্গল', 'জুমড়া' জুড়ে আছে আঞ্চলিক কবিতার সামগ্রিক ও পরিব্যাপ্ত সম্ভার।

সাধুভাষার শক্তিসামর্থ্য সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু চলিত ভাষা রীতিতে চলমান জীবনের জীবন্ত ছন্দ বেশি থাকায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষা রূপটিকেই বেশি মান্যতা দেওয়া হয়েছে। যদিও অঞ্চলভেদে যেসব ভাষা ছাঁদ গড়ে ওঠে, তাকে সাধু ও চলিতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই এসব আঞ্চলিক ভাষা ছাঁদ এত স্বকীয় ও সক্রিয় হয়ে ওঠে যে,

এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠার প্রবণতা পায়। এভাবে বাংলা ভাষায় অঞ্চলভেদে অন্তত পাঁচটি প্রধান উপভাষা গড়ে উঠেছে—রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। তবে প্রধান হলেও এগুলিই সব নয়। আধুনিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতিতে এসব ভাষাগুলি পারস্পরিক প্রভাবজাত দ্রুত পরিবর্তনে একে অন্যের প্রবণতা যেমন গ্রাস করতে থাকে, তেমনি ছোটো ছোটো অঞ্চলে আলাদা আলাদা ভাষা ছাঁদ তৈরি হতে থাকে। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা একেই বলেছেন উপভাষা বৈচিত্র্য, যা কিনা ভাষার একটি আধুনিক লক্ষণ।[২] আবার মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলা উপভাষাকে ভাগ করেছেন প্রধান দুটি পর্যায়ে—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য। পাশ্চাত্য অর্থে পশ্চিম দেশীয় এবং প্রাচ্য অর্থে পূর্বদেশীয়। পাশ্চাত্য উপভাষার তিনি পাঁচটি বিভাগ করেছেন আর প্রাচ্য উপভাষার করেছেন তিনটি বিভাগ।

সেই সূত্রে আমাদের আলোচ্য ভবতোষ শতপথীর লেখা আঞ্চলিক কবিতার ভাষা পাশ্চাত্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

আঞ্চলিক জল হাওয়া ভেদে ভাষার এই বিভাজন সর্বজন স্বীকৃত হলেও উৎকৃষ্ট আঞ্চলিক সাহিত্য ভাষার এই সীমারেখা ভেদ করে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। ভবতোষ শতপথীর কবিতাও এই গুণে আঞ্চলিক ভাবনাবিশ্বকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন সমগ্রতায় সম্প্রসারিত।

আঞ্চলিকতার সঠিক বৈশিষ্ট্য অপরিচয়ের আড়ালে রহস্যমণ্ডিতই থাকে চিরকাল। তবে সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোনো অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাস সংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন অথবা কোনো বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন এখানে হতে পারে। আর যে সমস্ত প্রত্যন্তস্থিত, ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে কবলিত, যেখানে আদিম যুগোচিত বদ্ধমূল সংস্কার, সমষ্টিগত জীবনাদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করেছে, যেখানে ব্যক্তিপরিচয় অপেক্ষা কৌমশাসনই মানব প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী, কেবল সেইখানেই আঞ্চলিক সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হতে পারে।[৩] শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যুক্তিকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া যেতে পারে কবি ভবতোষ শতপথীর আঞ্চলিক কবিতাকে। 'A Glossary for the study of English' গ্রন্থে আঞ্চলিকতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

> Generally, 'local colour' is a mildly pejorative term describing works that, however pleasant, have little value other than the portrayal of life in a given area... 'regional' usually implies a wider interest, and is occasionally used even for writers such as Hardy or Faulkner whose work tends to be centred in a particular geographical area but which also has a more general interest.[8]

এই মন্তব্য অনুযায়ী মানুষ ও পরিবেশসহ মানুষের সামগ্রিকতা যেমন আঞ্চলিক উপন্যাসকে ধারণ করে থাকে, তেমনি আঞ্চলিক কবিতারও মূল ভিত্তিভূমি সেইখানেই। ভবতোষ শতপথীও কবিতায় এই দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেসব মানুষের কথা কেউ বলেনি, তাদের সঙ্গে কবি আপন হৃদয়ের গভীর যোগ অনুভব করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সমস্ত অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের প্রতিবেশী ভেবে তাদের জন্য লেখার তাগিদ

বোধ করেন।[৫] এইজন্যই প্রচলিত বাংলা ভাষা ছেড়ে আঞ্চলিক ভাষাকে কবিতার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে বসবাস করার কারণে আঞ্চলিক বাংলা ভাষাকেই তিনি তাঁর মাতৃভাষার মর্যাদাও দিতে চান। সুতরাং মাতৃস্তন্য দুগ্ধের মতো অনিবার্য এই ভাষাতেই যে তিনি কবিতা লিখবেন, সেটাই স্বাভাবিক এবং প্রাসঙ্গিকও।

স্কুল পড়ার সময়ই অগ্রজ বন্ধু অতুল মাহাত-র উদ্যোগে 'গ্রামের ডাক' পত্রিকায় ভবতারণ ওরফে ভবতোষ শতপথীর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে কবিতার প্রতি ভবতোষ শতপথীর প্রীতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ছেলেকে সংসারী করার উদ্দেশ্যে শ্রীপতিচরণ মাত্র ২১ বছর বয়সী ভবতোষের সাথে বিয়ে দেন চন্দ্রী গ্রামের বর্ধিষ্ণু চাষি সতীশচন্দ্র হোতার মেয়ে গায়ত্রী দেবীর। আঞ্চলিক মানুষের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণেই তিনি সংসারে তেমনভাবে মনোনিবেশ করতে পারেননি, গ্রহণ করতে পারেননি নির্দিষ্ট কোনো পেশাও। স্ত্রীর অসুস্থতার ফলে সম্পত্তি অনেকাংশে বিক্রি করতে হয়। এই সময়ই তিনি আরও যেন ভবঘুরে স্বভাবের হয়ে যান। স্ত্রী বিয়োগের পর সংসারে অনটন চরম পর্যায়ে পৌঁছালে ছেলে ও মেয়েদের মামারা নিয়ে চলে যান। এবার একক ভবতোষের সঙ্গী শুধু কবিতা, যা 'স্বাধীনতা', 'বসুন্ধরা', 'দৈনিক সমাচার', 'ঝাড়গ্রাম বার্তা'র সাথে ছোটোদের পত্রপত্রিকাতেও নিয়মিত ছাপা হতে থাকে। ক্রমে মার্কসীয় দর্শনের প্রতিও কবি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। বামপন্থী আন্দোলন রাজ্যে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভবতোষ শতপথী মূলত রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুসের মতো কবিতার মধ্যে শ্রেণিহীনদের মর্মযন্ত্রণা অনুভব করেন। তখনই ভবতারণের বদলে তিনি নিজের নামকরণ করেন ভবতোষ।

সাধারণ মানুষের ওপর জমিদারের অত্যাচারের স্বরূপ কবির অজানা ছিল না। তিনি নিজে বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারের ছেলে হয়ে এই অত্যাচারকে কখনও মেনে নিতে পারেননি, গ্রহণ করতেও পারেননি। তিনি দেখেছেন জমিদার নগদী পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছে গরিব চাষিকে—অপরাধ সে খাজনা দিতে পারেনি। সারাদিন রোদে বেঁধে রেখে তার সর্বাঙ্গে চাবুক মারা হয়েছে। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি। নিজের আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই আছে এই গোত্রের। কয়েক বছর জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও তা মূলত বাহ্যিক। বাবুদের জমিদারি মেজাজ একটুও বদলায়নি, বন্ধ হয়নি অত্যাচার। নিজে সর্বহারা হয়ে ভবতোষ এই সমস্ত মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। অভাব, দারিদ্র্যের নির্মম কামড়টা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।[৬] এই সমস্ত সর্বহারা মানুষের মুখ হয়ে এসেছে হাড়িরাম, শিরি চুনারাম মাঁহ্ত-এর মতো চরিত্রেরা, সমাজপ্রেক্ষিতে যাদের অবস্থা শোচনীয়, অত্যাচারে যাদের প্রতি রাতের ঘুম ছুটে যায়—

'মঁড়ল ঘরের উ জমিনটা—
হামার ঠাকুদ্দাদায় ভাগে চাষ কইর্‌থ।
বাপের ঠিনে শুন্যেয়েছি—
যে বছর জরিপ আল্যয়—
মঁড়লরা বেস্ত বিনতি কর্‌্যেয়ে বইল্‌ল—
দেখ্‌ অধ্‌রা, জরিপের আপিসার আমিন আল্যে—
বলবিস্‌ যে, মড়ল বাবুরাই চাষ খচ্চা দেই
হামি মুনিষের লেখেন্‌ খাঠ্যেয় চাষ-আবাদ কর্‌্যেঁ দি!

জমিনের চাষটা বাবুদেরই বঠে!
হামি দেখাশুনা করি, চাষ বেহেরার লেখেন।'

[শিরি চুনারাম মাঁহ্ত]

এই অসহায় মানুষদের বাস 'পাহাড় ধারের গাঁ'তে। লদী (নদী) পারের এই গাঁতে 'বিজলী বাতি নাই, এই গ্রাম 'কাঁটা-লাটা-বুদার' (কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়) ও 'বাদাড়' (বেড়া)-এ পূর্ণ। কবি 'হক্ কথা' কবিতায় দেখালেন খরার দেশ এই রাঢ় বাংলায় সামান্যতম জল না পাওয়ার কারণে দুর্দশা কীভাবে চরমে পৌঁছায়। দিন সেখানে যেন 'দরমরা' (আধমরা), মানুষের সেখানে জলকষ্টে জীবন সংশয়—

'দরমরা দিন, রকত ঝরা র‍্যাত
হাভাত ঘরের ভঁথায় গালে হাত
উপাস দিছে জয়্যান বহু বিটি
খরায় মরা মানুষ, মুঁলুক, মাটি।

পড়া আকাশ এক ফঁটাঅ নায়ঁ জল,
হালের গরু বিকব হাটে চল্
রুয়া-পুতা মিছাটায় হায়রাণ
শুখাঁয় যাছে জরু-গরু-ধান।'

এরই পিছু পিছু খরার ওপর আছে মহাজনের অত্যাচার—

'বাপে বইল্থে, দাদু ন কি আকাল বছর
মহাজনের ঠিন্ এক আঢ়া ধান দাদন লিঁয়েছিল
চাইর্ ডবল বাইড়্ কষ্যেঁ যেখন বেজাঁয় হয়েঁ গেল
তেখন দাদুয়ে নায়ঁ পাইর্ল দিতে।
কুথা পাবেক এত ধান, যে শদ কইর্বেক।'

[ডেড় বিঘা জমিন]

বাস্তব সত্য হচ্ছে এই মহাজন চড়া হারে সুদের অংক কষলেও গরিব মানুষগুলির অন্যত্র যাবার জায়গা নেই। নিজের ভিটেতেই কষ্ট স্বীকার করে বেঁচে থাকতে হবে, এখানেই খুঁজে নিতে হবে জীবনের প্রাত্যহিক চূড়ান্ত রসদ। এক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একমাত্র উৎসবই পারে মানুষের জীবনকে সচল রাখতে, তার মধ্যে জীবনরসের সন্ধান দিতে। এভাবেই সাঁওতাল-মাহাতপল্লিতে উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে ধামসার বোল, মাদলের দোল। আর নতুন ধান ওঠার পর বাঁদনা ও মকর-ই তাদের প্রধান উৎসব। এ সময়ই টুসু পূজা হয়। টুসুই তাদের কন্যাসমা, গৃহস্থ লক্ষ্মী। হুকুড় গড়ুম (ধামসার বোল) শোনার সাথে অবহেলিত মানুষগুলি যেন অন্তত কিছুটা ভুলে যায় 'গির্হা' (যে গৃহস্থ ভাতুয়া খাটায়)দের অত্যাচার। তারা বেতন না দিয়ে শুধুমাত্র ভাতের বিনিময়ে 'ভতুয়া' (যে মজুরের মজুরি-ভাত)দের খাটায়। এই মানুষদেরই উৎসবে পাগল করে দেয় 'আন্স্যাটা' (আনাড়ি, বেতালা) মাদল—

'হুকুড় গুড়ুম্ ধম্সা মাদ্যল বাঁদনা মকরে।
তলের মাটি উপর হছে টাইড়্যে-টিকরে!
আঁগুন লাগুগ মুখ্পড়াদের তেলুয়া গতরে
বিহন পুড়া সিরাঁয় গেল ভখা ভাদরে।

গির্‌হা গিলা ভাতুয়া খাটায়ঁ, ডুবায় বেতন ধান
ইধার উধার বেদম আঁধার গটা বছর টান
বহু-বিটি, ছানাপনার ঝরছ্যেএ চইখের জল
থাম্ মহনা, থামা ঝুম্যুর আন্‌স্যাটা মাদ্যল।'

[হুকুড় গড়ুম]

মাদলের তালে মনে হয় দুঃখ বোধহয় ঘুচেছে, কিন্তু পরিস্থিতি এত স্বাভাবিক নয়। নিদারুণ দুঃখের করাল গ্রাস বিস্তীর্ণ জীবন জুড়ে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। খরা এলেই শূন্যতা বাড়ে, আবার অসহায় মানুষগুলি খিদের তাড়নায় চুরি বৃত্তিতেও প্রবৃত্ত হতে পারে। সর্বহারার সম্পত্তিতে সর্বহারা প্রকোপ পড়লে অবস্থা আরও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে—

'মনে মনে ভাব্‌লি, ইবার দুঃখ ঘুচল্যঅ।
কি আর বইল্‌ব সাঁঙাত! দুঃখের কথা?
একদিন ভউরে বিল যায়েঁ দেখি,
রাইতে কন্ শালারা আদ-পাকা ধান
গিল্যা কাট্যে লেগেঁছ্যেএ।
এত কষ্টের রকত্—জল-করা ধানগিলা
লিয়েঁ পাল্যাল কে?'

[সরজমিন]

দুঃখ ভরা গোটা জীবনে 'উজড়্যা' (অনিশ্চিত) কর্মসংস্থান। এরই মধ্যে কবি অনুভব করেন ভবিষ্যতের শ্রেণিবিপ্লব। কবি ভবতোষ আশাবাদী। তিনি ভাবেন, চরম দুঃখের অবসানে আসা নতুন দিনে সবাই একদিন দেখতে পাবে 'পহিল খুখ্‌ড়া ডাইকছ্যে' (রাতের শেষে মোরগের ডাক নতুন সূর্যোদয় ঘোষণা করছে)—

"মায়াঁ-মরদ, মুনিষ-কামিন,
এক কাঠাও নায়ঁ নিজের জমিন
উজড়্যা কামের কি আছে ভায়, দাম!
যেদিন জুটে, সেদিন জুটে,
বেশিরভাগ দিন বেকার কাটে
ভখে লেঁউট্যে ভাঙা খাট্যেএ
শুনি 'লাল সেলাম'।"

[পহিল খুখ্‌ড়া ডাইকছ্যে]

ভুগ্‌ড়ার ঘর (ছিটেবেড়ার দেওয়ালে দেওয়া ঘর) উজড়াঁয় (উন্মুক্ত করে) থাকলেও উচ্চবিত্তের চোখরাঙানির সামনে অসহায় মানুষগুলিকে এই 'লাল সেলাম'-এর আস্থাপ্রত্যয় দিয়েই কবি মাথা উঁচু করে সসম্মানে বাঁচতে শেখান, আত্মমর্যাদায় দৃপ্ত হওয়ার মন্ত্র শোনান—

'গতর খাটায়ঁ খাচ্ছি-দাছি,
কিসের ডরাব?
লুদুর, পুদুর আল্‌ছানা,
ক্যাল্ হয়েঁছে।

চিচ্‌রা গাল্যেঁ গটা পাড়া
চমক করাঁয় ছে।'

[ছ্যইল গিঁদাখিন]

লজ্জা-ভয় থেকে দূরে থেকেও দারিদ্র্যকে জয় করা সম্ভব হয় না। চারিদিকে কবি যেন শুনতে পান অসহায়ের নিশ্চুপ রোদন—

'দ্যেশ কাঁদে দ্যেশবাসী কাঁদে
পরব-ভাঙা হাট
মড়ার উপ্‌রে খাঁড়ার ঘায়ে
কাঁইদ্‌ছে শ্মশান ঘাট।'

[কাঁদ্‌না]

নিঃস্ব-রিক্ত মানুষের অবস্থাকে কবি সাংকেতিত করেন পাহুড় (লড়াইয়ে পরাজিত মোরগ)-এর মাধ্যমে। পাহুড়ের মতোই দরিদ্র মানুষগুলি জীবনযুদ্ধে ক্রমাগত সামিল হয়। আর শেষ পর্যন্ত অসহায়ভাবেই মেনে নিতে বাধ্য হয় পরাজয়—

'গরীবের গতরের গরব
যেদিন জুটে সেদিন পরব
বড়লকদের পরব বার মাস!'

[পাহুড়]

তারপর দিন বদলের পালা। নজরুল ইসলাম বলেছিলেন—'এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?' এই প্রশ্ন কবি ভবতোষ শতপথীরও। তিনিও শ্রেণিহীনদের ফিরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেন, প্রতিবাদে গর্জে উঠতে বলেন—

'গর্জ্যেঁ উইঠ্‌ছে মুনিস-ভাথুয়া
কামিন পাজায় 'দা'
গর্জ্যেঁ উইঠ্‌ছে জ্যয়ান ছক্‌রা
রাগে গর্ গর্ রা।'

[গর্জ্যেঁ উইঠ্‌ছে]

যে দেশে 'এক দুটি ভাত', 'এক খাঁড়া রুটি', 'এক ডুভি টক্ আমানি' দেবার লোক থাকে না, সেখানে কবি দেখতে পান তিরের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে (পার্টন পাজাছে), শুনতে পান পরাণ মাহাত গলা ছেড়ে ঝুমুর গান গাইছে, যেখানে সংগ্রামী জীবনের কথা আছে, আর এই সমস্ত মিলিয়েই দুঃখ পূর্ণ আঁধার রাতের শেষে 'পুবে বেলা উঠা দেখাছে' (পূর্বাকাশের সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে)। এই দিন দেখার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক সাধারণ মানুষকে। 'জীব্‌নার মা' কবিতায় দেখা যায় জমির লড়াইয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে জীব্‌নার মতো খেটে খাওয়া মানুষকে যে চেয়েছিল তার দশ কাঠা জমিটা যেন বেহাত না হয়ে যায়। ছোটো ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসারে সে একাই উপার্জনকারী। তার অকাল মৃত্যু তাই বিরাট শূন্যতা। শোকের পরিস্থিতিতে মায়ের চোখের জল টানায়ঁ (শুকিয়ে) যাওয়াই স্বাভাবিক। অস্থির রোদনে নতুন দিন এলেও প্রিয় মানুষ তো আর ফিরে আসবে না।

তবুও নিত্য সঙ্গী দারিদ্র্যের কোনো অংশে হয়তো বেঁচে থাকে রোমান্স, সংসার জীবনের নির্মল সৌন্দর্য। তাই বিবাহিত জীবনে বেহুলার আদর্শেই একটি মেয়ে 'ভদরভং ঘর'-এ (হাওয়া এবং বৃষ্টি প্রবেশ করে এমন ছিদ্রযুক্ত ঘর) 'গতর খাটায়ঁ' সংসার সাজাতে পারে। 'শিরি চুনারাম

মাঁহ্‌ত' অংশের আলোচ্য কবিতাগুলিতে তাই প্রবল জীবনমন্থনে উঠে এল প্রান্তিক মানুষের প্রত্যয়ী জীবনবেদ। এরপরের অংশে 'ঢেম্‌না মঙ্গল' একটিই দীর্ঘকবিতা। এখানে গ্রামবাংলার বিচিত্র পশু-পাখি উঠে এসেছে। ধরা পড়েছে সামগ্রিক জীবনসম্পৃক্ত প্রতিবেশ।

এর পরবর্তী অংশ 'জুম্‌ঢ়া'। এরই অন্তর্ভুক্ত 'বাঁদনা' কবিতায় এসেছে উৎসবের অনুষঙ্গ, এসেছে 'ভায়ফঁটা' উৎসব। উৎসবের পরিবেশেও কবি স্বস্তি পান না। চরম দুঃখ-দুর্দশার মুহূর্তকে কবি ভুলতে পারেন না। সেই পরিস্থিতিতেই লেখেন 'ভগবানের মার' নামক অসামান্য কবিতাটি—

'স্বাধীনতা ত দর্‌বূঢ়া হয়েঁ গেল
তা অ হামদের লেখেন লক গিলার
কি উপকার কইরল বল?

....

শালা, গরীব লকের সুখ কুথাঅ নাঁয়
সিনালে নায়ঁ, নায়ঁ সিনালে নাঁয়, খালে নাঁয়, নায়ঁ-খালে ত নায়েঁই
তুঁষের আগুন ধিকিধিক জ্ব'লছে ত জ্ব'লছেই ছাতির ভিতরে।
লকে বলে ভগবানের মাইর,
দু-দিগের লে মাইরছে মাইরি!
কলমে আর বকলমে।।

[ভগবানের মার]

দারিদ্র্যের কারণ সন্ধান করেছেন কবি 'মুখজবান' কবিতাটিতে। চাষ-চাকরি-ব্যাবসাপাতি সর্বত্র মন্দা দেখা দেবার কারণে মানুষের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন। স্বাধীনতা এলে বড়োলোকি চালের মানুষরা ব্রিটিশদের মতো আচরণ করে। আসলে দারিদ্র্যতার মূল কারণ—"ভুখেল ভুখেল সল-বাল্যা মাছ/যেমন ছুটু ছুটু পুঁঠি ড্যাঁড়ক্যা গিলাকে/গিল্যেঁ খায়/বড় লকরা যেম্যন গরীব গিলাকে/জাঁকেঁ রাখে উইঠতে নাঁয় দেই/একেই হাল্যত চইলছে আজতড়িক।" তবে এভাবেই দিন এগোবে না। কারণ—

'যেদিন বড়লকী চাল্লাকি ধরা পইড়বেক
সেদিন দেখবিস ফুটানি ইহায় ঢুক্যেঁ যাবেক।'

কর্মসংস্থানহীন বেকার মানুষেরাই তো একদিন এগিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার যুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও বদল হয়নি পারিপার্শ্বিক অবস্থার। ব্রিটিশের বদলে এখন শাসন করছে দেশেরই উপর তলার নেতা-আমলামন্ত্রী। সচেতন কবিমন এই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছে—

'গটা কতেক লক উপ্যরতালায় বস্যেঁ
নামর গিলাকে ভেউল্‌কাছে
দেশের এত এত মানুষ গড়মন দিয়া
মাছের লেখেন পাক পাক কইরছে
উফ্যাল্‌ মার্যেঁ ঝাঁপাছে নায়।'

[স্বাধীনতা : দু-কুড়ি তের বছর]

স্বাধীনতার প্রসঙ্গে জড়িয়ে যায় অনেক আশা, অনেক ভালোবাসা, ঠিক ঝুমুরের গান আর মাদলের তানের মতো। রিক্ত জীবন তাই অনেক আকাঙ্ক্ষায় হাত বাড়ায় প্রিয় মানুষের দিকে যে মিশে যেতে পারে সর্বহারার দলে—

'ঝড় বহিইছে বনে নাকি
ঝড় বহিইছে মনে?
সে নায়ঁ আলে, হামার দশা
কি হবেক কে জানে।'

[সে নাঞ আলে]

প্রিয়জনের স্পর্শ যেন লেগে থাকে প্রকৃতির আনাচে-কানাচে, সেখানে এসে দাঁড়ায় 'শাঁখা- ভাঁঘা' হাতে 'কঁকা ছাল্যার মা', 'ডুলুং লদীর জল', 'বুঢ়া বড়্ গাছটা', 'ল্যাড়্ কাটা মাটি', 'আঁত্যড় জনম থান', 'পাড়ার বহু বিটি', 'ঝুমুর গান', 'শাম্‌লি গায়', 'শুশনি শাগে' ভরা 'শুখ্‌না খাল', 'দু-এক কাঠা বাপের ভিটা', 'মকর পরব ডুমু পিঠা', 'বাঁনা খুঁটা'। সকলের ডাক সমন্বিত সামগ্রিক কলতান কবিকে মুগ্ধ করে, ফিরে তাকাতে বাধ্য করে জন্মভূমির দিকে। তখন এক অনিবার্য আবেশে কবি বুঝতে পারেন না 'বনে ডাইক্‌ছে ন মনে ডাইক্‌ছে/নিশা রাইতের কুহু।।' (পল্যাশ-ডাঁগা)।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য মনে করেন, 'বর্তমান বাজারি কবিতার পণ্য সমুদ্রে ভবতোষ শতপথীর কবিতা প্রদীপ্ত আলোকস্তম্ভ। ...স্বচ্ছ জলস্রোতের মত তাঁর কবিতা। কোথাও কোথাও ঘূর্ণি বা বাঁক আছে। কিন্তু সুগভীর প্রবাহে তাঁর কবিতা আমাদের দ্বন্দ্বময় সম্পদ হয়ে উঠেছে'।[৭] বর্ণময় কবিকৃতির জন্য ১৯৮৮ সালের ২৯শে মে কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশনের উদ্যোগে মণিভূষণ ভট্টাচার্য এবং মহাশ্বেতা দেবী কবিকে সম্বর্ধিত করেন। ১৯৯৫ সালের মে মাসে ভবতোষ শতপথীর আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত 'চণ্ডালিকা' নাটকটি 'রবীন্দ্রসদন' প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চায়িত হলে, তা কবির জনপ্রিয়তা বহুগুণিত করে। তবে কবির দারিদ্র্যপূর্ণ দিনের ক্রমিক অবসান হয় যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর লিটারেরি পেনশন কমিটির সুপারিশক্রমে কবিকে পেনশনের ব্যবস্থা করে দেয়। একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না নিয়ে লেখা তাঁর ঝুমুর ও টুসু গানগুলিও আঞ্চলিক মানুষের জীবনের প্রেক্ষিতে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নিজেকে 'Son of this soil' রূপে চিহ্নিত করে ভবতোষ শতপথী প্রচলিত বাংলা বা কুর্মালি ভাষা থেকে বেরিয়ে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে সহানুভূতির সাথে কবিতায় অঙ্কন করেছেন এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবনছবিকে। এখানেই আঞ্চলিক জীবনের রূপকার হিসাবে কবি ভবতোষ শতপথীর অনন্যতা। নাগরিক বাণিজ্য ও ব্যস্ততার থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতা যেন শ্যামলিমা ও মাটির সোঁদা গন্ধ লেগে থাকা ভূমিপুত্রদের স্পর্শ দিয়ে যায় বারবার। তবে মনে রাখতে হবে, যে কোনো আঞ্চলিক সাহিত্য তখনই সাহিত্য পদবাচ্য হয়, যখন তা অঞ্চলের নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। ভবতোষ শতপথীর কবিতাও মূলত জঙ্গলমহল অঞ্চলের দুঃখ-দারিদ্র্য-বঞ্চনাপূর্ণ জনজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা হলেও সেখানে যেন সারা পৃথিবীর সর্বহারা মানুষের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। এজন্যই ভবতোষ শতপথীর কবিতা আঞ্চলিক হয়েও আঞ্চলিক বাস্তবতার সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে ক্রমশ হয়ে উঠেছে পণ্যবিশ্বের বিপরীত ভাবনা তরঙ্গ এবং শ্রেণিকেন্দ্রিক জীবন-বাস্তবতার কাছে তুলে ধরা এক অনিঃশেষ প্রশ্নমালা।

তথ্যসূত্র

১. উত্তম দাশ (সম্পা.), 'সম্পাদকীয় অংশ', "আঞ্চলিক ভাষার কবিতা", মহাদিগন্ত, তৃতীয় সংস্করণ —জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১০

২. পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ— এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১৫৭

৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সৃজ্যমান উপন্যাস সাহিত্য', "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রণ—২০১১-২০১২, পৃ. ৪১১-৪১২

৪. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, অষ্টম মুদ্রণ—মে ২০১১ পৃ. ২১৮-২১৯

৫. কবির সাক্ষাৎকার, ৭ই এপ্রিল, ২০১৩, বিকেল ৬টা

৬. সোমনাথ নন্দী ও মুরারি সিংহ (সম্পা.) লোক কবি ভবতোষ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ —জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২১

৭. মণিভূষণ ভট্টাচার্য, 'মুখবন্ধ', ভবতোষ শতপথী, "অরণ্যের কাব্য", র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ—জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৯

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. উত্তম দাশ (সম্পা.), আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, মহাদিগন্ত, তৃতীয় সংস্করণ— জানুয়ারি ২০০৬

২. কমলেশ সেন (সম্পা.), পোড়ামাটির এসরাজ, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ২০০০

৩. পীতম ভট্টাচার্য, আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, নির্মল বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা ২০১২

৪. পীতম ভট্টাচার্য ও শুক্লা বসু (সম্পা.), আবৃত্তিযোগ্য আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, প্রিয়ম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ—২৫ বৈশাখ ১৪১১

৫. ভবতোষ শতপথী, অরণ্যের কাব্য, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ—জানুয়ারি ১৯৯৬

৬. মধুমঙ্গল বিশ্বাস (সম্পা.), আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, দৌড় প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ২০০২

৭. স্বপন দাস ও চঞ্চল রায় (সম্পা.), আঞ্চলিক ভাষার আবৃত্তির কবিতা, প্রয়াগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ২০০৯

সহায়ক গ্রন্থ

১. অরুণ সেন, কবিতার দায় ও কবিতার মুক্তি, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ—মে ১৯৮৫

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৪. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, অষ্টম মুদ্রণ—মে ২০১১
৫. তরুণ সান্যাল, আধুনিক কবিতা বিচ্ছিন্নতা বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে, প্রতিভাস, পুনর্মুদ্রণ—জানুয়ারি ২০০৮
৬. তাপস ভৌমিক (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষা, কোরক, দ্বিতীয় প্রকাশ—জানুয়ারি ২০১৩
৭. পবিত্র সরকার, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ— আষাঢ় ১৪১২
৮. পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ—এপ্রিল ২০১১
৯. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, বাণীশিল্প, পুনর্মুদ্রণ—জানুয়ারি ২০০০
১০. ড. রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৪০৩
১১. লক্ষ্মণ কর্মকার (সম্পা.), মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, সৃজন প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩
১২. শান্তি সিংহ, সাহিত্য সংস্কৃতি ভাবনায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, ছায়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ—বইমেলা, ২০১১
১৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ—২০১১-২০১২
১৪. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব, প্যাপিরাস, পরিমার্জিত সংস্করণ—ডিসেম্বর, ২০০৭
১৫. সুধীরকুমার করণ (সম্পা.), সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর, ২০০২
১৬. সুধীরকুমার করণ (সম্পা.), সীমান্ত বাংলার লোকযান, আশাদীপ, প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি, ২০১৩
১৭. সোমনাথ নন্দী ও মুরারি সিংহ (সম্পা.), লোককবি ভবতোষ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি, ১৯৯৬

পত্রপত্রিকা

১. অজিত ত্রিবেদি (সম্পা.), চান্দ্রভাষ, সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১৩
২. আনন্দরূপ নায়েক (সম্পা.), নকশিকথা, তৃতীয় সংখ্যা, বসন্তোৎসব, উনিশ সাল, মার্চ ২০১৩
৩. ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পা.) বলাকা, ২২তম বর্ষ, ৩১তম সংখ্যা, মার্চ ২০১৩
৪. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (সম্পা.) বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ২য় বর্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৭০
৫. মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), কেতকী, ৪৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা-১৪২০
৬. সুবোধ বসুরায় (সম্পা.), ছত্রাক, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, নববর্ষ সংখ্যা-১৩৮৫
৭. সমীরণ মজুমদার ও বিপ্লব ব্রহ্ম (সম্পা.), অমৃতলোক, ৯ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৫
৮. সুভাষ রায় (সম্পা.), অনুজু, ২৪তম বর্ষ, শারদ ১৪১৬, অক্টোবর ২০০৯

চারের দশক : নীরেন্দ্রনাথের কবিতার গতি-প্রকৃতি

প্রদীপ ঘোষ

চারের দশক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। চল্লিশের কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক ও শিল্পীরা আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় নব নব চিন্তায় আলোড়িত হয়েছেন। জীবনের সত্যকে কালের পটভূমিকায় বিধৃত করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন। গান্ধিজির স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন কবিরা দেখেছেন, কেউ কেউ আন্দোলনে যোগদান করেছেন, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কবি মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, প্রমুখ কবিদের মতোই নীরেন্দ্রনাথ সমাজ সচেতন কবি, মানবতাবাদী।

চারের দশকের খ্যাতনামা কবি অরুণকুমার সরকার বলেছেন—"ইতিহাসের এক ঘোরতর সংকটকালে আমাদের যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত করেছি। পৃথিবী জোড়া যুদ্ধ, শহর ভরতি বুভুক্ষু মানুষের মৃতদেহ, ঘৃণ্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আত্মঘাতী রক্তপাত, ছিন্নমূল উদ্ভ্রান্ত মানুষ, উচ্ছৃঙ্খল সমাজবন্ধন এক কথায় মানবিক মূল্যবোধ এবং মানব সম্পর্কের এক শোচনীয় অমাবস্যায় বোবা দুঃস্বপ্নের জগৎ ছিল আমাদের। নামহীন যন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্তের দ্বিধাদন্দ্ব এবং পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে বহন করেও আমরা বুকের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলুম, ভালবেসেছিলুম মানবিক মূল্যের সারাৎসার কবিতাকে।" ('দূরের আকাশ'/প্যাপিরাস/পৃষ্ঠা-৬/প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮১)।

এই সময়ে 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে আধুনিক কবিদের ভাবনা চিন্তা নতুন উদ্যমে দেখা দিল। তাঁরা তাঁদের লেখার ধরন-ধারণ ও বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন রবীন্দ্রযুগ অস্তমিত। এঁরা কাব্যে আনলেন নগ্ন দেহ কামনা, ক্ষুধার বিকৃতি। এ সময়ের কবিদের ভাষায় এল রূঢ়তা, ইতর শব্দ, উপমার জন্য বেছে নিলেন দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুজগৎকে। প্রকৃতি বা প্রেমের মাধুর্য বা সৌন্দর্য নয়, লরেন্সীয় দেহভোগ আর বোদলেয়রীয় অসুন্দরের বন্দনা হল তাঁদের কাব্যের বিষয়। প্রচলিত ছন্দের রীতি অস্বীকার করে টানা গদ্যের কেউ কেউ কবিতা লিখলেন। বিংশ শতাব্দীর তিন ও চারের দশকের মেজাজ ও কাব্য প্রকরণে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠল। একদিকে সুরমূর্ছনা ও অন্যদিকে বক্তব্যে সমাজ বাস্তবতা কাব্যগুলোকে ঋদ্ধ করেছে। অরুণকুমার সরকার ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো কবিদের রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা পাঠককে চমকিত ও আবিষ্ট করেছিল। জনতা নয়, ব্যক্তিগত জীবন অনুভবই হয়ে উঠল এই সময়ের কবিদের অন্বিষ্ট।

চারের দশক বাংলার ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রমান্বয় পট পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবল ভাঙাগড়া, সুস্থিত ও শুভ জীবনবোধের প্রত্যয় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ায় মূল্যবোধের চরম পরিবর্তন একেবারে তোলপাড় করে দিয়েছে এই অস্থির টালমাটাল দশককে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন ও প্রতিরোধ আন্দোলন, বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তর, মহামারী, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের মাটিতে পদার্পণ ভারতের ওপর জাপানি আক্রমণ, ছেচল্লিশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নৌবিদ্রোহ, নানাবিধ ধর্মঘট, দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ভারতের স্বাধীনতা লাভ, উদ্বাস্তু

ছিন্নমূল মানুষের অসহায় বিপন্নতা, কাশ্মীর নিয়ে ভারতের ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ এতগুলি অভাবনীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ ঘটে গেছে মাত্র একটি দশকের মধ্যেই। স্বভাবতই এই দশকের উত্তাল পৃষ্ঠপটে দাঁড়িয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক সৃজন ভাবনাও প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই অভিঘাতকে, জাতিসত্তার এই ভয়ংকর সংকটের ছবিকে কখনই উপেক্ষা করতে পারেনি বাংলা কবিতার মতো সংবেদী জগতও। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন—

"দূর থেকে চাঁদকে যারা ভালবেসেছিলেন,
সেই প্রাচীন কবি ও প্রেমিকদের আমরা
শেষ বংশধর।"

(সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত : কলকাতার যীশু)

সময়ের ক্যানভাসে সময়হীনতার তুলি দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ কবিতা আঁকতেন। তিনি তাঁর কবিতার ভাবমূর্তিটির ওপর একের পর এক সার্থক তুলির টান দিয়ে যেতে পারতেন। বক্তব্যের প্রয়োজনে শব্দ এবং সেই শব্দকে সার্থক শর সন্ধানের উদ্দেশ্যে নিয়োজন, তাঁর এক অনবদ্য শিল্পকৌশল। কখনও প্রচলিত ছন্দ প্রকরণে, কখনও বা উচ্চারণের অনিবার্য প্রয়োজনে ছন্দকে নতুন শাসনে বাঁধতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। শব্দ ও ছন্দের অনায়াস ও সাবলীল মেলবন্ধনে তাঁর কবিতা 'ইউনিভার্সালি কম্যুউনিকেটিভ' এবং 'কবিতাই তাঁর মাতৃভাষা' (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯৯২, 'কবিতার দিকে'/কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা/পুনশ্চ, প্রথম সং., পৃষ্ঠা-১৫)। সেই কবিতাকে খুঁজতে তাঁকে দেশ দেশান্তরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না। কারণ—

"তাহাই কবিতা। আমি চতুর্দিকে চোখ রেখে রেখে
পৃথিবীর পায়ের ডগার থেকে মস্তক অবধি
যা-কিছু দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি নিঃশ্বাসে
যা-কিছু গ্রহণ করেছি বুকের ভিতরে
যা-কিছু হাত রাখছি, কিম্বা বাঁ পায়ের
লাথি মেরে হটাচ্ছি যা - কিছু,
তাহাই কবিতা।"

(তাহাই কবিতা : নক্ষত্র জয়ের জন্য)

নীরেন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাই—"নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত রোমান্টিক কবি, কিন্তু নিত্য বিবর্তনশীল তাঁর কবিতা আস্তে আস্তে বিস্তৃততর জীবনের পরিমণ্ডল কে স্পর্শ করেছে। চারের দশকের লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কবি যাঁর কবিতা কখনও এক জায়গায় থেমে থাকেনি ধাপে ধাপে সিঁড়িতে উঠে গেছে। তিনি যা বলতে চান তা খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে পারেন এবং তাঁর কবিস্বরে কোথাও দ্বিধা বা জড়িমার অবকাশ নেই। সাংবাদিকতাকে তিনি অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে সুদে খাটাতে পারেন তাঁর কবিতায় এবং ছন্দেই লিখুন বা গদ্যেই লিখুন, তাঁর কবিতার ফর্ম কখনও নড়বড়ে বা শিথিল বলে মনে হয় না।" (প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, ১৯৮৩, 'চল্লিশের কবিতা'/'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'—সম্পাদনা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়/ভারত বুক এজেন্সী, নতুন সং. পৃষ্ঠা-১২৮)।

শুধু শব্দ নয়, নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বিষয় ভাবনায়, উপকরণ ও আঙ্গিকের অন্বেষণে

গা ভাসিয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু এই মানবদরদী প্রেমিক কবি প্রেমের অন্বেষণে মানবসংসারে প্রবেশ করে এক বেদনার্ত উপলব্ধির সম্মুখীন হন। প্রকৃতি তার স্বধর্মানুযায়ী খাদ্য, জল, আলো দিয়ে বিশ্বসংসারকে পরিপূর্ণ করে তোলে কিন্তু মানুষ অমূল্য সম্পদ প্রেমের অধিকারী হয়েও প্রেম বিলোতে কার্পণ্য করে। এই কৃপণতা ও কর্তব্যচ্যুতির সামনে দাঁড়িয়ে ধিক্কার জানান কবি—

"মানুষ তোমার প্রেম ছিল।
তবুও মানুষ, তুমি কিছুই দিলে না
নিখিল সংসারে।" (মানব সংসার : অন্ধকার বারান্দা)

কবি বিশ্বাস করেন ভালোবাসা থাকলে সব কিছু হয়। ভালোবাসার তাগিদেই কবি অনুভব করেন আরও একটু মানুষ, শ্রমের চিত্র আর নোংরা নয়নজুলির মধ্যে বিম্বিত সংসার দেখার, ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন খোলা মুঠির ভিতরে কোনও অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা জানার। শিক্ষার যেহেতু কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, তাই আকাশ, বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, শিশু ও নারীর কাছে নতজানু হওয়ার পরেও তাঁর শিক্ষা অপূর্ণ বলে মনে হয়। "অভিজ্ঞতা জিনিসটা চলমান বলেই তাতে আস্থাবান হওয়াটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যাপার, অন্তত কবিদের কাছে, এবং সে সুযোগের যোগ্য ব্যবহার নীরেন্দ্রনাথ না করে ছাড়েননি।" (সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, 'হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা', অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ, (এক সময় দুই কবি), সোম প্রিন্টার্স, দ্বিতীয় সং, পৃ. ১৪)।

নীরেন্দ্রনাথ জীবনের পরিক্রমায় পিছনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অতীতে সঞ্চিত কিছু স্মৃতি হাতড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন। গল্পচ্ছলে শৈশব কাহিনি ব্যক্ত করার সময় কবি অনুভব করেন তাঁর চারিদিকে ছড়িয়ে আছে গোলাক-ধাঁধা, সেই ব্যূহের ভিতরে থেকে পরিত্রাণের আশায় তাই তিনি চিহ্নিত খড়ির দাগের অন্বেষণ করেন। কবির 'আয় রঙ্গ' কাব্যগ্রন্থের অনেক কাহিনিই বিদেশে থাকাকালীন রচিত। এখানে নিরন্তর অন্বেষণের পালা অটুট। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'গির্জা ও বালিকা', 'মানচিত্র', 'কলকাতা ৩০০', 'হরিশ্চন্দ্র' ইত্যাদি অসাধারণ কবিতা অনায়াসেই সৃষ্টি করেছেন।

"কাঁধের গামছা দিয়ে মুখখানাকে মুছে নিয়ে
লাঠিতে ভর দিয়ে
লোকটা আবার উঠে দাঁড়াল।
এখনও তার অনেকটা পথ বাকি।"
(অনেকটা পথ বাকি : আয় রঙ্গ)

নীরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক বিষয় ভাবনার সঙ্গে যুগোপযোগী আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ক্রমান্বয়ে গতিশীল করে তুলেছিলেন। 'নীলনির্জন'-এর রোমান্টিক বক্তব্যকে নিটোল সনেটে অথবা প্রচলিত ছন্দরীতিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। শব্দচয়নে কিছুটা তন্ময়তা আছে এবং অনেক কবিতা যেন জীবনানন্দের মানসিকতার আমেজ বয়ে আনে। 'অন্ধকার বারান্দা' থেকে তিনি উত্তরণের ক্ষেত্রে নতুন নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। দ্বিধাহীন ভাষা এবং সতেজ দীপ্ত ভঙ্গিতে তাঁর কবিতা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কাব্যনাট্য 'প্রথম নাটক' নীরেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন প্রাকরণিক কৌতূহলের তাড়নায়। আটপৌরে গদ্যের অঙ্গন থেকে টেনে আনা, শব্দ শৃঙ্খলগুলিকে কবিতার ছন্দ শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত করলেন। কলকাতার ছন্দ শৃঙ্খলা অন্তর্ভুক্ত করলেন। 'কলকাতার

যীশু'তে কবি এক চমক সৃষ্টি করলেন। দুর্বোধ্যতার শৃঙ্খল থেকে কবিতাকে মুক্ত করে কাব্যের শরীরে সরল, সহজ সত্যের দীপ্তি নিয়ে এলেন।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতার আলো-অন্ধকারেরই সমান্তরালে এসেছে রৌদ্র-ছায়া প্রতীকী ভাবনা। রৌদ্র-উজ্জ্বল, ছায়া-বিষণ্ণ, তাই রোদ আলোর সমার্থক এবং ছায়া অন্ধকারের। কবির শৈশবসঙ্গী অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল—"ক্ষান্তবর্ষণ কাক ডাকা বিকেলের সেইলাজুক রোদ্দুর/জাম আর জামরুলের পাতায়/যা নাকি অল্প একটু হাসির মতন লেগে থাকে।" রোদ্দুর বিলোতে কার্পণ্য করেননি নীরেন্দ্রনাথ।

রোদ্দুরকে ব্যাপকভাবে চিত্রকল্পে প্রয়োগ করেছেন। কখনও প্রত্যাশার, কখনও ঈশ্বরের হাসির, কখনও নির্ভরতার। কখনও বা আশ্বাসের প্রতীকী রূপে, ছায়া ও অন্ধকারকে ক্রমশ নির্বাসিত করে আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা উন্মীলিত হয়ে উঠেছে আশাবাদী কবির উচ্চারণে, তাই কবিতায় রোদ্দুরের এত প্রাধান্য। নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় নৈরাশ্যের যুগোচিত স্বাক্ষর স্পষ্ট। অন্ধকার বারান্দা থেকে কবিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখি—"চেনা আলোর বিন্দুগুলি/হারিয়ে গেল হটাৎ/এখন আমি অন্ধকারে একা।" কবির স্বপ্ন ছিল এক সুস্থ পৃথিবীর গড়ে তোলার কিন্তু রোগ যন্ত্রণার জ্বালায় বিপর্যস্ত ও বিক্ষত পৃথিবীকে দেখে কবির আক্ষেপ—"পৃথিবী, তোমার জন্যে বড় বেশি ভালবাসাছিল। তোমাকে সুস্থতা দেব, আশাছিল/কিন্তু আমি কোনো রোগ যন্ত্রণার জ্বালা/নেবাতে পারিনা।" (শুধু সান্ত্বনার কথা : নক্ষত্র জয়ের জন্য)

রুগ্ন সমাজের ব্যাখ্যাতা, দুঃসহ দিবসের ভাষ্যকার কবি নীরেন্দ্রনাথ সামাজিক বাতাবরণে নিশ্বাস নিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর কবিতার উচ্চারিত ভুবন। কবিতা তাঁর কাছে শুধু ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনার রোজনামচায়, শুধু শোকের সান্ত্বনা কিংবা আনন্দের সমর্থন নয়। কবিতার মাধ্যমে সমকালীন সমাজের একটা অন্যমাত্রিক ব্যাখ্যাও তিনি শুনিয়ে যেতে চান। আবার মধ্যবিত্ত সমাজে নীরেন্দ্রনাথের সঞ্চরণ স্বতঃস্ফূর্ত কারণ এর সঙ্গেই তাঁর নির্ভেজাল আত্মিক সম্বন্ধ। যে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে তিনি উঠে এসেছেন তার শিকড়, মাটি, গন্ধ, দাগ সবই যেন জড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। ফলে তাঁর কাব্যদর্শনে মধ্যবিত্ত প্রেক্ষিত অনিবার্যভাবে প্রাণময়তা লাভ করেছে।

"রুগণ স্ত্রীকে মেজার গ্লাসে মাপা ওষুধ খাইয়ে,
কুঁচকে যাওয়া বালিশ টাকে গুছিয়ে রেখে,
ঘুমন্ত ছেলের ইজেরের দড়িটাকে আর একটু আলগা করে দিয়ে,
সে তাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।"

(অল্প একটু আকাশ : অন্ধকার বারান্দা)

যান্ত্রিক জীবনের ট্রাজেডিকে, মধ্যবিত্ত জীবনের চূড়ান্ত প্যাথোসের অস্তিত্বকে কবি গাঢ়তর উষ্ণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন নাগরিক জীবনের কবিতায়। এই সকরুণ জীবনের আড়ালে এমন এক একটি চরিত্র হঠাৎ উঁকি মারে যা মুহূর্তে কবিকে ভাবনায় আক্রান্ত করে তোলে। শত দরিদ্র, অনটনের মধ্যেও যে লোকটি বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরে, সে কি নিতান্তই এক সাধারণ মধ্যবিত্ত? কবির সন্দেহ জাগে, মনে হয়—

"... সে সম্রাট। হৃতরাজ্য, তার রাজ্য সে আবার
ফিরে পাবে, পায়নি, তাই চলেছে প্রবাসে
অজ্ঞাতবাসের পালা তার।" (অজ্ঞাতবাস : কবিতা সমগ্র-২)

এমনই আরেকটি চরিত্র রোহিনীকুমার, যিনি প্রাইভেট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে উত্তর শহরতলির এক কলোনিতে ছোটো একটা বাড়ি তৈরি করেছেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় খরচা হয়েছে প্রাইভেট কোম্পানির লেজার বইয়ের মধ্যে, তিনি উর্ধ্বমুখী আকাশ দেখার অবকাশ বড়ো একটা পাননি। রিটায়ার করার পর তিনি মুক্ত পুরুষ। উর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশ দেখতে পান এবং অনেক কাল পর্যন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে খুঁজে বেড়ান অনেককাল আগে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়া মাকে। শুধু নগরজীবন নয়, গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজও তাঁর কবিতার উপজীব্য। সেখানে সকরুণ প্যাথোস-এর ছোঁয়া নেই, যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি নেই, গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে এক সুখী স্বচ্ছলতা সেখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে—

> "পুকুর, মরাই সবজি বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি,
> তার মানেই তো বাড়ি।
> তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ,
> নিকিয়ে নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান টান।"
>
> (স্বপ্নে দেখা ঘরদুয়ার : উলঙ্গ রাজা)

স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের মন থেকে বিলিতি গন্ধের মোহ এখনও ঘোচেনি। 'দিশি ও বিলিতি' কবিতায় কবি স্যাটায়ারের তীক্ষ্ণ বর্শা চালিয়েছেন সেই সব শ্রেণির প্রতি যারা শখ করে, ফ্যাশনের খাতিরে বিলিতি কুকুর পোষে অথচ তাদের নিজেদের ব্যবহারে দেশি কুকুরের ল্যাজ গোটানো স্বভাব প্রতিফলিত হয়।

অসুস্থ সমাজের সঠিক চিকিৎসার কোনোও নির্দিষ্ট ঠিকানা খুঁজে পান না নীরেন্দ্রনাথ। তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে তাঁর মন "দিনে দিনে আরো সজ্ঞান সচেতনতায় সমাজমনস্ক হতে দেখেছি তাঁর ব্যক্তিত্বকে। এবং তাঁর সাম্প্রতিক অনেক কবিতার গভীরে শিকড়ে আজ কবির এই সমর্থ ভূমিকাটাই তাঁকে আরো চরিত্রবাণ করে তুলেছে।" (সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়,. ১৯৮৫, 'নীরেন্দ্রনাথের কবিতা : আজও কতটা সমাজমনস্ক' (প্রসঙ্গত কবিতা) মাঝি প্রকাশনী, প্রথম সং., পৃ. ১৫২)।

রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে যদিও কবিকে নিশ্বাস নিতে হয় তবুও কোনোও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের আবর্তে গণ্ডিবদ্ধ থাকায় আস্থাশীল নন নীরেন্দ্রনাথ। তিনি কোনোও বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি—"আমার ভিতরে কোনোও দল নেই"—তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়—

> "দলবদ্ধতার ঘটাপটা
> দুই পায়ে মাড়িয়ে তাকে একবার নিজের মধ্যে উঁকি
> দিয়ে কথা বলতে হয় নিজস্ব ভাষায়
> একবার দাঁড়াতে হয় নিজস্ব ইচ্ছার মুখোমুখি।"

কোনোও নির্দিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত না হলেও রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কিন্তু অনিবার্যভাবেই তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। নীরেন্দ্রনাথের 'চল্লিশের দিনগুলি' কবিতাটিতে সেই ভয়াবহ দশকের যুদ্ধ, স্বদেশি আন্দোলন, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মূল্যবোধের অবলুপ্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার প্রতিচ্ছায়া মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, তাই পর্যায়ক্রমিক বিশেষ কিছু পংক্তির উপস্থাপনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সেই সময়কার কলকাতা ও গ্রামবাংলার চরম দুর্দশা ও বিপর্যয়ের চেহারাটা—

"আমরা কেউই পান পাতিনি তার
শান বাঁধানো বুকের উপরে,
আর তাই আমরা
কেউই তখন শুন্তে পাইনি
সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরির
হঠাৎ প্রদেশের সেই
গুরগুর শব্দ,
যা জানিয়ে দেয় যে, তার
অগ্নিবমনের সময় এবারে
এসে গেছে।"
(আমার ভিতরে কোন দল নেই : চল্লিশের দিনগুলি)

নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় 'শিশু ও শৈশব' বহুবার অনুরণিত হয়েছে। কখনও বা প্রতীকীরূপে, কখনও বা অতীতচারিতায়। শৈশব অধ্যায় কবিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। 'নীলনির্জন' পর্বেই শিশুর উল্লেখ পাই। তবে এক রহস্যঘন আবেদন নিয়ে সেখানে উপস্থিত শিশুরা কোমল প্রসারিত মুঠি আর অকারণ হাসি দিয়ে কিছু পেতে চায়, সেই অব্যক্ত বাণীর আড়ালে শুধুই রহস্য থেকে যায়। কবির কাছে শিশু চরিত্রের সব তাৎপর্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মুখে ভাঙা ভাঙা কথা শোনার তাগিদে তিনিই তাদের সঙ্গে ভাঙা ভাষায় কথা বলেন। এমনকি উত্তপ্ত রোদে তাদের খেলায় ব্যাঘাত চান না কারণ তিনি জানেন 'ওরা আজ রোদ্দুরে দারুণ খুশি'।

একটি শিশুকে কবি একদিন প্রত্যক্ষ করেন কলকাতার এক রাজপথে। স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে বিস্মিত কবি দেখেন 'ঝড়ের বেগে ধাববান কলকাতা শহর' লালবাতির নিষেধ ছাড়াই হঠাৎ থেমে গেছে। সমস্ত যানবাহন ভয়ংকরভাবে টাল সামলে শিল্পীর ইজেলের স্থির চিত্রটির মতো স্তব্ধ হয়ে দেখে "টালমাটাল পায়ে রাস্তার এক পার থেকে অন্য পারে হেঁটে যায়/সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।" কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই তার, দুদিকে উদ্যত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, সমস্ত ট্রাফিক মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়ে টলতে টলতে হেঁটে চলে যায় সেই ভিখারি মায়ের শিশু। শিশুটির মধ্যে এক শাশ্বত সত্যের সন্ধান পান। তাঁর মনে হয় 'বেথেলহেমের জ্যোতির্ময় জাতক' যীশু যেন সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইছেন।

শিশুদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তিত কবি পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে আতঙ্কিত হন। শৈশবে যে হাসেনি বা ফুল কোড়ায়নি সেই শিশুর অন্ধকারময় ভবিষ্যতের জন্য কবি আন্তরিক দুঃখবোধ করেন—"তোমার জন্য আমার কোনো ভাবনা নেই, কিন্তু তোমার ছেলের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়।" বিশুদ্ধ আন্তরিকতায়, নিঃসীম মমতা নিয়ে তিনি তাকিয়েছেন সমস্ত শিশুর দিকে। যখন চোখ পড়েছে তাদের রিক্ততায়, তখন গাঢ় হয়েছে কবির উচ্চারণ, ভালোবেসে দুহাত বাড়িয়ে "স্নেহের চুম্বনখানি এঁকে দিতে ইচ্ছা হয়/সমস্ত শিশুর গালে।" কবির শৈশব কেটেছে গ্রামবাংলার উন্মুক্ত পরিবেশে, কিছুটা কলকাতা শহরে যার অনুপুঙ্খ পরিচয় পাই 'রূপকাহিনী' কবিতাগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতার একটি শিশু বারবার ঘুরে ফিরে আসে। কখনও সে যান্ত্রিক কপট সমাজব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়, আবার কখনও বা একটি নির্ভীক নিষ্পাপ শিশু

রাষ্ট্র ব্যবস্থার মগ্নতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে দ্বিধান্বিত হয় না, "সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে/নির্ভয়ে দাঁড়াক/সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করুক/রাজা তোর কাপড় কোথায়?" কখনও বা একটি প্রতীকী শিশু চরিত্র, কখনও বা কবির শৈশবের স্মৃতিচারণায় যে শিশুটি ক্রমাগত এসেছে কবির উচ্চারণে সে শিশুটি 'খড়ির দাগ' কবিতাভাষ্যে হাজির হতে দেখি তাঁর বাল্যবন্ধু সেই অমলকান্তিকে যে অন্তরে রোদ্দুর হওয়ার বাসনা লালনা করত। শৈশবে কবিকে শিখিয়েছিল ঘুড়ি ওড়ানোর যাবতীয় কৌশল, এমনকি কুলি কিংবা জাহাজের খালাসি হয়ে তার উগান্ডায় চলে যাওয়ার গোপন অভিপ্রায়ের কথাও সে অকপটে জানিয়েছিল কবিকে। তাঁর অন্য একটি কবিতা 'আমি ও তিতান'-এ উপস্থিত হতে দেখি এমন একটি শিশু চরিত্র যার মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের শৈশবকে। কবিতাটিকে কবির শৈশব ও একটি ভিন্ন শিশু চরিত্রের যেন একাত্মীকরণ ঘটেছে—

"তিতানকে অবশ্য প্রথমটায় আমি ঠিক চিনতে পারিনি।
কিন্তু ও যখন বলল
চাঁপাতলায় আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম,
এক ইস্কুলে পড়তুম, আর
ছাত থেকে আমি যখন উড়িয়ে দিতুম সব
রঙ-বেরঙের ঘুড়ি
ও তখন লাটাই ধরে থাকত,
ব্যস, তক্ষুণি আমার মনে পড়ে গেল যে, আরে, তাই তো,
এই তো সেই তিতান। আমার
ছেলেবেলার তাবৎ খেলা তো ওরই সঙ্গে আমি খেলেছি।"
(আমি ও তিতান : শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৯৮)

নীরেন্দ্রনাথ মৃত্যুকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু জীবনের প্রতি আত্যন্তিক ভালোবাসা তাঁর মৃত্যুচেতনায় ভিন্ন স্বাদ-বৈচিত্র্য এনেছে, নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। 'নীলনির্জন'-এর একটি কবিতায় মৃত্যু পথযাত্রীকে ঘিরে রয়েছে রহস্যময় মৃত্যুর উপস্থিতি। বিবর্ণ আলোয়, স্তব্ধ ভয়ে আচ্ছন্ন, অবসাদগ্রস্ত পরিবেশে মূর্ত হয়ে উঠেছে মৃত্যুর নৈকট্য 'শিয়রে মৃত্যুর হাত'। রাত্রি অবসানে মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় দেখি "জরাজীর্ণ ফুসফুসে কখন/নিশ্বাস টানার দীর্ঘ যন্ত্রণার ক্লান্তি ধীরে ধীরে/স্তব্ধ হয়ে গেছে, কেউ জানে না তা।" মৃত্যু রহস্যময় হলেও এক মুক্তির ডাক যেন নিয়ে এসেছে কবিতাটির শরীরে, এনেছে শান্তির প্রলেপ। কিন্তু কবির ধারণা মৃত্যুই শেষ কথা নয়, তাই নিয়ত মৃত্যু কামনা করেও মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকে বেঁচে থাকার বাসনা "আলোছায়া-বোনা বিচিত্র জীবনের/ব্যাথা-আনন্দ দুঃখ সুখের নিবিড় পরম্পরা/বাঁচবার আশা জ্বালিয়ে দিয়েছে ফের।"

নীরেন্দ্রনাথের অবিসংবাদিত স্বাতন্ত্র্যের উপাদান, বিকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা-পর্বের আনাচে-কানাচে, তাঁর সময়বাহিত উচ্চারণ-মালার ক্রমিক উত্তরণে, চেতনা ও মেজাজের ধারাবাহিক বিবর্তনের পথ বেয়ে। নীরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার যথার্থ কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে দুজন সমালোচকের অভিমত আমরা লক্ষ করতে পারি—

১. "নীরেন্দ্রনাথের কবিতা বুদ্ধিমান পাঠককেও বঞ্চিত করে না, অথচ খুব

সহজভাবে কথা বলতে বলতে, ভান না করে, অবলীলায় বুকে টোকা মারতে পারে অনেক পাঠকের।" (বাসুদেব দেব, 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তা', দরবারী সাহিত্য, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, পৃ. ৩৪)।

২. "সাধারণের অসচেতন অশিক্ষিত মনকেও যখন কবিতা নাড়া দেয়, তখন মনে হয়, মনে বিশ্বাস জাগে, কবিতাও মানুষকে বাঁচতে শেখায়-বাঁচার প্রেরণা যোগায়।" উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, 'দূরের থেকেও কাছের মানুষ : নীরেনদা' (নীরবিন্দু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ)।

অর্থাৎ বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকেও মুগ্ধ করে নীরেন্দ্রনাথের কবিতা। আসলে প্রেম কিংবা দলীয় মতবাদের কবিতা না লিখেও তিনি প্রচলিত বোধ্যভাষায় এবং সুদক্ষ ছন্দে যে কোনোও পাঠকের উপলব্ধির গভীরে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন। সেখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য, সেখানেই তাঁর স্বকীয়তা।

চারের দশকের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে একমাত্র সুভাষ ছাড়া সকলেরই কবিতা প্রত্যক্ষ নারীচেতনায় আচ্ছন্ন। পঞ্চাশের উল্লেখনীয় কবি সুনীলের কবিতায় নারী এতই প্রকট যে নারীর মধ্যে একমাত্র নারীই মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর উচ্চারণে। সেক্ষেত্রে নীরেন্দ্রনাথ অনেকটাই সংযমী তাই "মনে হতে পারে অবশ্য সচেতন, অহেতুক কিছু গোঁড়ামি তাঁকে বল্গাহীন হতে দেয়নি, কিন্তু সুক্ষ্ম বিচারে ওই তো আর্ট, যেখানে অল্প সাংকেতিক উহার আভাসে ব্যঞ্জনার সম্ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, এমন কিছু দৃশ্য সংযমী মেজাজে রেখায়িত করা হয় যেখানে আলো-আঁধারির রহস্য পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, 'a sight to dream of not to tell'." (সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, 'হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা' অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ' (এক সময় দুই কবি), সোম প্রিন্টার্স, পৃ. ৩৪)।

অন্যান্য কবিদের মতো তাঁকেও যখন নানা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় তখন সহজে বিচলিত হন না তিনি। তাঁর কিছু কবিতা বিবরণের নামান্তর বা বিবৃতিমূলক যা নাকি কবিতার অবয়ব প্রাপ্ত হয় না অথবা তিনি কবিতার বদলে গল্প লেখেন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের দ্বারা তাঁকে মাঝে মধ্যে আক্রান্ত হতে হলেও তবু নড়ে না তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত, এমনকি বিদ্রূপকেও অগ্রাহ্য করে অনায়াসেই বলে ওঠেন—"তুমি যত/হাততালি জমানো ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাও, ততই আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যায় নিজের উপরে।" সমালোচিত হলেও অবক্ষয়ের মুহূর্তে তিনি প্রগতির সন্ধানী, মানবতাবাদে বিশ্বাসী, অসংগতি সম্পর্কে নিষ্ঠুর, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে অবলোকনশীল, তাঁর আসন সর্বকালে সকল সমাজ সময়ে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে আমাদের মধ্যে।

গ্রন্থঋণ

১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/নীরবিন্দু/দে'জ পাবলিশিং/দ্বিতীয় সং. প্রকাশ-১৯৯৯।

২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/শ্রেষ্ঠ কবিতা/দে'জ পাবলিশিং/পরিবর্ধিত দশম সংস্করণ-জুলাই ১৪০২।

৩. অরুণকুমার সরকার/'দূরের আকাশ'/প্যাপিরাস/পৃষ্ঠা-৬/প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ১৯৮১।

৪. নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/'কবিতার দিকে'/কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা/পুনশ্চ/পৃষ্ঠা-১৫ প্রথম সং. প্রকাশ ১৯৯২।

৫. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত/'চল্লিশের কবিতা'/('আধুনিক কবিতার ইতিহাস'—সম্পাদনা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়)/ভারত বুক এজেন্সী/পৃষ্ঠা-১২৮, নতুন সং. প্রকাশ-১৯৮৩।

৬. সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়/'হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা' অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ (এক সময় দুই কবি)/সোম প্রিন্টার্স/পৃঃ ১৪, দ্বিতীয় সং. প্রকাশ-১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

৭. সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়/'নীরেন্দ্রনাথের কবিতাঃ আজও কতটা সমাজমনস্ক' (প্রসঙ্গত কবিতা)/মাঝি প্রকাশনী, পৃ. ১৫২, প্রথম সং. প্রকাশ-১৯৮৫।

৮. উৎপলেন্দু চক্রবর্তী/'দূরের থেকেও কাছের মানুষ : নীরেনদা' (নীরবিন্দু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ)।

৯. তরুণ মুখোপাধ্যায়/'বাংলা কবিতা : অনেক আকাশ/প্রজ্ঞাবিকাশ/প্রথম প্রকাশ—দোলযাত্রা ১৪০৯।

১০. মধুশ্রী সেন সান্যাল/কবি নীরেন্দ্রনাথ যাপনে জিজ্ঞাসায়/সপ্তর্ষি প্রকাশন/প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

১১. অরুণকুমার সরকার/তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী/প্যাপিরাস/প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ১৯৮১।

১২. মাহবুবুল হক/তিন জন আধুনিক কবি (সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য)/নয়া উদ্যোগ/প্রথম প্রকাশ-জানয়ারী ২০০৫।

১৩. শীতল চৌধুরী/আধুনিক বাংলা কবিতার নিবিড় পাঠ/প্রজ্ঞাবিকাশ/প্রথম প্রকাশ-শুভ রথযাত্রা-১৪০৯।

১৪. জোকা সমাচার (বড়দিন সংখ্যা) ১৪১৮।

১৫. সুদক্ষিণা (রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা) ১৪১৭।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় : শুখা দেশ আর ভুখা মানুষের কথাকার

মিন্টু নস্কর

কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে আঞ্চলিকতা ধরা দিয়েছে নিজের অনন্য স্বাতন্ত্র্য রূপ নিয়ে। সেই আঞ্চলিকতায় কোনো প্রকৃতিনির্ভর রোমান্টিকতার ছোঁয়া নেই, রয়েছে কেবল রুক্ষ, শুষ্ক, নির্মম প্রকৃতির উগ্রতা আর প্রখর দারিদ্র্যের চরম বাস্তবতা। তাঁর লেখনীতে ধরা পড়ে অসহায় সব হারানো নিরন্ন মানুষের কান্না, হাহাকার আর জীবনসংগ্রামের কাহিনি। অন্ন, জমি, সম্মান, প্রেয়সীর শরীর সব লুটে নিয়ে যায় জোতদার, জমিদার, মহাজন আর রাজনীতির নোংরা খেলায় মেতে ওঠা হিংস্র নেকড়ের দল। তবুও অসহায় মানুষগুলো বেঁচে থাকে কেবল বেঁচে থাকার জ্যান্ত আনন্দের টানে। জীবনমাদকতার রস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। রামকুমার তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঋদ্ধ বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মাটি আর মানুষের টুকরো টুকরো কোলাজ একত্রিত করে দরদি শিল্পীর তুলিতে বাস্তবতার ছবি আঁকেন। দেখান স্বাধীনতা এনেছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। রাজনৈতিক পালাবদলের আশায় নতুন করে বুক বাঁধা মানুষদের ব্যর্থতা আমাদের চোখে মনে জ্বালা ধরায়। অত্যাচারিত মানুষ প্রতিবাদ প্রতিরোধের ভাষা খুঁজে পায় না। কখনো ব্যর্থতার বুকভরা অভিমান নিয়ে চোরের মতো পালিয়ে বাঁচে, কখনোবা পালটা মারের গনগনে আঁচে গা সেঁকে প্রতিরোধের শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। আদায় করে নেয় খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান। বাঁচার মানেটা খানিক পালটায়। যদিও সংখ্যাটা খুবই নগণ্য কিন্তু রামকুমারের নিরপেক্ষ কলম পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতাকে, আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকেও এড়িয়ে থাকতে পারেনি। রাজনৈতিক মতাদর্শের কাছে সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতাকে বিকিয়ে না দিয়ে সময়, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতির বাস্তবতাকে, আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি। রাজনৈতিক মতাদর্শের কাছে সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতাকে বিকিয়ে না দিয়ে সময়, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতির বাস্তবতাকে ক্লান্তিহীন কথকতার আঙ্গিকে তুলে এনেছেন। এখানেই রামকুমারের সার্থকতা ও অনন্যতা।

'ভারতজোড়া গল্পকথা'র দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি শোনান 'দুঃখে কেওড়া'র বারমাস্যা। অবলীলায় পৌঁছে যান রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ বন্ধুর প্রকৃতি আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করা অসংখ্য 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালী'তে। তাঁর রচনাশৈলীর 'মাদলে নতুন বোল' শোনা যায় বারবার। 'মিছিলের পরে' থেকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেন মিছিলের বাস্তবতা। পত্রাকারে সেই বাস্তবতার অভিজ্ঞান শোনান প্রত্যন্ত বাঁকুড়া জেলার 'ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র'। প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর এই অনলস 'পরিক্রমা'র মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে মানুষ—জোতদার, মহাজন থেকে ভূমিহীন ভাগচাষি, জনমজুর, হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ, হাড়ি, ডোম, সাঁওতাল, রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়া মন্ত্রহীন অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষ। এদেরকে নিয়েই রামকুমার নির্মাণ করেন কথকতার এক বিচিত্র জগৎ। যেখানে প্রান্তিক বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মানুষেরা তাদের দারিদ্র্য, বঞ্চনা আর অসহায়তা নিয়ে বেঁচে থাকে, বলা ভালো বেঁচে থাকার লড়াই করে। শৈশব ও কৈশোরে বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গেলিয়া গ্রামে কেটেছে তাঁর দিন। অচ্ছেদ্য নাড়ির যোগ স্থাপিত হয়েছে রাঢ় বাংলার পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, শোষিত, সরকারি ঔদাসীন্যে ক্রমশ রুগ্ন হতে থাকা গ্রাম-বাংলার

মানুষগুলোর সঙ্গে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সেই ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেই পরিণত রামকুমার কলম ধরেছিলেন। তাই তাঁর গল্প যে প্রথাগত রোমান্টিকতার আবেশকে দূরে সরিয়ে প্রখর বাস্তবতার অনুসন্ধানী হয়ে উঠবে এই প্রত্যয় পেতে শুরু করেছিল সাতের দশকের সচেতন পাঠকেরা। আশার কথা লেখক সে প্রত্যাশা পূরণে এখনো সমানভাবে সচেতন। রাঢ় বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার এমন এক ভূগোলের গল্প তিনি শোনান, যেখানে শীতে হাড় কাঁপে, গরমে বুক ফাটে। যেখানে সারাবছর জল নেই, কাজ নেই, নেই কোনও নিরাপত্তা। শুখা দেশ আর সেই ভুখা মানুষেরা রামকুমারের কলমে অভাব, অভিযোগ, প্রতিবাদ আর বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্রয় পায়।

আঞ্চলিক কথাকাররা দায়বদ্ধ থাকেন কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের উপর। কারণ Regional literature—'emphasizes the setting, speech and social structure and customs of a particular locality'[১] 'Local Colour'-কেও ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব থাকে আঞ্চলিক কথাকারদের। আঞ্চলিক সাহিত্য তাই অধিকাংশই সময়ই হয়ে ওঠে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সাহিত্য সংরূপের আধারে তুলে আনা মোটেই সহজ কাজ নয়! তাই আঞ্চলিক কথাসাহিত্যিকদের বিশেষ ভাবে সচেতন থাকতে হয়— প্রধানত আঞ্চলিক উপভাষা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাবকে। দেখাতে হয় সময়ের ক্রম-বর্ধমান স্রোতে পরিবর্তমান মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চালচিত্রকে। তারাশঙ্কর, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আব্দুল জব্বার প্রমুখ আঞ্চলিক কথাসাহিত্যিকদের মতো রামকুমার মুখোপাধ্যায়ও এই কাজটি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। একালের প্রখ্যাত এক সাহিত্যিক যথার্থই বলেছেন—

> গ্রাম ভারতবর্ষের পরিবর্তনকে এক নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখেছেন রামকুমার। আসলে চেনা কাহিনিকে অমনভাবে অচেনা করে দিতে আমরা এই সমকালে আর কাউকে তেমন দেখিনি।[২]

'বৈষ্ণবীয় খোল আর রাজনৈতিক মাদলে'র চাপে পড়ে চেনা মানুষ, চেনা কাহিনির দ্রুত পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তিনি 'দিবাকর পিসি'র মতো কথকতার ভঙ্গিতে অনায়াসে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তারাশঙ্কর বা সিরাজের রচনাতে প্রকৃতি যেভাবে এক মায়ামুগ্ধকর জগৎ সৃষ্টি করে, কখনোবা প্রকৃতি হয়ে ওঠে আখ্যানের মূল চালিকাশক্তি; রামকুমারের গল্পে সেই প্রাকৃতিক স্বপ্নমধুর পরিবেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। হয়তো কোপাই, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, হিজল অঞ্চলের উর্বর পলি মাটির স্নিগ্ধ প্রকৃতি অগ্রজ দুই সাহিত্যিককে যেভাবে স্পর্শ করেছিল বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার ঊষর প্রকৃতি তাঁকে সেভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু এটাও তো সত্য যে রুক্ষ প্রকৃতিরও আছে একটা স্নিগ্ধ কোমলতা। রামকুমারের প্রতিবেশী সাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের রচনাতেও এই রুখা প্রকৃতি নেশা ধরিয়ে দেয়। মগারাম মুচি (আঁকশি)) লক্ষ্মণ সহিসদের (লক্ষ্মণ সহিস) যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনগাথা শোনাতে গিয়ে 'পলাশের আগুনলাগা ডাল' দেখে যখন তিনি থমকে দাঁড়ান, নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন তখন রামকুমার সোজা পৌঁছে যান সুচাঁদ, বাঁকু, বনমালী, গঙ্গিদের অন্দরমহলে। অনুভব করেন টাঁড় বাংলার রোদে পোড়া মাটি ও মানুষের সোঁদা গন্ধ। তাই তাঁর গল্পে হয়তো দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার ছবি এত স্পষ্ট। একালের প্রায় সমস্ত কথাসাহিত্যিকরা তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে আনেন। অধিকাংশেরই বিষয়বস্তুতে শোষণ, দারিদ্র্য, অসহায়তার ছবি ফুটে ওঠে। যাদের প্রতিদিনের অন্ন সংস্থান হয়ে ওঠে প্রধান সংকটের বিষয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অফুরন্ত প্রাণরস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। রামকুমারের গল্পে আমরা

সেই শোষিত ভূমিহীন সাধারণ মানুষ, ভাগচাষি, পরিস্থিতির চাপে স্বাধীন জীবিকা হারানো মানুষদের নতুন করে বেঁচে থাকার মাদকতা অনুভব করতে পারি। তাই 'বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা' গল্পের বনমালী, 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালী', গল্পের বাঁকু, 'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ ঘুঘু কিংবা মানুষ' গল্পের সুচাঁদ'রা সর্বস্ব হারিয়েও বেঁচে থাকতে চায়। বনমালীর দু'দিন থেকে কাজ জোটেনি— অর্থাৎ দু'দিন ভাতও জোটেনি। তাই সে নিজের গরজেরই বামুনদের পঞ্চাশ বছরের পোড়খাওয়া তালগাছটার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তালপাতা কেটে পাঁচ টাকা মজুরির আশায়। এর আগে আম জাম এমনকি তেঁতুলগাছেও সে উঠেছে কিন্তু তালগাছে এই প্রথম। অবাক বিস্ময়ে দেখেছে—তালের অজস্র শিকড় পৌঁছে গেছে মাটির গভীরে। বনমালীও অনুভব করে তার দেহ থেকেও যেন চারিয়ে গেছে এমন সব অদৃশ্য দারিদ্র্যের শেকড়। ভাগচাষিরা সরকারি প্রতিশ্রুতিতে মহাজনদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই শেষে বর্গারেকর্ড পেয়েছে কিন্তু জনমজুরদের কোনও রেকর্ড নেই, বাড়েনি তাদের মজুরি; অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে চালের দাম। 'ভোটবাবুদের' জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শুনে সেও নিজস্ব জমির স্বপ্ন দেখেছিল। 'ভোটপার্বণ' মিটে যেতেই সে প্রতিশ্রুতিও হাওয়ায় মিলিয়েছে। বনমালীর দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে ক্লিষ্ট চৌকিদার তার বৌকে 'রাধা করে' পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে তারই ঘরের ভিতর। কিছু করার থাকে না বনমালীদের। তালগাছের শীর্ষে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে চেনা পৃথিবীর অচেনা স্বাদ নিতে নিতে তার মনে এই দার্শনিক বোধ জন্মেছে—

> এতসব কিছু কিসের জন্যে? নিজের পেট? বউ? ছেলেমেয়ে? অন্য পাঁচজন?....
> কেন এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করা? এখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো সব দুঃখের
> শেষ, কোন যন্ত্রণা থাকবে না।[৩]

—কিন্তু বনমালী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। দারিদ্র্য, সামাজিক উপেক্ষা, কানকাটা অপবাদ, বৌ'য়ের নষ্টামি সহ্য করেও নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। দেখে মুড়ি হাতে, ছেলে কোলে তার ভ্রষ্টা বউ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গাছের নীচে। দু-হাতের চেটোয় চারটে তালপাতার সঙ্গে বেঁচে থাকার গ্লানি আর আনন্দ নিয়ে বনমালীও তাই—'কাঁকুরে পথে বুক ঘসটে ঘসটে এগোয়।'

বনমালীর এই বেঁচে থাকার প্রত্যাশা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঁকুচাঁদের মধ্যে (বাঁকুচাঁদের গেরস্থালী)। এ গল্প পড়তে গিয়ে অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে যায় 'চণ্ডীমঙ্গলের' কালকেতু-ফুল্লরার বারমাস্যার প্রসঙ্গ। বৈশাখের প্রখর রৌদ্র ঝরা দিনে ফুল্লরার মাংস বিক্রি হয় না। জ্যৈষ্ঠে বেঙচের ফল খেয়ে তাদের উপবাসী জীবন কাটে, আর আষাঢ়ে,—

> মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে।
> কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পূরে।।[৪]

আধুনিক পরিবর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক জাঁতাকলে বাঁকু তাঁতিও ফুল্লরার মতো মাসের পর মাস অনাহারে, অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করে। নিজের স্বাধীন শিল্পী সত্তা হারিয়ে বাঁকু দিনমজুরি, অনুষ্ঠান বাড়িতে উনোন তৈরি, ঘর ছাওয়ার কাজ করে বেড়ায়। এ শুখা দেশে সে নিয়মিত কাজও পায় না। তাই যে বাঁকুর খিস্তির দোষ ছিল না তার মুখে এখন খিস্তির খই ফোটে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুর আছে তুমুল ধুরন্ধর বুদ্ধি। মিথ্যা গলায় দড়ির অভিনয় করে বউকে সে কলকাতায় পাঠিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা খোঁজে। তাঁত সচল থাকার স্বচ্ছল দিনে বউকে রানি করে বসিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে। বউয়ের মানি অর্ডারের আশায় নতুন করে বুক বাঁধে বাঁকু। মানি অর্ডার পৌঁছায়নি, কলকাতার রাস্তায় লরির চাকায় পোস্টকার্ড হয়ে পোস্ট

অফিসের ছাপ নিয়ে তার বউ ফিরে আসে। সত্তরের দশকের দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রাম-বাংলার দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতিনিধি বাঁকু। আধুনিক যানবাহন, যন্ত্রপাতি, চিকিৎসাশাস্ত্র আর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কাজ হারাতে হারাতে বাঁকুর দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়তে থাকে,—

> ব্লকে ভেটেনারী ডাক্তারের অফিস। ওখানে নাকি জারসি বলদ এসেছে। ওর সঙ্গে আবাদ করলে নাকি গাই-এ আধমন দুধ দেবে। এঁড়েগুলো পর্যন্ত বাঁকুর সঙ্গে শত্রুতা করছে।[৫]

বাঁকুর শত্রু সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও তার মনে ফুর্তিটি কিন্তু অবিরাম। অনাথ মুখার্জীর বাড়িতে দশ টাকা বেতনের রাত পাহারার কাজ নিয়ে রানির বরাদ্দ ভাতটুকু খেয়ে তাই সে,—

> ভাত ঘুম, রুটি ঘুম, মাইলো ঘুম, উপোসী ঘুম—এসবের ফারাক ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।[৬]

—যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে রামকুমার বাঁকুর গেরস্থালির বিবরণ দেন বাংলা সাহিত্যে তা সত্যিই অভিনব। বাঁকুর চালাকি বুদ্ধি শুধুমাত্র একমুঠো খেতে পাওয়ার আশায়। সারাদিন অনাহারে, অর্ধাহারে কাটিয়ে বাবুবাড়ির নাতি, নাতনিদের রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-রাক্ষসীদের গল্প শোনাতে শোনাতে তারও অতৃপ্ত আত্মা ভাত খাব, মুড়ি খাব বলে সারারাত কেঁউ কেঁউ করে। ভাতের পাহাড়ের সামনে বসে খুঁড়ি রানি যখন ঘুমঘুম চোখে স্বপ্ন দেখে বাঁকু তখন গুমরোতে থাকে— 'হ্ বাঁকু তাঁতি। অত সোজা লয়। ই ভাতের পীরিত, ভাতারের লয়।'[৭] বাঁকুর হিসাবে বড়ো ভুল হয়ে গিয়েছিল, কারণ রানি ততদিনে তার উলটোটাই ভাবতে শুরু করেছে। বাঁকুর শোনানো বাসর রাতের অচেনা রাজপুত্র যখন গভীর রাতে রানির মাথার কাছে ফোঁস ফোঁস করে তখন সে আর স্থির থাকতে পারেনি। তাই 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' দুটো টিনের থালা, তিনটে কাপড়, পাঁচসের চাল, এমনকি 'নারকেল লতার লুতিটি' পর্যন্ত গুছিয়ে নিয়ে কড়ায় খোঁড়া বাঁকু আর জন্ম খুঁড়ি রানি নতুন জীবনের সন্ধানে যাত্রা করেছে,—

> বাঁকু বুঝেসুঝেই নিয়ে গেছে—বউ আনতে কড়ি ঘর বাঁধতে দড়ি।[৮]

—এই অমোঘ আদিম আকর্ষণ উপেক্ষা করার শক্তি বাঁকুর ছিল না। ভিখু ও পাঁচী (প্রাগৈতিহাসিক) এই আকর্ষণেই পা বাড়িয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের বুকে। মানিকের মতো মনোগহনের সর্পিল আঁধার পথে নয়, বাঁকুদের পথ অনেক বেশি প্রত্যাশার আলোকে উজ্জ্বল।

'জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংম্বা মানুষ' গল্পে সুচাঁদও বাঁকুর মতো জীবনপ্রেমিক মানুষ। জীবনকে ভালোবেসে জীবনের মাদকতা সে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে। টাঁড় বাংলার দাঁত-নখ বার করা আগুনঝরা প্রকৃতি এখানকার মানুষের কাজ কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে মুখের গ্রাস। সুচাঁদ আর তার বউকে মাটি কাটার কাজ না পেয়ে ফিরে আসতে হয়। ফেরার পথে পাওয়া একটা পাকা ফুটি খেয়ে পরম নিশ্চিন্তে রাতটুকু অতিবাহিত করে। পরদিন থেকে আর তাদের কিছু জোটেনি। তাই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সুচাঁদ 'এমন বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো'—এই সহজ সিদ্ধান্ত নিয়ে একগাছা ছাগল দড়ি হাতে ঝুলে পড়তে বেরিয়েছে। আধুনিক নাগরিক মানুষের কাছে একটা দিনের শুরু মানে ব্রেকফাস্ট টেবিলে চায়ের কাপে তুফান ওঠা, লাঞ্চের মেনু পরখ করে দেখা। সেখানে দিনের শুরু মানে সুচাঁদদের মাইলের পর মাইল কাজ খোঁজা, প্রকৃতির বিরূপতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। দেখে নিই সেই প্রকৃতির রূপ কেমন—

> চারদিক আগুনে খাক হয়ে যাচ্ছে। মাঠের হাঁ করা ফাটল দিয়ে যেন আগুনের ফিনকি বেরিয়ে আসছে। গাছগুলো ঝিমিয়ে গেছে তাতে। যতদূর চোখ যায় মানুষ চোখে পড়ে না। শুধু পলাশ গাছটার পাতা ঢাকা ডালটার ভেতরে ঘুঘু ডেকে যায়।[৯]

লাল মাটির লাল হলকা রাঙা লাল কাপড় পরে সুচাঁদের বউ সারাদিন খুঁজে ফেরে অভিমানী স্বামীকে। আর সেই ফাঁকে সওরের ভাগচাষ, রাজনীতি, স্ট্রাইক—সবই বুনে দেন রামকুমার। কিন্তু আমাদের মন পড়ে থাকে সুচাঁদের সংসারে। যে সহজ সিদ্ধান্ত নিয়ে সুচাঁদ বেরিয়েছিল, পরে বুঝতে পারে সিদ্ধান্তটা অতটা সহজ ছিল না। সাঁওতালডিহির ইলেকট্রিক পোস্টে নিশ্চিত মরণের মুখে পৌঁছে ইলেকট্রিক তারে শক্ খেয়ে দুটো প্রেমিক ঘুঘু পড়ে যেতেই সুচাঁদের আর মরা হয় না। ঘুঘু দুটো হাতে নিয়ে রাজার মতো বাড়ির পথ ধরে। বৌকে সোহাগ করে রসিয়ে রসিয়ে বলে—

> খিদার জিনিষ ভগবান দেছেন, মারতে যাব কোন দুঃখে? তার উপর তুই উপোস করে আছিস বটে।[১০]

—প্রশ্ন জাগে, সুচাঁদের কি সত্যিই মরার ইচ্ছা ছিল? ছাগল দড়ি নিয়ে টাঁড় বাংলার কোনও একটা গাছে ঝুলে পড়লেই তো পারত। তা না করে সুচাঁদ সুদূর সাঁওতালডিহির ইলেকট্রিক পোস্টে শক্ খেয়ে মরতে গেল কেন? সুচাঁদ মরার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সকালবেলা, আর সাঁওতালডিহির পোস্ট থেকে মনে হয় সে নেমে এসেছিল বিকেলের দিকেই। কারণ তার বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে চাঁদ উঠেছিল। অর্থাৎ সারাদিন দড়ি হাতে করে সে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। অন্যান্য বারের মতো খুঁজছিল রাতটুকু কাটাবার সামান্য রসদ। পায়নি। পেলে হয়তো সন্ধ্যার অনেক আগে বাড়ি ফিরে আসত। অর্থাৎ তার সারাদিনের পরিক্রমার মধ্যে ছিল তীব্রভাবে বেঁচে থাকার অন্বেষা। তাই জোড়া প্রেমিকের মাংসে ধার করা চালের ভাপ ওঠা গরম ভাত পটিয়ে জোগাড় করা এক বোতল দেশি মদ গলায় ঢেলে 'জীবন-প্রেমিক' সুচাঁদ স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় বউয়ের গা ঘেঁসে চলতে-চলতে গান ধরে—

> ঝিঙ্গালতে কাল্লালতে বাজ লাগালি
> মাইরি বাজ লাগালি
> তকে লাজ না লাগে লো
> মুচকা হাঁসালি
> মাইরি মুচকা হাঁসালি।[১১]

রামকুমারের এ গল্প পাঠে পাঠক বিহ্বল না হয়ে পারে না, সুচাঁদের গানে তারাও গুনগুন করে গলা মেলায়; দারিদ্র্য যন্ত্রণার মাঝেও বেঁচে থাকার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। খুব খাঁটি কথা বলেছেন প্রাবন্ধিক স্বপন পান্ডা—'হেরো মানুষের এমন আহ্লাদ এত ভালোবাসা আর ঘরে ফেরার টান দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।'[১২]

রামকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মাটি ও মানুষের টুকরো টুকরো কোলাজ একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে আনেন তাঁর ছোটোগল্পে। যার মধ্য দিয়ে পাঠক প্রত্যক্ষ করে কোঠার Reality-টাকে। তিনি যে সমস্ত মানুষের কথা বলেন তাদের বেঁচে থাকার উপযোগী খাদ্য সংস্থানের সংকট প্রতিমুহূর্তে। Reality-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই চরিত্রেরা নস্টালজিক হওয়ার সাহস পায় না,

বলা ভালো সুযোগ পায় না। তাদের মধ্যে সামান্য যে নস্টালজিয়ার প্রকাশ ঘটে সেটা ভরা পেটের নস্টালজিয়া। সুঁচাদের মধ্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। আসলে তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ—এই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা কথাসাহিত্যে যে বাস্তবতার অনুসন্ধান তীব্র হয়ে উঠেছিল, সত্তর-আশি'র দশকের কথাসাহিত্যিকদের হাতে তা আরও পরিণত, সংহত হয়েছিল। ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, অভিজিৎ সেন, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে তাই প্রতিটি মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াই অনুভব করা যায়। একান্ত আলাপচারিতায় সেকথা স্বীকার করেছিলেন রামকুমার—'সাতের-আটের দশকের মাঝামাঝিতে যে পর্যায় চলছিল সেখানে অন্নের হাহাকার, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, রাজনৈতিক উত্তাপ, উত্তেজনা—সব মিলে এক চূড়ান্ত পর্যায়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের তো স্বপ্ন ছিল যে, দেশ স্বাধীন হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের তো সেটাও ছিল না, দেশ তো তখন স্বাধীন।'[১৩] এই স্বাধীন দেশের এমন এক পরাধীন ভূখণ্ডের গল্প আমরা শুনি যেখানে একমুঠো মুড়ি, গবাদি পশুর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ভাতের মাড়, একটা পাকা তাল, ছোটো-বড়ো কয়েকটা ইঁদুর, একবেলা খাওয়ার মতো কয়েকটা কাঠবেড়ালি, পিঁপড়ের ডিম পেয়ে অনাবিল আনন্দে এই সমস্ত ভুখা মানুষের চোখ-মুখ খুশিতে চক্‌চক্ করে। মদ খাওয়া এদের কাছে বিলাসিতা নয়, দেশি মদের উগ্র নেশায় পেটের জ্বালাকে ভুলে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। রামকুমারের 'পিকনিক', 'হা-ভাতে', 'দায়বদ্ধ', 'ছোবল', 'গোষ্ট', 'হাউসে' প্রভৃতি গল্পে এই বেঁচে থাকার বাস্তবতা উঠে এসেছে। লেখক নিজেই ছোটোবেলায় দেখেছেন গাছতলায় মাইলো ঘাঁটা হচ্ছে, অসংখ্য হা-ভাতে মানুষ সেই মাইলো খাওয়ার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। 'পিকনিক' গল্পের গঙ্গি এমনই এক হা-ভাতে পরিবারের মেয়ে। জিভ বার করা অভাবের সংসারে যাদের 'দৈনিক ভাত না জুটলেও মার জুটবেই।' গঙ্গি তাই ভাতের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কুকুরের মতো পৌঁছে যায় কলকাতা থেকে আসা বাবুদের পিকনিকতলায়। 'খবরটা এঁড়ে বাছুরের মত' যত চারিদিকে 'পাঁই পাঁই করে ছোটে'—তত পিলপিল করে বেরিয়ে আসে ভুখা মানুষরা। সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট খাওয়ার আশায়। সেখানে বাবু বাড়ির ছোট্ট মেয়েটার জৌলুস দেখে অবাক হয়ে যায় গঙ্গি—

> লাল জামাটা দেখে লোভ হয় গঙ্গির। ও বাবা, পায়ে আবার লাল টুকটুকে জুতো। অমন ঝিলিক-মিলিক জুতো দেখে হাঁ হয়ে যায় গঙ্গি। দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে নিজের পায়ে হাত বুলোয়।[১৪]

বাবুদের পাতে যখন ভাত পড়ে গঙ্গি তখন উজ্জ্বল চোখে তাকায়, মিষ্টি পড়লে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। বাবুবাড়ির ছোট্ট মেয়েটা তেঁতুলের চাটনি অবিকৃত মুখে খেয়ে ফেলছে দেখে বুঝতে পারে না 'কলকাতায় তেঁতুল টক না মিষ্টি।' তারপর সেই উচ্ছিষ্ট পাতার মধ্যে থেকে মাংসের হাড়, মিষ্টির টুকরো খাওয়ার কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কুকুর আর মানুষের। সামাজিক এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক স্পষ্ট প্রতিবাদের স্বর শোনা যায় এ গল্পে। রামকুমার নিজেও স্বীকার করেছেন সেকথা—

> আমার গেলিয়ার মতো একটা নিরন্ন গ্রামে গিয়ে মাংস মিষ্টির পসরা সাজিয়ে পিকনিক একটা অসংলগ্নতা। তুমি তোমার রান্নাঘরে বসে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাও না! আমার উঠোনে কেন? এটা বরাবর হয়ে যাচ্ছে। কেউ কি উল্টোদিক থেকে একটু ভেবে দেখবে না?—এই ভাবনা থেকেই এ গল্প।[১৫]

গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'একটি রাগী মেয়ের গল্প' নামে 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায়। পরে 'পিকনিক' নামে 'মাদলে নতুন বোল' (১৯৮৪) গল্পগ্রন্থে স্থান পায়। মনে হয় গল্পের নাম পরিবর্তনটা খুব জরুরি ছিল। কারণ গঙ্গিরা ঠিক রাগী মেয়ে নয়, রাগ দেখালে পেট ভরে না; গঙ্গিরা হা-ভাতে।

এমনই এক হা-ভাতে চরিত্র ডিংলে (হাভাতে)। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে দু'মুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই যেখানে অনিশ্চিত, টেলু ঠাকুরের সেখানে সন্তান উৎপাদনে কোনও বিরতি নেই। আদিম যৌনতার ক্ষুধা নিয়ে টেলু ঠাকুরেরা বেঁচে থাকে আর দিনে দিনে দরিদ্রতর হতে থাকে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণার জ্বালায় টেলু ঠাকুর হরিনাম ভুলে দিনরাত খিস্তি করে। লেখক নিজেই ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, তাই টেলু ঠাকুর, ডিংলেদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। গ্রামের মানুষেরা যেখানে দু'বেলা খেতে পায় না, সেখানে টেলু ঠাকুরদের কেইবা নৈবেদ্যের পাহাড় সাজিয়ে দেবে? টেলু ঠাকুর তাই দীর্ঘ হাঁটা পথ অতিক্রম করে ডিংলেকে কলকাতায় মিষ্টির দোকানের কাজে লাগিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা খোঁজে। কিন্তু হা-ভাতে, অভিমানী, ক্ষুধার্ত ডিংলে একমুঠো মুড়ি না পেয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে হারিয়ে যায় মহানাগরিক স্রোতে। কিশোর মনের সারল্য নিয়ে ডিংলে ঘুরে বেড়াত গ্রাম-বাংলার পথে-পথে। এবার ডিংলের নতুন পথ চলা শুরু হবে শহরের হা-ভাতেদের ভিড়ে। হয়তো বা বাঁকুর বউয়ের মতো পোস্টকার্ড হয়ে ফিরে আসবে। 'ছোবল' গল্পে মহাজনী শোষণ, সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে ঈশান সাপুড়ে আর তার ছেলে অমূল্য। জাতভাইদের বংশানুক্রমিক চুরিবিদ্যা ছেড়ে সাপখেলা দেখিয়ে ঈশান নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু সাপ দেখে এখন মানুষের ভয়, ভক্তি কোনো কিছুই জাগে না, তাই সে সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাতটুকু কাটাবার মতো অন্ন সংস্থান করতে পারে না। মহাজনের লালসার শিকার হয়ে তার বউ জলের নীচে পাঁকে গিয়ে শুয়ে থাকে, আর ঈশান প্রতিবাদের ভাষা হারায়। ডিংলে, গঙ্গির মতো অমূল্যও আরও একটা হাভাতে চরিত্র। সামান্য একটা তাল পেয়েই তার মন খুশিতে ঝকমক করে ওঠে। হাজরাদের গাছে তালের রং ধরলে তার মনেও খুশির রং লাগে। স্বপ্ন দেখে তাল বেচে একটা 'লাল প্যান্টুল' আর 'একরীল টোটা' কিনবে। সে স্বপ্ন তার পূরণ হয়নি। গঙ্গি, ডিংলে, অমূল্য এদের প্রত্যেকেরই একটা গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। এদের পৃথিবীটা যেমন খুব সংকীর্ণ তেমনি এদের চাওয়া-পাওয়ার পরিধিও খুব সীমিত। কেউ একটু উচ্ছিষ্ট এঁটো পাতা, কেউবা সামান্য একটা 'হাঁড়িমুখো তাল' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। অথচ বারে বারেই তাদের প্রতারিত হতে হয়। 'মাছ চুরির' অপবাদে মহাজনের পায়ের তলায় মড়মড় করে গুঁড়িয়ে যায় অমূল্যদের ভাতের হাঁড়িটা। ঈশান প্রতিবাদ না করলেও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নিয়েছে তার আরেক অবলা সন্তান দুধে গোখরোটি। রুখে দাঁড়িয়েছে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে। ঈশানের মতো আরেক হেরো মানুষ নিতাই (দায়বদ্ধ)। জীবনযুদ্ধের বন্ধুর পথে প্রকৃতি আর ভাগ্যের হাতে সে নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত। ব্যাঙ্কের লোনের টাকায় কেনা বলদে নিজের জমির মরাই ভর্তি ধান, ধান থেকে বউয়ের রঙিন কাপড়, বাস তেলের স্বপ্ন দেখেছিল নিতাই। আগুন ঝরা প্রকৃতির অনিবার্য পরিণাম আর সন্তানসম বলদের আকস্মিক মৃত্যুতে নিতাইয়ের স্বপ্ন দেখা উজ্জ্বল চোখগুলোতে এখন ঘোলাটে দৃষ্টি—

> নেতাই আল দিয়ে হাঁটে ঘাসের দিকে মুখ করে। তাকায় গরুর মত ঘোলাটে চোখ নিয়ে। হাঁটার ক্ষমতাও যেন গেছে। মাটিতে হাত দুটো গাড়তে পারলে যেন বাঁচে।[১৬]

—এই অনিশ্চিত জীবন যাপন এদের নিয়তি। প্রকৃতির কাছে, কখনোবা জোতদার, মহাজনদের শোষণে অবহেলিত, লাঞ্ছিত হতে হতে বেঁচে থাকে, দলবেঁধে বেরিয়ে পড়ে বর্ধমান, বীরভূম,

কলকাতায় মুনিষ খাটার কাজে। সন্তান-সন্ততিদের জন্ম দেয়। বাড়তে থাকে গঙ্গি, ডিংলের মতো হাভাতেদের সংখ্যা।

'গোষ্ট' এবং 'হাউসে' একটু অন্য অনুভূতির গল্প। দারিদ্র্য অসহায়তা এ গল্প দুটিতেও আছে, কিন্তু বড়ো হয়ে উঠেছে মানুষ আর পশুর আদান-প্রদান। একটা আদিমতা বোধ। হাউসে অর্থাৎ যারা উদাসী, বাউন্ডুলে, একটু বিবাগী ধরনের মানুষ। যাদেরকে চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। 'হাউসে' গল্পে দু'জন হাউসের কথা আছে একজন খাঁদা অন্যজন হুড়োল। খাঁদার চোখ দিয়েই হুড়োল চিনেছে আদিম বন্য প্রকৃতিকে, তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে পাখি ধরার নেশা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে এমন অনেক হাউসে শিকারি আছে যারা পাখির মাংস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরকম একজন হাউসে মানুষের মুখ থেকে লেখক শুনেছিলেন তাদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি—

> একটা দোকানের দাওয়ায় বসে আছি। পাঁচ-ছ মিনিট পর একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজির হলো। ছোটবেলায় বাঁ পায়ে চিতি সাপে ঠুকরে দেওয়ায় পায়ের আঙুলগুলো একটু ছাঁটা। তার পাখি ধরার শিক্ষিত পাখিটাকে দেখলাম, পাখি ধরার অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনলাম। সে এক অদ্ভুত জীবন, অদ্ভুত জীবিকা।[১৭]

—এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই হাউসে গল্পের জন্ম। হাঁসের ডিমের মতো ছোট্ট একটা গুড়ুর পাককে খাঁচায় ভরে বনের পথে ঘুরে ঘুরে হুড়োল তাকে বনের স্বর চেনায়, পরিচিত করে অদিম বন্য প্রকৃতির সঙ্গে। বন্য গুড়ুদের ভাষায় কথা বলে। দিনের পর দিন হুড়োলের সেই চুমানো ডাকটা ভরে দেয় খাঁচার গুড়ুরের বুকে। এই ডাক পোষা পাকের বুকে খণ্ডস্বর তৈরি করে। একদিন সেই স্বর সুর হয়ে বেরিয়ে আসে—'হু-উ হু-উ হুউ, সি-ইউ সি-ইউ সি-ইউ'। এই নিরন্তর পরিক্রমার মধ্যে গুড়ুর পাকের সঙ্গে হাউসের একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়, মনের আদান-প্রদান ঘটে। পাকটা যেমন বোঝে হাউসে মানুষের সুর, তেমনি হুড়োলও গুড়ুরের ঠোঁটে হাত রেখে বুঝতে পারে তার মনের ভাষা। মনিবের হাতে ঠোঁট ঘসে তাই সে সোহাগ করে। আবার হুড়োল যখন—

> শরীরটারে তেপাখা উনোনের মতো গুটিয়ে ফেলে চুমাতে থাকে হু-উ হু-উ হু-উ। ছুঁচলো মুখটাকে কখনো গুটিয়ে নিয়ে কখনো খুলে হাউসে ডাক দেয়—সি-ইউ সি-ইউ সি-ইউ...[১৮]

সেই সুর বুকে ভরে নিয়ে ডাক দেয়। সুরের মাদকতায় প্রেমিক বন্য গুড়ুরদের লতাপাতা ঘেরা ফাঁদে আটক করে মনিবের হাতে তুলে দেয় বাঁচার রসদ। দুজনের মধ্যে তৈরি হয় এক অদৃশ্য সম্পর্কের বন্ধন। হাউসে হুড়োল রাজনীতির রং বোঝে না, সে বোঝে বনের ভাষা। অথচ সময়ের অভিঘাত নেমে আসে তার উপরেও। ঘৃণ্য রাজনৈতিক দলাদলির শিকার হয়ে হারাতে হয় সন্তানসম গুড়ুরকে। তাই সে রাতের অন্ধকারে পাগলের মতো খুঁজে ফেরে দীর্ঘদিনের ভালোবাসার সঙ্গীকে—

> এক ঝোড় থেকে আরেক ঝোড়—সারারাত। খুঁজে ফেরে পথচলার সঙ্গীকে, খোঁড়া পায়ের চাকাটাকে, নিজস্ব স্বরের হারিয়ে যাওয়া টুকরোটাকে। চুমোয়...শূন্য বুকে ফিরে আসার জন্য সঙ্গীকে ডাক দেয়—হু-উ হু-উ হু-উ। সি-ইউ সি-ইউ সি-ইউ।[১৯]

সংসার সন্তান পরিজন কোনো কিছুই প্রকৃতির ডাক শোনা হাউসেকে বেঁধে রাখতে পারে না। মুনিনগরের মানুষেরা তাই দেখে 'গোটা আষ্টেক সাপের পেঁড়ি' নিয়ে হুড়োল চলেছে আবার এক আদিম অনিশ্চিত জীবনের পথে। ঈশান সাপুড়ে এই পথ থেকেই উপেক্ষা আর অভিমান নিয়ে মুক্তি

পেতে চেয়েছিল। কিন্তু ঈশান আর হুড়োল এক মানুষ নয়, হুড়োলের মধ্যে আছে একটা হাউসে মন, সে এই প্রকৃতিরই আদিম সন্তান। 'গোষ্ট' এমনই এক অনুভবী গল্প। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের শিক্ষক রামকুমার আর্যভবনের প্রাচীরে বসে রাখাল ছেলেদের গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া নিয়ে মাঠের প্রান্তে হারিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে অনুভব করেছিলেন রাখাল ছেলেদের সঙ্গে কিভাবে একটা পশুর অন্তরঙ্গ বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যায়। অনেকে হয়তো এ গল্পে বৈষ্ণবীয় অনুসঙ্গ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আমার মনে হয়, এ গল্প প্রখর দারিদ্র্যের গল্প। যেখানে লক্ষ্মণের মতো পরিবারের ছোটো ছোটো কিশোরেরা মহাজনের দেওয়া আধ ছেঁড়া 'টেরিলিনের জামা' পরে পরম আনন্দে নতুনের গন্ধ পায়, বাগাল ছেড়ে লাঙড়ে হয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঐ ধনী মহাজনদের লক্ষ্মণের মতো একটা অনুভবী মন থাকে না। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দলছুট বুধিকে খুঁজে পেয়ে তার গলা জড়িয়ে লক্ষ্মণ 'ভেউ ভেউ করে কাঁদে।' শীতের রাত্রে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর ভেড়ার সঙ্গে তার যে উষ্ণতার আদান-প্রদান ঘটে সেটা 'প্রায় স্বর্গীয়, অলৌকিক'। জাড়ে কাঁপা রাতে প্রসব যন্ত্রণার্ত বুধুর ভারি জমাট আলানটার মধ্যে মুখ গুঁজে লক্ষ্মণ দাঁত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দেয়—

> ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা দুধ জিভের নিচে, জিভের উপর, দুদিকের গাল, তালু ছুঁয়ে গলা বেয়ে নামে। উষ্ণ দুধে গলার নালীটা ফুলে ওঠে। শ্বাসের টানে ফুলতে ফুলতে আবার মিলিয়ে যায়। আবার ফোলে। আঠার মতো জমাট দুধ নালীর বাঁকা পথ দিয়ে একটু একটু করে নামে। নিঃশ্বাস নিতে বাঁটটা ছেড়ে দেয় লক্ষ্মণ। দ্বিতীয়টা ধরে।[২০]

উষ্ণ হয় লক্ষ্মণ, ভারমুক্ত হয় প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হতে থাকা ভেড়া। ভোর রাতে প্রসব করে দুটি বাচ্চা। একটা জীবিত, অন্যটা মৃত। টাঁড় বাংলার আকাড়া মাঘের শীত দু-পায়ে দলিয়ে লক্ষ্মণ মাতৃস্নেহে বাঁচিয়ে রাখে বাচ্চাটাকে। একটা ভেড়ার সঙ্গে তার রাখালের এই গভীর আদান-প্রদানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিতে লেখকও ধানের গোছের উপর শুয়ে ভেড়ার বাঁটে মুখ রেখেছিলেন। 'পুরু ঐ ক্ষেত, আকাড়া মাঘের শীত, বালি, পাথুরে জেলার নির্জলা তরল দুধের দৈহিক অনুভূতি ছাড়া'[২১] —গল্পটি হয়তো লেখা সম্ভব ছিল না। এই অনুভবী গল্পকারের মুখে তাই যথার্থই শোনায়—'বইপত্রে যাকে বলে 'দেশ' তা আমার কাছে ঐ জমি, ঐ শীত, ঐ ফাটলময় দুধের বাঁট'।[২২] গল্পটা শেষ করেও লক্ষ্মণের বাস্তবতাটা দেখাতে ভোলেন না রামকুমার। একটা বাচ্চা মারা যাওয়ার অপরাধে মহাজন তাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়। মহাজন বাড়ির সম্মিলিত আক্রমণের মুখে প্রতিবাদ করে ওঠে লক্ষ্মণের মা—

> 'তোদের ঘরে না থাকলি আর কি আমার ব্যাটার বাগাল খাটার ঘর নাই?'[২৩]

বাগাল খাটার ঘর অনেক আছে। সেখানে লক্ষ্মণরা আবার নতুন করে বাগাল খাটবে। না খাটলে খাবে কি? আবার কোনও ছাগল ভেড়ার সঙ্গে হয়তো তার মনের আদান-প্রদান হবে, আবারও মহাজনের কাছে প্রতারিত হওয়ার প্রহর গুনবে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় মূলত সামাজিক গল্প লেখেন। কিন্তু সেই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সচেতন ভাবে তিনি আর্থ-রাজনৈতিক উত্তাপকে বুনে দেন। কোথাও তা স্পষ্ট, কোথাও বা অস্পষ্ট —অনুভবে টের পেতে হয়। নিজেই স্বীকার করেছেন—

> আমার বেড়ে ওঠা বাঁকুড়া জেলার গ্রামে, রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে।

...কৈশোরের ঐ পর্বে ষাটের দশকে ভাগচাষী ও কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধছে। ক্ষেতে খামারে সংঘর্ষ, পুলিশের আনাগোনা। গোরার নগর ভ্রমণের পাশাপাশি প্রায় নিত্যদিনের রাজনৈতিক মিছিল। বৈষ্ণবীয় খোল আর রাজনৈতিক মাদল দুটোরই গ্রাম পরিক্রমা চলে। বাদ্যযন্ত্রের বোলের টান এবং কৈশোরের কৌতুহলী আবেগ আমাকে দু মিছিলেই হাঁটিয়েছে।[২৪]

'রাজনৈতিক মাদলে'র চরিত্র সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া যাক। ভারতবর্ষে ষাট ও সত্তরের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, খাস জমি বন্টন, বর্গাস্বত্ব, খাদ্য, উপযুক্ত মজুরি নিয়ে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের জোয়ার আছড়ে পড়েছিল প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে। যদিও এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ভাগচাষি, ভূমিহীন কৃষক, মজুরেরা প্রতিবাদের স্বর ও সুর খুঁজে নিয়ে মিলিত হচ্ছিল একটি সংগঠিত শক্তির ছত্রছায়ায়। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সেই সংগঠিত শক্তি। তাই ১৯৫০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত 'কৃষকসভা'র নেতৃত্বে শুরু হয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, বর্গাদার আইনের উচ্ছেদ, ভূমি সংস্কারের জন্য কংগ্রেস সরকার একটি ভূমি সংস্কার বিল পেশ করে। কিন্তু সেখানে ভাগচাষি, মজুরদের অধিকারের কথা থাকলেও—'ভূমি মালিকদের পক্ষে ফাঁকির সুযোগ এত বেশি রাখা হয়েছিল যে, তার দ্বারাও বর্গাদার সহ খোদ কৃষকের কোনও উপকার হয়নি। গ্রামাঞ্চলে কাজের সংস্থান বাড়েনি এবং বেআইনি নানা আদায় ও অত্যাচারের নিরসন ঘটেনি।'[২৫] এরপর ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট সরকার' ক্ষমতায় এসে ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্টন, জমির মালিকানা প্রদান, মজুরি ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী সাফল্যের পিছনে এই ইস্যুগুলোই ছিল প্রধান। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল চাপের মুখে আবারও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। তবে একথা সত্যি যে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল দ্রুত। কৃষকরা সংগঠিত হয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। জোতদার মহাজনদের উৎখাত করতে 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার' নীতি নিয়ে নকশাল আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। এরকম চূড়ান্ত রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে 'অপরেশান বর্গা' কার্যকরী করা, জোতদারদের সিলিং বর্হিভূত অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা, বর্গাজমিতে উৎপাদিত ফসলের তিন-চতুর্থাংশ বর্গাদারদের প্রাপ্য হিসাবে নিশ্চিত করার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাতে অসংখ্য নিরন্ন ভূমিহীন মানুষ, ভাগচাষিরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। তবে—

একথাও সত্য যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী বিপুল অধিকাংশ কৃষক ও কৃষি মজুরের কোনও সমস্যার সমাধান এই সংস্কারের দ্বারা হয়নি।...সরকার পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মজুরদের জন্য একটা নিম্নতম মজুরি ধার্য করে দিলেও তা কার্যকর করা খুব অল্প এলাকাতেই সম্ভব হয়েছে।[২৬]

বেঁচে থাকার মতো সামান্য খাদ্য, মজুরি না পেয়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা ক্রমশ রুগ্ন হতে শুরু করে। আর জমির মালিকেরা, জোতদাররা আইনের ফাঁক খুঁজে দিন বদলের প্রহর গুনতে থাকে। আবার সরকারি নীতির জেরে জমির মালিকেরা ভাগচাষি, মজুরদের উপর আগের মতো আর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। ফলে ভূমিহীন কৃষকেরা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। রামকুমারের গল্পে সেই বাস্তবতার

ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা' গল্পে বনমালীর 'সবার জমি এক হবে শুনে বড় লোভ হয়েছিল।' কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। জনমজুরের কোনও রেকর্ড না থাকায় শ্রমের বিনিময়ে সে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায়নি। বাঁকুচাঁদেরও নিজস্ব কোনও জমি নেই। ভি. আই. পি সুটকেস মাথায় নিয়ে কলকাতার বাবুকে দিনমজুর বাঁকু শুনিয়েছে বর্গা রেকর্ডের বাস্তব ইতিহাস—

> তিন বিঘে জমি রেকর্ড করতে বেচু পালের তের বছর লেগেছিল।...এ পার্টি সকালে মিছিল করে তো ও পার্টি বিকেলে।[২৭]

যদিও বাঁকু অবস্থা পরিবর্তনের গল্প শোনায়। বর্গা রেকর্ড এখন 'জলভাত' বলে মনে করে, কিন্তু মনে হয় পরিস্থিতিটা অতটা সহজ ছিল না। তাহলে বাঁকুর মতো হতদরিদ্র মানুষ ভূমিহীন থাকবে কেন? 'মাদলে নতুন বোল' গল্পে যে মাদল বেজে উঠেছে তা পরবের মাদল নয়, প্রতিরোধের মাদল। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির মুখে উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে লড়তে লড়তে পিঠ ঠেকে যাওয়া বিক্রম, বিজয়, সোনা, কাশীর মতো হতদরিদ্র সাঁওতাল মজুরেরা মজুরি বৃদ্ধির প্রতিবাদে মালিক-পক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছে। বিক্রম বলে—

> কতবার আর বুলবো দু টাকা বেতনে চলবি না। চালের দর এক টাকায় আড়াইপো। মজুরী বাড়াতে হোবে। তা লইলে খাটতি যাবুনি।[২৮]

বিক্রমকে সামনে রেখে প্রতিরোধের লড়াইয়ে বুক বেঁধেছে সমস্ত সাঁওতাল পাড়া। প্রতিরোধের শক্তিকে টুঁটি টিপে ধরতে এগিয়ে এসেছে অবস্থাপন্ন জমির মালিক, জোতদারা। সাঁওতাল পাড়ায় তাই কেউ বাজার না পেয়ে নিরন্ন উপবাসী জীবন অতিবাহিত করে। একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, সাঁওতালপাড়ার প্রতিরোধের সাধ আছে, সাধ্য নেই। খালি পেটে তো আর বিপ্লব হয় না! তাই দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বিক্রম নিজের স্ত্রী, শিশু পুত্রের মুখে তুলে দিয়েছে বিষ। প্রতিরোধের লড়াই যেমন সত্য, দারিদ্র্যের অসহায়তা আরও বড়ো সত্য। রামকুমার প্রত্যক্ষ বাস্তবতার দুই এই সত্যানুসন্ধানী গল্পকার। 'মৌজা ডোমপাটি' গল্পে বিক্রমের মতো প্রতিবাদের শক্তি ছিল না মৌজা ডোমপাটির পাঁচ বিঘের ভাগচাষি বিনোদ ডোমের। বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে নকশাল আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠলে ছোটো মোহান্তর বন্দুকের নল নিঃশব্দে উঠে আসে বিনোদের বুকে। ফ্লুট বাজানো বুকে সুর থাকলেও সাহস ছিল না। তাই জমি, সম্পত্তি সমস্ত ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু প্রতিবাদের যে আগুন সমস্ত জেলা জুড়ে জ্বলে উঠেছিল তাতে বিনোদের মতো অসংখ্য ভাগচাষিরা রুখে দাঁড়িয়েছিল সর্বশক্তি দিয়ে। তাদেরই গুলিতে বড়ো মোহান্ত খুন হতে জামকুড়িতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পর ডাডানে'র মেলায় ভবদা'র কাছ থেকে এই ইতিহাস শুনে বিনোদের 'জমির সঙ্গে সহবাসের' বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। দেশি মদের উগ্র নেশায় রাতের অন্ধকারে পায়ে-পায়ে বিনোদ পৌঁছে যায় তার ভালোবাসার তীর্থক্ষেত্রে। ফুলোটে ফুঁ দেয়, প্রহর বদলের সাথে সাথে সুরেলা বাতাস ছড়িয়ে পড়ে মৌজা ডোমপার্টির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। ক্রমে রাত তরল হয়, বিনোদের নেশাও ফিকে হতে থাকে, উপলব্ধি করতে পারে ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসের অভিজ্ঞান। মোহান্তদের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হওয়া জমি আবার কোনো মহাজনের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে—'কে চিনবে তাকে? চিনেই বা কি হবে।' বিনোদ তাই রাতের অন্ধকারে চোরের মতো পালিয়ে আসে জন্মভূমি থেকে। প্রত্যক্ষ জবানিতে লেখক স্বীকার করেছেন সেই বাস্তবতার কথা—

> 'মৌজা ডোমপাটি' গল্পটি লিখতে গিয়ে কথা আর সুরের এই বিপরীত অবস্থানকে

ধরতে চেয়েছিলাম। বুঝতে চেয়েছিলাম একটি ফ্লুটের বুকের ভেতর আমাদের দেশ, সময়, সমাজ ও অর্থনীতির কত কিছু ভরা থাকে।[২৯]

—এই পর্যন্ত লিখে ফেলে একটা প্রশ্ন বারে বারে মনকে আঘাত করছে, তাহলে কি ষাট-সত্তরের দশকে এত সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন, মজুর-শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, '৭৭-এর রাজনৈতিক পালাবদল তার কোনও প্রভাব কি প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে পড়েনি? ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ কি তাহলে সমস্তই ভ্রান্ত? না। পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে, তবে সেটা বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক, ভাগচাষি, বর্গাচাষি, জনমজুরের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আটের দশকে গ্রাম বাংলায় উন্নতি হয়েছে অনেক। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়েছে, কৃষিকাজে পৌঁছে গেছে রাসায়নিক সার, উন্নত মানের উচ্চফলনশীল বীজ, ট্রাক্টর, একফসলি জমিকে দোফসলি জমির উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। স্যালো পাম্প থেকে পৌঁছে গেছে চাষের উপযুক্ত জল, কৃষিকাজের জন্য নানা ঋণ প্রকল্প, ছোটোখাটো কুটির শিল্পে মানুষ আর্থিক নিরাপত্তার মধ্যে স্বনির্ভর হয়েছে—রামকুমারের কলম নিরপেক্ষ সাহিত্যিকের দায় এড়াতে পারেনি। দারিদ্র্য-অসহায়তার মাঝে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতাকেও তিনি দেখাতে ভোলেন না। 'শরীরের ভাঙা গড়া', 'সখিনা', 'চরৈবেতি' গল্পে অত্যন্ত সচেতনভাবে সমাজ ও মানুষের পরিবর্তিত রূপ স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। 'শরীরের ভাঙা গড়া' গল্পে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য ফুলমণির জন্য বিডিও এবং সভাধিপতি গ্রামের পরিস্থিতি খোঁজখবর নিতে পঞ্চায়েত অফিসে অপেক্ষা করে। কিন্তু বোরো চাষের সময় ফুলমণির এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। চাষের কাজ সেরে ফুলমণি যখন পঞ্চায়েতমুখো তখন অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত বিডিও বাড়ির পথ ধরেছে। বোঝা যাচ্ছে ফুলমণিরা তাদের নিজস্ব প্রত্যয় ফিরে পাচ্ছে ক্রমশ। পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তাই ফুলমণিকে সমীহ করে চলে। গ্রামে গ্রামে কৃষিকাজের জোয়ার লেগেছে—'ধান উঠছে, লাঙল পড়তে পড়তে আবার চৈত-বৈশাখ। ডানপাশটাতে বেশ কখানা শ্যালো বসেছে, সেই সুবাদে বোরো রোওয়া। কেউ তিল কাটছে। বেশ খানিক দূরে একটা হ্যান্ড ট্রাক্টর পাক মারে।'[৩০] বোঝাই যাচ্ছে এ পরিবর্তিত গ্রাম বাংলার ছবি, যেখানে মানুষ ভিডিও দেখে অবসর বিনোদন করে। গরু কেনার জন্য, মুড়ি ভাজার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে লোনও পাচ্ছে নিতাইয়ের মতো হতদরিদ্র চাষি, হুড়োলের মতো হাউসে মানুষেরাও। 'সখিনা' গল্পে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইটা আরও স্পষ্ট। সখিনা আর মজিদ এই মুসলিম দম্পতি সামাজিক উপেক্ষা সত্ত্বেও 'বেল কুঁচড়ির' ধর্মীয় মালা গেঁথে গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছে। স্বাধীন শ্রমের টাকায় কারো গায়ে উঠেছে 'লাল গেঞ্জি, কারো পায়ে চটি'। পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের জীবনযাপন। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা মজিদ পঞ্চায়েতের খাস জমির মালিকানা পেয়েছে। গরু পাইকেরির পারিবারিক ব্যাবসা ছেড়ে সখিনাকে সামনে রেখে মজিদের মতো অসংখ্য মানুষ নিজেদের Identity খোঁজার লড়াইয়ে নেমেছে। বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকের প্রথম দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খোঁজা যে সমস্ত মেয়েরা উঠে এসেছে রামকুমারের গল্পে 'চরৈবেতির' গোপা তাদেরই সার্থক প্রতিনিধি। ফুলমণি পেয়েছে রাজনৈতিক Identity, সখিনা অর্থনৈতিক আর গোপা খুঁজেছে সামাজিক Identity। এ গল্পেও আশি-নব্বইয়ের দশকে পরিবর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ধরা পড়েছে। শ্বশুরবাড়িতে গোপার খাওয়া-পরার কোনও অভাব ছিল না, বাড়িতে বন্দুক থাকায় অভাব ছিল না সুরক্ষারও; অভাব ছিল ভালোবাসার। রবির ছ-কুঠুরির পাকা দালানের সুনিশ্চিত ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও গোপা তাই

'অশোকবনের বন্দিনী'। গোপা চেয়েছিল একটা প্রেমিক মানুষ, যে তাকে স্বীকৃতি দেবে, ভালোবাসবে। অথচ রবি তাকে আর্থিক সুরক্ষা দিয়েছে। মুক্ত বিহঙ্গ গোপা তাই নিজের Identity খুঁজতে বৈষ্ণব দীক্ষাগুরুর সঙ্গে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। হাতে একতারা, গায়ে গেরুয়া বসন, আর কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে—'মথুরা থেকে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে পুরী, পুরী থেকে নবদ্বীপ, নবদ্বীপ থেকে ভিলাই...'[৩১] এর পথে ঘুরে ঘুরে গোপা সেই অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজে ফেরে। এ গল্পের মধ্যে রয়েছে একটা বৈষ্ণবীয় ফ্রেম কিন্তু সেই ফ্রেমের মধ্যে একটা নারীর আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইটা বড় হয়ে উঠেছে।

এবার রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের লিখন শৈলী নিয়ে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে। তার আগে দেখব লেখক নিজে কি বলছেন—

> গল্প উপন্যাস লেখা কঠিন, না লেখা আরো কঠিন। হঠাৎ কোন এক অদ্ভুত দৃশ্য, আশ্চর্য ঘটনা, খুচরো কথা, বেহিসাবী স্থান, নাম মনের দরজায় কড়া নাড়ে। ...বিষয় আসে নানা ভাবে অনেক সময় অতর্কিতে। কিন্তু যা নিয়ে আমার প্রধান মাথাব্যাথা তা হল ভাষা, মাধ্যম, শৈলী–এককথায় নির্মাণ।[৩২]

গল্পের নির্মাণে রামকুমার ভীষণ হিসেবি এবং সংযত। প্রথমেই আসি ভাষা প্রসঙ্গে। তাঁর গল্পের যে dialect তা মূলত পূর্ব বাঁকুড়ার। গল্পের মধ্যে তিনি ব্যবহার করেন অনেক আঞ্চলিক টার্ম—যেমন 'হেতের' (ধারালো কাটারি বিশেষ), 'হুড়োল' (বনবিড়ালের মতো এক ধরনের জন্তু) 'কাঁচি মদ' (দেশি মদ), 'বাগাল' (রাখাল) 'মরাই' (ধান রাখার জায়গা) যেগুলো গল্পের detail নির্মাণে সাহায্য করে। গল্প বলার সময় মনে হয় তিনি যেন চরিত্রের মধ্যে পুরোপুরি সেঁধিয়ে যান। আর সেখান থেকে অনবরত রেকর্ডারের মতো গল্পের পর গল্প বলে চলেন। তাই সুচাঁদ বা বাঁকুর গেরস্থালির কথা শুনতে শুনতে আমরা জেনে যাই সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটকে। গল্পবলার ভঙ্গিটাও খুব আন্তরিক। তাই প্রতিটা চরিত্রকে খুব কাছের মানুষ, আপন মানুষ, চেনা মানুষ বলে মনে হয়। নিজেকে বারবার ভেঙে গড়তে ভালোবাসেন তিনি। এই ভাঙা-গড়ার মধ্যে আঙ্গিকের নতুন-নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। কখনো সরাসরি, কখনো পত্রাকারে, কখনো কথপোকথনের ভঙ্গিতে বক্তব্য প্রকাশ করেন। তবে সবার পিছনে থাকে এক অদৃশ্য জাত কথক, যিনি রঙে-রসে সর্বদা গল্পের উপাদান জোগান দিয়ে যান। এই অভিনব আঙ্গিকটি তিনি পেয়েছিলেন 'গল্পবুড়ি' দিবাকর পিসির কাছ থেকে। নিজে স্বীকার করেছেন সেই ঋণের কথা,—

> আমার গল্প কথনের ভঙ্গিটি কথকতার। এই রীতিটি আমি পেয়েছিলাম দিবাকর পিসির কাছ থেকে। পিসির মতো শব্দের এমন পাকা কারিগর আমি আজ অব্দি দেখিনি।[৩৩]

ক্রমবর্ধমান গণমাধ্যমের রঙিন ছোবলে দিবাকর পিসিরা আজ বোকা বাক্সতে বন্দি। আজ ই-মেল, ফেসবুক, টুইটারের যুগ। দিবাকর পিসিদের গল্প বলার সময়ই নেই। আমাদের ভাগ্য ভালো রামকুমার দিবাকর পিসির সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, নতুবা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ও বাস্তবতার কথকতা থেকে একালের পাঠক বঞ্চিত হত। আর একটি বিষয়ও এ প্রসঙ্গে একটু বলে নিই—'কথকতা' হল প্রাচীন গল্প বলার রীতি। যেখানে খুব সহজেই কোন গুরুগম্ভীর আখ্যানকে খুব হালকা চালে শ্রোতার মনের গভীরে পৌঁছে দেওয়া যায়। সে কারণেই 'বাঁকুচাদের গেরস্থালী'র মতো দীর্ঘ গল্প পড়তে গিয়ে আমাদের ক্লান্তি আসে না, বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের প্রশাসনিক

কর্তাব্যক্তিদের কাছে চিঠি লেখেন মেদ্দা মহাশয়। গণতন্ত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির অনেক জটিল সমস্যার সমাধান, প্রতিবিধানও দেখিয়ে দেন অত্যন্ত সহজ ভাবে। রামকুমার এই নিজস্ব ঘরানার সার্থক স্রষ্টা এবং পথপ্রদর্শক।

শুধুমাত্র নির্মাণশৈলী নয়। গল্পকার রামকুমারের সামাজিক দায়বদ্ধতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর নিজের কথায় 'আমি আমার গল্প উপন্যাসে খুব rooted থাকতে চেয়েছি।'[৩৪] যে কোনও সচেতন শিল্পীর কাছ থেকে এটা কিন্তু আমাদের বড়ো পাওনা। অনেক সময় দেখা যায় কোনও রাজনৈতিক মতবাদ বা মতাদর্শের কাছে নতিস্বীকার করতে করতে লেখকরা root থেকে ক্রমাগত সরতে থাকেন, একসময় হারিয়ে যান। রামকুমারের গল্পে সেটা হয়নি। একজন নিরপেক্ষ সাহিত্যিকের দায় থেকে তিনি কোনওভাবেই সরে আসেননি। তাই তাঁর গল্পে কাঁকুরে মাটির রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে বাস করা মানুষদের দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, আনন্দ-হতাশা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের বেদনার ছবিকে যেমন প্রত্যক্ষ করতে পারি, তেমনি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত গ্রামজীবনের স্পন্দনকে সহজেই অনুভব করা যেতে পারে। ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেওয়া ষাট, সত্তর, আশির দশকের বড়ো বড়ো আন্দোলন, রাজনৈতিক পালাবদলের শেষে মানুষ কতখানি তাদের প্রাপ্য অধিকার পেল, সেই বাস্তবতার অন্বেষণে রামকুমারের লেখনী সবসময় সজাগ থেকেছে। তিনি তাই একালের এক ব্যতিক্রমী, দরদি কথাকার। বিশ শতকের নয়ের দশকের পর থেকে রামকুমারের গল্পলেখায় ক্রমশ ভাটির টান ধরেছে, সচেতন পাঠক হিসাবে সেই মরা গাঙে ভরা জোয়ারের আশায় আবার আমরা বুক বাঁধলাম।

তথ্যসূত্র

১. M.H. Abrams. *A Glossary of Literary Tearms.* Seventh Edition. Thomson Heinle. Page-194.

২. অমর মিত্র, 'নিরন্তর পরিক্রমা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা -২০০৫।

৩. 'বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা', শ্রেষ্ঠ গল্প, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা -২০০৫, পৃ. ৭০-৭১।

৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'ফুল্লরার বারমাস্যা', *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রিত, অক্টোবর, ১৯৯৬, পৃ. ২৫৮।

৫. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালী', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৫, পৃ. ৩১।

৬. তদেব।

৭. ঐ, পৃ. ৩৭-৩৮।

৮. ঐ, পৃ. ৩৯।

৯. ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬।

১০. ঐ, পৃ. ৫৯।

১১. তদেব।

১২. স্বপন পাণ্ডা, 'বাবু রামকুমার মুখুজ্যার কথকতা বিষয়ে যৎসামান্য', *শুভশ্রী পত্রিকা* : নিম্নবর্গের মানুষ বাংলা কথাসাহিত্য, সম্পাদক-পুলুকুমার সরকার, বহরমপুর, ২০০৬-২০০৭, পৃ. ২৫৩।
১৩. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা প্রসঙ্গে, ৫/১১/১২।
১৪. 'পিকনিক', *মাদলে নতুন বোল,* রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪, পৃ. ৩২।
১৫. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা প্রসঙ্গে, ৫/১১/১২।
১৬. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'দায়বদ্ধ', *মাদলে নতুন বোল,* গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, পৃ. ৩২।
১৭. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা প্রসঙ্গে, ৫/১১/১২
১৮. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'হাউসে', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৫, পৃ. ১৫৩।
১৯. ঐ, পৃ. ১৬৩।
২০. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'গোষ্ঠ', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ. ৫১।
২১. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আমার লেখালেখি', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫।
২২. তদেব।
২৩. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'গোষ্ঠ', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ. ৫৪।
২৪. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', *রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালা-১২,* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০২।
২৫. বদরুদ্দিন উমর, 'সত্তর দশকের কৃষক আন্দোলন', *সত্তর দশক,* প্রথম খণ্ড, সম্পাদক-অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, পৃ. ৬৯।
২৬. ঐ, পৃ. ৯০।
২৭. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালী', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ. ১৯।
২৮. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'মাদলে নতুন বোল' *মাদলে নতুন বোল,* গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, পৃ. ৯৭।
২৯. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আমার লেখালেখি', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫,
৩০. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শরীরের ভাঙা-গড়া'; *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ. ১৮৫-১৮৬।
৩১. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'চরৈবেতি', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ. ১৩৯।
৩২. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আমার লেখালেখি', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৫।

৩৩. তদেব।

৩৪. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা প্রসঙ্গে, ৫/১১/১২।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। *কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ' দশ বছর/১৮৯১-২০০০।* তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৪। দে'জ পাবলিশিং।

২. রামকুমার মুখোপাধ্যায়। *শ্রেষ্ঠ গল্প।* প্রথম প্রকাশ, ২০০৫। কলকাতা বইমেলা। করুণা প্রকাশনী।

৩. রামকুমার মুখোপাধ্যায়। *রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালা/*১২। দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০০২। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. রামকুমার মুখোপাধ্যায়। *মাদলে নতুন বোল*। প্রথম প্রকাশ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪। গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী।

৫. M.H. Abrams. *A Glossary of Literary Tearms*. Seventh Edition. First Reprint, 2006. Thomson Heinle.

সহায়ক পত্রিকা

১. *এবং মুশায়েরা :* গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক : সুবল সামন্ত। ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৯৯৯।

২. *পশ্চিমবঙ্গ* : পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা। সম্পাদক : নিলয় ঘোষ ও সুপ্রিয়া রায়। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৪০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা। জুন, ২০০৭।

৩. *পশ্চিমবঙ্গ* : বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা। সম্পাদক : তারাপদ ঘোষ ও অজিত মণ্ডল। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৪০৯।

৪. *শুভশ্রী পত্রিকা* : নিম্নবর্গের মানুষ বাংলা কথাসাহিত্য। সম্পাদক-পুলুকুমার সরকার। বহরমপুর, ২০০৬-২০০৭।

ইলেকট্রা গ্যারিগো ও হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা : ধ্রুপদী নাটকের কালোচিত অবিনির্মাণে সম-সময়ের অভিঘাত

রজত দত্ত

মানুষের ইন্দ্রিয় যা প্রত্যক্ষ করে তাতে সময় নদীর জলধারার মতো কেবল বয়েই চলেছে কিন্তু সেই স্রোতের সৃষ্টি ও মোহনায় মিলন কবে তা আমরা কেউই জানি না, আন্দাজ করতে পারি এক নিরবচ্ছিন্ন চলমান অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের চৈতন্যের সম্পর্ক। আমাদের চেতনা জগতের যান্ত্রিকতার নিয়মকে উপলব্ধি করতে পারে, কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারে, পারে না কেবল জগৎস্রষ্টাকে খুঁজতে। আমরা দেখি একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তখন ঘটে পরিবর্তন। এই জগৎ-সংসারের বারংবার পরিবর্তন মানুষের মধ্যে যাঁরা সৃষ্টিশীল তাঁদের চৈতন্যে অভিঘাত সৃষ্টি করে, জন্ম নেয় শিল্প-কলা, বিশেষ জ্ঞান। নাটক ও নাট্যসাহিত্য ওই শিল্প সৃষ্টির এক অনুপ্রেরণা বা মাধ্যম। সবিশেষ নাটক যখন সমকালীন শিল্পকর্ম এবং দৃশ্যকাব্য, সমসময়ের অভিঘাতকে চিহ্নিত করা তার দায়। এই অভিঘাত মূলত অতীত ও বর্তমানের সংশ্লেষ-বিশ্লেষ। সময়ের প্রবাহ এতই বিচিত্র যে মনে হতে পারে তার মধ্যে বদ্ধতা বা স্থবিরতা জমে রয়েছে, তখন মানুষ নিজের প্রয়োজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে আত্মবিশ্লেষণে, আত্মসন্ধানে। প্রকৃতপক্ষে, আজকে যা 'ট্রুথ', আগামীকাল আরেকটি 'রাদার ট্রুথ' এসে তার স্থান দখল করে নেয়। তখন মনে হতে পারে অতীতের সবকিছু মিথ্যা, আজকের সব সত্যি। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সমালোচক দেখেন সেদিনের সাপেক্ষে 'ট্রুথ' ঠিক ছিল এবং আজকের সময়ে 'রাদার ট্রুথ'-ও ঠিক। তাই বিশেষ কালপর্বে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনার স্তরে গভীর স্পন্দন তৈরি হয়, সাহিত্যে বা নাটকে তার অনুরণন স্বাভাবিক। একজন নাট্যকার যে জীবনযন্ত্রণা অনুভব করেন বা তাঁর মানস-অভিধানে যে শব্দসমুচ্চয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাবলীল প্রক্রিয়ায় আত্মদর্শনে সচেষ্ট হয়, তাই-ই ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সংলাপে ঋদ্ধ হয়ে নাট্যসৃজনে রূপায়িত হয়—কখনো তা মৌলিক সৃষ্টি অথবা কখনো অবিনির্মাণ, কিন্তু কেন? সেই উত্তরের সন্ধান দেয় সমসময়ের অভিঘাত।

একুশ শতকের বর্তমান কালপর্বে সমসময়ের অভিঘাত নির্ণয়ে নির্বাচিত হয়েছে দুই দেশের দু'টি নাটক। প্রথমটি লাতিন আমেরিকার কিউবার ভার্জিলিও পিনেরা-র 'ইলেকট্রা গ্যারিগো' এবং অন্যটি হল বাংলা ভাষার নাট্যকার ব্রাত্য বসুর 'হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা'। সুদূর দুই দেশের দু'টি নাটক আলোচ্য হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হল বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে দু'টি নাটকই অবিনির্মাণ। ভার্জিলিও পিনেরা গ্রীক ভাষার অতি প্রবীণ নাট্যকার সোফোক্লেসের 'ইলেকট্রা' নাটকটিকে তাঁর বিনির্মাণের বিষয় করেছেন। ব্রাত্য বসু তাঁর নাটকের বিষয় নির্বাচনে লক্ষ্যে রেখেছেন ইংরাজি ভাষার মহান নাট্যকার শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকটি। আজকের সময় দুই দেশের দুই নাট্যকারকে কীভাবে অবিনির্মাণে উৎসাহিত করেছে, তা-ই এই আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা নেবে। লক্ষণীয় বিষয়, দুই দেশের নাট্যকারের দুই ভিন্ন ভাষার মিথ বা ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণের প্রাণনার মধ্যেই নিহিত আছে উত্তর উপনিবেশিক অবস্থান ও উত্তর আধুনিক মনন। দুই দেশের

দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের অবসানে স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীনতা পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গ, গণতন্ত্রের মুখোশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, সংগ্রাম-রক্তক্ষয়, অব্যবহিত অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির সরকার এবং সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক উদারীকরণ : বিশ্বায়ন সামাজিক কাঠামোর তলদেশে গভীর স্পন্দন তৈরি করে। মার্কসবাদের মূল সূত্র অবলম্বনে সমাজের অধঃস্তরের কম্পন উপরিস্তরে আনে পরিবর্তন ও বিবর্তন। এই বিবর্তনের শরিক হয়েছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ বা মুক্তি কামনা। আর ব্যক্তি যখন প্রত্যক্ষ করে আত্মীয়তার বা রক্তসম্বন্ধের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শাসক ও শাসনের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গোপন উদ্দেশ্যর হুবহু মিল, তখন ব্যক্তি চেতনার ধ্বস্ত অবস্থান থেকে সে হয় প্রতিবাদী অথবা প্রতিপক্ষের ক্ষমতায় সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের চেতনায় আস্থা হারায় এবং আত্মঘাতী হয়। সমসময়ের এই অভিঘাতে এক হয়ে যায় কিউবার হাভানা শহর ও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং এই দুই শহরের দুই নাগরিক ইলেকট্রা ও হেমলাট। এই দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রের বর্তমান সময়কে দেখার মনোভঙ্গি ও জীবনদর্শন প্রসূত নাট্যবিষয়ের সংশ্লেষ দুই দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমাজ বিবর্তন প্রবণতা, আঞ্চলিক ভাষা-জাতির অভিজ্ঞানের নবরূপ পরিগ্রহণ, রাজনীতির বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ও অন্তর্লীন আর্থ-সামাজিক কার্যকারণ চেতনার মান নির্ণয় করবে তৌলমূল্যে এবং জীবনযাপন-ধর্মের জায়মান সত্তার অভিন্নতায় নির্ণীত হবে সমসময়ের অভিঘাত।

লাতিন আমেরিকান নাট্যকার ভার্জিলিও পিনেরা-র (১৯১২-১৯৭৯) 'ইলেকট্রা গ্যারিগো' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ অক্টোবর এবং ফ্রান্সিসকো মরিন, একজন যুবা কিউবান-এর নির্দেশনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় ঐ বছরেই। ১৯৫২ সালে কিউবার রাষ্ট্রপতি ফালজেনসিও বাতিস্তা নাটকটিকে সংবর্ধিত করেন কিন্তু পরবর্তীকালের শাসকদের দ্বারা এই নাটকটি বিভিন্ন সময় বাতিল হয়েছে বা নিষিদ্ধ হয়েছে। যদিও 'ইলেকট্রা গ্যারিগো' আজও আধুনিক কিউবার নাটকরূপে উপস্থাপিত হয়ে চলেছে, সঙ্গে জুটেছে বহু বিতর্ক। এটি এমন এক সংগঠিত নাটক যা আধুনিকতার মূলগত ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে, অতীতের প্রতি যাবতীয় শ্রদ্ধাকে নস্যাৎ করে এবং মুক্তচিন্তার দুনিয়ায় এই নাটক ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। গত শতকের শেষ দিকে ১৯৯৭ সালে রাউল মার্টিন এবং টিয়েট্রো দে লা লুনা 'ইলেকট্রো গ্যারিগো' নাটকটিকে নতুন চেহারায় মঞ্চস্থ করেন এবং তারপর থেকে আজকের কিউবায় এই নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাটকে পরিণত হয়েছে। ২০০১ সালে কিউবার হাভানা শহরে মঞ্চস্থ এই নাটকের সংস্করণ আমাদের আলোচনায় গৃহীত হয়েছে যেখানে এই নাটক আজকের অ্যাফ্রো-কিউবান সংস্কৃতির পরিচয়ে ঋদ্ধ। ভার্জিলিও পিনেরা নাটকটি স্পেনীয় ভাষায় রচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে মার্গারেট কার্সন-এর ইংরেজি অনুবাদ এই নাটককে বিশ্বের অধিকাংশ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। নাটকটির সময়োপযোগী সংস্করণ আজকের কিউবার পরিবর্তিত সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। সম সময়ের অভিঘাত নাট্যনির্দেশকের মনে যে ভাবনার বিনির্মাণ ঘটায়, তার জেরেই তিনি নাটকটিকে সমকালীন করে নেন। এই প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ যে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে রচিত এই নাটক তার বিষয়বস্তুতে বা পুরাণের অবিনির্মাণে একটি দেশের দীর্ঘসময়ে ক্রমায়াত সংস্কৃতি বা দেশের মানুষের বোধে যে উত্তর-আধুনিক চেতনার স্ফুরণ তার শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটিয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, কিউবান নাট্যকার ভার্জিলিও পিনেরা 'ইলেকট্রা গ্যারিগো' রচনার সময়ে যেভাবে সমসময়ের অভিঘাতকে সংলাপে স্থাপন করেছিল তা আজকের কিউবার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহুলাংশেই যথার্থ, আমাদের ঐ যাথার্থ্য অন্বেষণে নিবিষ্ট হবে।

গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লেস (৪৯৬-৪০৫ খ্রি: পূ:) গ্রীক মিথ অবলম্বনে 'ইলেকট্রা' নাটকটি রচনা করেছিলেন এবং গ্রীক নাটকে দেবতার পরিবর্তে মানুষের চরিত্রই প্রধান আকর্ষণের বস্তু বলে চিহ্নিত হয় ঐ প্রথম। নায়ক ওরেসতেস দেবতার নির্দেশ পেয়ে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বহুদিন পরে দেশে ফেরে। তার বোন ইলেকট্রা পিতার মৃত্যুর পর কৌশলে ভাইকে রাজধানী মাইসিনী থেকে বহু দূরে ফোকিস রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। সেই থেকেই বোন ইলেকট্রা অপেক্ষা করতে থাকে যে একদিন ভাই ফিরে এসে তার পিতার নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ইলেকট্রা সোফোক্লেসের নাটকে কোরাসের সাহায্যে তার ট্র্যাজেডির কথা দর্শকদের জানায় যে তার পিতা রাজা আগামেনন খুন হন স্ত্রী অর্থাৎ মা ক্লাইতিমনেস্ত্রা ও তার (মায়ের) প্রেমিক আইগিস্থস-এর ষড়যন্ত্রে এবং সে আশা করে ওরেসতেস তাকে বন্দিদশা থেকে নিশ্চয়ই একদিন মুক্ত করবে। নাটকের শেষে ছদ্মবেশী ওরেসতেস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে মাকে হত্যা করে। ইলেকট্রা স্বাধীন হয় এবং রাজসিংহাসন পুনরুদ্ধার হয়। এই নাটকের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পেডাগোগস, তার বুদ্ধিতে ও সাহচর্যে ওরেসতেস পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে সঠিকপথে চালিত হয়।

ভার্জিলিও পিনেরা-র 'ইলেকট্রা গ্যারিগো' নাটকটি কিন্তু একটি বিনির্মিত রূপ। এখানে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের কর্তা আগামেনন ষাট বছরের এক বৃদ্ধ এবং তার স্ত্রী ক্লাইতিমনেস্ত্রা একজন সুন্দরী যুবতী নারী, যার একজন প্রেমিক আছে—আইগিস্থেস ডন। ক্লাইতিমনেস্ত্রা ছেলে ওরেসতেসকে শত্রু ভেবে হত্যা করতে চায়নি বা মেয়ে ইলেকট্রাকে বন্দি করেও রাখতে চায়নি বরং ওরেসতেস্‌কে এত স্নেহ দিয়েছেন যে সে সাবালক হতে পারেনি এবং ইলেকট্রাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে চান। তারপর স্বামী আগামেমননকে সরিয়ে দিতে পারলেই যুবা প্রেমিককে নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে পারতেন। সোফোক্লেসের নাটকের বিশ্বস্ত চাকর পেডাগোগস এখানে 'টিউটর', যে নির্বোধ ওরেসতেসকে ও বুদ্ধিমতী ইলেকট্রাকে শিক্ষা দেন যে এই প্রাণিজগতে সবকিছুই একটা ঘটনামাত্র এবং প্রয়োজনের সূত্রেই ক্ষমতার চূড়ান্তরূপ নির্মিত হয়। এই সংরূপ আজকের হাভানা শহরের, যেখানে দেবতারা মৃত, ইলেকট্রা সরাসরি তার স্বগতোক্তি করে সকল অপদেবতার উদ্দেশে এবং সকল ঐশ্বরিক শক্তি, সকল পুরাণ ও পৌরাণিক চরিত্র, সবরকম শ্রদ্ধা থেকে সে বহু দূরে। পিনেরা-র এই নাটকের মূল কথাই হল বাবা-মায়ের দেওয়া কুক্ষিগত আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। মা ছেলেকে ঘরের বাইরে বেরোতে দেয় না দুর্ঘটনার ভয়ে অথচ নিজের কামনার স্বার্থে বৃদ্ধ স্বামীকে হত্যা করে। অন্যদিকে মায়ের দুষ্কর্মে বীতশ্রদ্ধ মেয়ে ইলেকট্রা মায়ের আদরের ওরেসতেসকে প্ররোচিত করে মায়ের হত্যায়। ওরেসতেসের মায়ের স্নেহ-বৃত্ত থেকে মুক্ত হয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছাই মা-কে হত্যার রাস্তায় নিয়ে যায়। ওরেসতেস মাকে বিষ মেশানো পেঁপে খাইয়ে হত্যা করে। নাট্যকার লিখেছেন, "Electra alone is concious of what Pinera called 'that tirrible limitation that blind respect imposed upon us,' and her purpose is to free Orestes from the 'tyranny' of their mother's affections so that he can cross beyond the columns of the verenda where their drama unfolds and explore the wider world."[১]

ভার্জিলিও পিনেরা তাঁর সমসময়ের ধর্মে গ্রীক মিথের ঐতিহ্য ও গ্রীক নাটকে ট্র্যাজিক চিন্তাকে অস্বীকার করেছেন প্যারডির ধর্মে। কিউবার সুদূর অতীতে যে গণতন্ত্র ছিল তাও তো এ্যাথেনিয়ান ডেমোক্রেসির প্যারডি। এমনকি ১৮৯৮ সালে স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেলেও ভয়ংকর সন্ত্রাস, আমেরিকান সেনার আগ্রাসন, স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতির কারণে বহু রক্তক্ষয়ের পর আজ সেখানে

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। উত্তর উপনিবেশিক যাপনধর্মে অতীতের বিশেষত ইউরোপীয় জাতিগুলির সকল ঐতিহ্যকে অস্বীকার করাই কিউবানদের চারিত্র্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে রচিত এই নাটক কেবল উত্তর উপনিবেশিক ধর্মেই ষাট বছর ধরে অভিনীত হচ্ছে না। পিনেরার নাটকের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির স্বাধীনতা স্পৃহা। ওরেসতেসের স্বাধীনতা-স্পৃহা, ইলেকট্রার মুক্তির বাসনা এবং ক্ষমতার আধিপত্য অবসরে কামনা—সবই একবিংশ শতাব্দীর সমসময়ের অভিঘাতে জারিত হয়ে চলেছে কিউবানদের মনে। দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট শাসনের সার্বিক পার্টিসর্বস্ব কেন্দ্রিকতা (যা মার্কসীয় জারগনে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা') জনগণের ব্যক্তিত্বের বিকারকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেই। সেই প্রেক্ষাপটে যখন পিনেরার নাটক ওরেসতেস ও ইলেকট্রার মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বলে তখন দর্শক থিয়েটারে ভিড় জমালে বা নাটকটি জনপ্রিয় হলে বুঝতে হবে নাট্যকার সমসময়ের অভিঘাতকে সঠিকভাবেই নাট্যদ্বন্দ্বে বুনতে পেরেছেন। সর্বোপরি বিপ্লবোত্তর কিউবায় এই ধরনের নাটক রচনায় বিতর্ক বাড়ে। বিপ্লবের সাফল্য তো একাধারে তার বিপরীত মতকে ক্ষুণ্ণ করতেই চায়। বিপ্লবোত্তর কিউবায় ১৯৬১-তে পিনেরা গ্রেপ্তার হন নাটকে সমকামিতার প্রসঙ্গ এনে। তারপর যখন ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করেন, 'Within the Revolution, everything; Outside the revolution, nothing.'[২] তখন পিনেরার নাটকগুলি ক্রমশ অন্ধকারে চলে যায়। গত শতকের শেষ দিক থেকে পিনেরার 'ইলেকট্রা গ্যারিগো' পুনরায় দর্শক টানতে শুরু করে। এই জনপ্রিয়তাও সমসময়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় দেশি-বিদেশি পুঁজির বাড়বাড়ন্তের প্রশ্নে এবং সোভিয়েত রাশিয়া ধ্বংসের পর থেকে আজকের চিনের মতো না হলেও কিউবার জনগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার হাওয়ায় শ্বাস নিতে চাইছে।

আগামেনানের বাড়িতে মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও ইলেকট্রা স্বভাবধর্মে প্রতিবাদী, সে মায়ের অবৈধ সম্পর্ককে সহ্য করতে পারে না। বাবা ও ভাইয়ের অকর্মণ্যতার সুযোগে মায়ের প্রেমিক আইগিসথস বাড়িতেই ঘোরাঘুরি করে। শ্রদ্ধার মানুষকে বিশেষত মায়ের পাপের প্রতি অসহ্য মনোভাব ইলেকট্রাকে 'সিনিক' করে তোলে। তার কথাবার্তা যতসব অপদেবতাদের সঙ্গে পুরাণকে অস্বীকার করে—'ELECTRA : Where are you, non-gods? Where are you? I repeat, you absolute negations of all devinity, all mythology, all reverence, dead for ever?...'[৩]

মহান গ্রীক ট্র্যাজেডি সমসময়ের আঘাতে মজার খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। বাড়ির কর্তা আগামেনন এই নাটকে (স্ত্রীর দেওয়া নাম) 'the old rooster' (বুড়ো মোরগ), তাকে ট্র্যাজেডি খুঁজে নিতে হয়—'...I wanted to lead a veguely heroic life, but I'm only well fed and middle class. (Pleading) Tell me, I beg you, tell me. What is my tragedy? Because I must have a tragedy like all human beings, a tragedy to fulfill, but it escapes me!'[৪] নাটকের শেষে ওরেসতেসের হাতে মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাট্যদ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে। নাটকের শুরুতে Tutor-এর বক্তব্যে যেমন পেয়েছিলাম প্রাণিজগতে সবকিছুই ঘটনামাত্র এবং বিষাক্ত পেঁপে খেয়ে মা ক্লাইতিমনেসত্রা-র মৃত্যু ও ইলেকট্রার কথায়—'It's a question of hygiene! A question of hygiene!'। এইভাবেই দীর্ঘ আড়াই হাজার বছরের কাল ব্যবধান অতিক্রম করেও পিনেরার দ্বারা সোফোক্লেসের নাটকের কালোচিত বিনির্মাণ ঘটে যায়।

ইলেকট্রা গ্যারিগো ও হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা

ব্রাত্য বসু 'হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা' নাটকটি প্রথম লিখেছিলেন ২০০৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। ২০০৬-এর ১৬ জুলাই বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনার উদ্যোগে নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন ঘটে এবং ঐ বছরেই শারদীয় 'আজকাল' পত্রিকায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নির্দিষ্ট রচনাকালের অন্বেষণ এই কারণেই যে নাট্যকার যখন নাট্য নির্মাণ করেন তা আসলে স্বমানসে সমসময়ের অভিঘাতজনিত দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি। সর্বোপরি, সকল সাহিত্যই তো অধিকাংশে আত্ম-জৈবনিক : নিজেকে নানাভাবে খুঁড়ে দেখা। এই খনন কখনো মৌলিক সৃষ্টিতে আবার কখনো অ-বিনির্মাণে। ব্রাত্য বসুর এই নাটক সপ্তদশ শতকের একেবারে সূচনায় রচিত শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের পুনর্নির্মাণ নয়, অবিনির্মাণ। ব্রাত্য বসু নিজেই বলেছেন :

> এবং এটা একেবারেই—যদি একটু কেতাবি পরিভাষায় এটাকে বলতে হয় তাহলে বলতে হয়—এটা অ্যাডাপ্টেশনও নয়, এটা ভাবানুবাদও নয়, এটা একরকম ডিকনস্ট্রাকশন বলা যেতে পারে। এটা একটা পুনর্নির্মাণ নয়, এটাকে অবিনির্মাণ বলা যেতে পারে। .... যদি কেউ হেমলাট দেখতে বসে তার হ্যামলেটের গল্পটা জানা থাকলেই চলবে, আবার হ্যামলেট যদি তার নাও পড়া থাকে তাতেও তার কোনো অসুবিধা নেই। এটা তো একটা সম্পূর্ণ নতুন নাটক।[৬]

কলকাতার গরাণহাটার কেচ্ছা কীভাবে হ্যামলেটের ছায়া পড়ে অতিকায় হয়ে উঠল বা বিংশ শতাব্দী-উত্তর কলকাতার, বিশেষত উত্তর কলকাতার কানাগলিতে ঘটে যায় ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র। এ এক প্যারডি যা সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের স্থান-কাল-সমাজের অতীত ঐতিহ্যকে ভেঙে ফেলে, গড়ে তোলে আজকের পশ্চিমবঙ্গীয় স্থান-কাল-সমাজের আনুপূর্বিক অর্থহীন-মাত্রাহীন এক পরিপার্শ্ব এবং মৃতপ্রায় ক্লাসিকের প্রতিস্পর্ধী ডিসকোর্স। তাই ব্রাত্য বসুকে শেক্সপীয়রের বিপরীত অবস্থান নিতে হয়েছে। ইউরোপে পুঁজিবাদের উত্থানের প্রাথমিক পর্বে নব্য ধনীসম্প্রদায়ের আগ্রাসী মনোভাব যখন স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কে বন্ধনকে করে লঘুপ্রায়, ফলত পারিবারিক সম্পর্কের যে অমোঘ ক্ষয় ও স্বার্থপরতা কতদূর মাত্রা ছাড়ালে মানুষ নিজের সহোদরকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে অথচ তা সম্পদের প্রবল বৈভবের চাকচিক্যে অপ্রকাশিত থেকে যায়। নিজের রক্তসম্বন্ধের মধ্যে গোপন বিশ্বাসঘাতকতা সমাজব্যাপ্ত বৃহত্তর কোনো পাপের সঙ্গে অভিন্নতার সন্ধান পেলে ব্যক্তিমানুষের অন্তঃচেতনার তল স্পন্দিত হয়ে ওঠে। ঐ বিশাল ও বিপুল শক্তির অন্যায়ের প্রচণ্ডতায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হয় ধ্বস্ত। হ্যামলেট আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আর গরাণহাটা মেট্রোপলিস কলকাতার ঔজ্জ্বল্যের বিপরীতে ম্লান—পুঁজিবাদের উত্থানের আরও এক কলঙ্কিত রূপ। হেমলাটের আত্মীয় প্রতিবেশীরা এই পুঁজিবাদের উচ্ছিষ্ট শিকারি মাত্র, এরা নিতান্তই মধ্যবিত্ত, ফ্ল্যাটবাড়ির স্বপ্ন দেখে, ক্ষমতার সিঁড়ি বেড়ে সরীসৃপের মতো আরও একধাপ ওপরে উঠতে চায়। উদার অর্থনীতির গণতান্ত্রিক ফাঁকির কাঠামোয় এরা কেবল হিসাব বহির্ভূত সম্পদের মধ্যস্বত্বভোগী।

পাঠক লক্ষ করবেন ব্রাত্য বসুর নাটকের চরিত্রগুলি রূপায়ণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শেক্সপীয়রের নাটকের মহান রাজতন্ত্রের আভিজাত্যপূর্ণ পরম্পরা গরাণহাটার নর্দমাকুঞ্চিত গলিতে আজকের সময়ের ছায়াশরীর হয়ে উপস্থিত। তাই হ্যামলেট থেকে হেমলাট, রাজা ক্লডিয়াস থেকে কদু, পলোনিয়াস হয়েছে পল, হোরেশিও থেকে হরিশ, ওফেলিয়া থেকে শেফালি। নাটকের দ্বন্দ্ব নির্মিত রাজাধিকার বা সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে নয়, পারিবারিক পুরানো বাড়ি বিক্রি করে প্রোমোটিং বা বহুতল নির্মাণ নিয়ে, তার মধ্যেই ঘটে যায় হেমলাটের বাবা সাধনের হত্যা যার মূল ষড়যন্ত্রকারী

কাকা কদু। কদুর অর্থলোভ কেবল দাদা সাধনের কানে বিষ ঢেলে নিশ্চেষ্ট হয় না, মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বশে সে বৌদিকেও শয্যাসঙ্গিনী করে। ভাইপো হেমলাটকে নিজের পাপের অনুবর্তী করে কদু চেয়েছিল ষড়যন্ত্রের মসৃণ সমাপতন কিন্তু প্রতিবাদ শুরু হয় হেমলাটের আত্মোন্মোচনে বা আত্মআবিষ্কারের সূচনাতেই। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট শেষ পর্যন্ত ক্লডিয়াসকে হত্যা করবে কিনা তা নিয়ে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা কনফিউসনের মধ্য দিয়ে গেছে, সে আভিজাত্যের মধ্যে থেকেও আংশিক প্রান্তিক। কিন্তু, ব্রাত্য বসুর হেমলাট নিজেই স্বীকার করে যে তার মধ্যে দ্বিধা নেই, সেই সম্পূর্ণ বিকিয়ে গেছে, মানসিক যন্ত্রণা তাকে উন্মাদের স্তরে নিয়ে গেছে। তারপর একসময় সে বাড়ির স্বত্ব কাকাকে লিখে দেয়, প্রতিবাদহীন হয়ে পড়ে, কাকাকে খুন করবে বলে উদ্যত হয়েও পারে না। বাবার অশরীরী আত্মার আগমন ও হেমলাটকে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রভাবিত করা সত্ত্বেও হেমলাট পারে না। হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতির অন্তঃস্থলে আজকের সময় নির্মাণ করে দেয় এক বিপরীত অন্তঃস্রোত। এই অন্তঃস্রোতের বিপরীত ধর্মে হেমলাট কাকাকে ক্ষমা করে দেয়, প্রেমিকা শেফালির গর্ভে আগত সন্তানের দায়িত্ব দিয়ে যায় কাকা ও মাকে—যে বৃহত্তর কাজ তার দ্বারা সমাপ্ত হয়নি সেই আশাবাদে এবং নিজেকে ঘুমের ওষুধে শেষ করে দেয় চেতনার স্তরে বহিঃ ও অন্তঃস্রোতের আলোড়নে, টানাপোড়েনে। হেমলাটের সম্পূর্ণ প্রান্তিকতা বা সমাজবিচ্ছিন্নতার মধ্যেও পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় আছে জীবনের উত্তাপ বা আশাবাদ বা নাট্যকারের জীবন সম্পর্কিত পরিবর্তনের প্রতি আস্থা। তাই কাকার অন্যায় স্বীকারের পর হেমলাট কাকাকে মারতে পারে না বরং জড়িয়ে ধরে আদর করে কারণ বাবা মৃত আর কাকা জীবিত, প্রতিশোধই একামাত্র রাস্তা নয়। প্রতিশোধের বাইরে গিয়ে হেমলাট মনে করে কাকাই পারবে তার ছেলেকে মানুষ করতে—বিদ্বেষকে অতিক্রম করে যাওয়ার এই পথেই হেমলাট সম্পূর্ণ প্রান্তিক আর 'হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা' শেক্সপীয়রের নাটকের আজকের সময়ের অবিনির্মাণ। এই নাটকে সবার অলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ভূমিকা নেয় আজকের সময় ও তার অভিঘাত।

১৯৫৮তে বার্নাড কপস্ লিখেছিলেন 'দ্য হ্যামলেট অফ স্টেপনি গ্রীন' আবার টন স্টপার্ড নির্মাণ করেছিলেন 'রোজেনক্রান্টস্ অ্যান্ড গিল্ডেস্টার্ন আর ডেড', তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য হেনার মুলের 'হ্যামলেট মেশিন'। এই নাটকে দেখানো হয়েছে সময়ের চলমানতায় অন্ধকার জগতের নায়কদের নাম বদলে গেছে, সেখানে ক্লডিয়াস আর ভিলেন নয়। এই হ্যামলেটের কুঠার যাদের হত্যা করবে তারা হল প্রথমজন কার্ল হাইনরিখ মার্ক্স এবং দ্বিতীয়জন ভ্লাদিমির উলিয়ানভ লেনিন। ব্রাত্য বসুর আলোচ্য নাটকেও সময়ের মান্যতাতেই এসেছে ভারতের উত্তর উপনিবেশিক সমাজবাস্তবতার ভগ্নরূপ এবং একটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের বামশাসনের অবক্ষয়ের রূপক। শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের বোধ জন্মেছিল যে তার শহর ডেনমার্ক এক অন্ধকার কারাগার, সেখানে সকলেই দেখাতে চায় তারা ভালো, কোনোরকম শয়তানি তাদের নেই, আসলে সকলে নির্লজ্জ পাপাত্মা। ব্রাত্য বসুর হেমলাটের সময়, শহর অনেক জটিল, বিশৃঙ্খল, যান্ত্রিক আচরণে অভ্যস্ত অথচ রক্তপিপাসু। এখানে

> কমিউনিস্ট পার্টি তাদের প্রতিরোধের ভাষা, জীবনের অনেক অন্ধকার আর অস্পষ্ট কুয়াশাকে অতিক্রম করে মানুষকে দেখাতে চেয়েছিল সম্ভাবনার এক মহাকাশ। জীবনের অন্ধকার ও অপহূরের কালো পাহাড় মুচড়ে তারা নামিয়ে আনতে চেয়েছিল এক নির্বাত বিস্ময়ের ঝর্না। গান গেয়ে উঠেছিল তারা প্রান্তিক মানুষের মিছিলে—

'হারাবার কিছু ভয় নেই
শুধু শৃঙ্খল হবে হারা
জনকল্লোলের উত্তাল নদী
মোহনায় দিশাহারা।'

কোনও সংশয় নেই, সেই কমিউনিস্টদের মতাদর্শ ও কার্যক্রম বিগত পঁচিশ বছর ধরে ক্রমশ ধ্বংস ও অবলুপ্তির অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। এদের একটি অংশ এই সময়ে ব্যক্তি হত্যার পথে 'টেরোরিস্ট' হিসাবে চিহ্নিত এবং বড় অংশটিকে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাচক্রই ক্রমশ আত্মসাৎ করে নিয়েছে তাদের কার্যক্রম ও মতাদর্শের অন্তঃকেন্দ্রে।[৭]

এই নাটকের চরিত্র পার্টির কাউন্সিলর সুখেন তাদের প্রতিনিধি যারা গত শতকের পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশকের আদর্শবাদী কার্যক্রম বা মতাদর্শগত ভাবনার বিপরীতে আজকের ভয়াবহ, উদ্ধত এক উন্নয়নবাহিনী। এরা কাটমানি এবং ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজমের গুণগ্রাহী এক নব্য ক্যাডারকুল। নিজেদের অপ্রতিরোধ্য বিকল্পহীন ভাবতে ভাবতে কোনো ভিন্নমতকে সুখেনরা গ্রাহ্য করে না— 'চেনো শালা আমাদের কালচারাল লাইনকে?...সব বন্ধ করে দেব। আমায় চেনো না। সাইলেন্টলি খতম করে দেব। গায়ে হাত দেব না, ...শুধু সাইলেন্স দিয়ে ভোগে পাঠিয়ে দেব। ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকবি। কারুর বাবা কিছু করতে পারবে না।'[৮]

প্রাসঙ্গিকভাবেই এই নাটকে দেখানো হয়েছে 'নৈঃশব্দের রাজনীতি' জন্ম দেয় এক বিপন্ন ভয় ও অস্তিত্বের সংকট। আক্রান্ত হেমলাট স্পষ্ট দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়ানো ঘাতকের শরীরী ভাষায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে হত্যার সংকেত ও ক্ষমতার দর্পে সে কুক্ষিগত করে রেখেছে বিপক্ষের প্রতিরোধের প্রতিবাদের ভাষা। ব্রাত্য নিজেই এক সাক্ষাতে বলেন—'...আমার মনে হয় মানুষ যখন মরে—সে বুঝতে পারে না। কিন্তু এইটাই হচ্ছে এই আধুনিকতম মৃত্যুর-এই সাইলেন্স রাজনীতির সংজ্ঞা—সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুটা তোমায় জানান দিতে দিতে মারবে।'[৯]

সবদিক থেকে অক্ষম করে দেওয়া মানুষ হেমলাট পারিপার্শ্বিক হন্তারক পরিবেশে কুকুরের গোঙানির শব্দকেই আন্তরিক মনে করে। হেমলাট চাকরি পেতে ব্যর্থ, কেননা সে স্পোকেন ইংলিশ জানে না—বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র, প্রতিবেশীরা তার নামে, তার মায়ের নামে কটু কথা বলে, বুঝতে পারে না একটা মানুষ (তার বাবা) কী করে মারা গেল, যাকে (শেফালি) ভালোবাসে সেও এখুনি বিয়ে করতে পারবে না, সর্বোপরি বাড়ি প্রোমোটিং-এর জন্য লিখে দেওয়ার চাপ —বাড়িতে কাকা, বাইরে পার্টি কাউন্সিলর। এরপরেও একজন সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ হেমলাট শুনতে পায় তার বাবার অতৃপ্ত আত্মা দেখা দিচ্ছে। হেমলাটের মনের সংশয় যে বাবার মৃত্যুর কারণ ঐ অতৃপ্ত আত্মা-ই বলে দিতে পারে—এই ভাবনা অন্য সব শঙ্কার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে হেমলাটকে 'সিনিক' করে তোলে :

হেমলাট : (আস্তে আস্তে) খেঁউ খেঁউ। খেঁকি কুত্তার দল। খেঁউ খেঁউ। আবার দাঁত দেখাচ্ছে। আমার দাঁত দেখাচ্ছিস আবার তবে রে?

** * * * *

(শাঁখের আওয়াজ বাড়ে। ব্যান্ড কমে আসে। সামনে হেমলাট মাইমে অদৃশ্য কুকুরের সঙ্গে লড়ে। পেছনে সেই মিছিল যায়। স্লোগান ওঠে—

'কম্পিউটার শিখতে দিতে হবে। দিতে হবে।'
'নিজেদের পুরনো নীতি মানছি না, মানব না।'
'মাতৃভাষা ইংরেজি ভাষা নিয়ে দু'রকম বলছি না, বলব না।
কোনওদিন বলিনি, বলব না। বলিনি, বলব না।'....)[১০]

গত শতকের আশির দশকের প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার ঢুকতে দেবে না বলে পণ করে এবং ঐ দশকেই মাতৃভাষার পাশে ইংরাজি শিক্ষা তুলে দেয় কিন্তু ১৯৯৮ সালে ফিরিয়ে আনে।

এই হেমলাট গরাণহাটার গলি থেকে গড়িয়াহাটা-সাউথসিটির মেট্রোপলিস আলো ঝলমলে কলকাতারই মানুষ। বিশ্বায়ন-উত্তর কলকাতায় পণ্য ও প্রচারের যান্ত্রিক দৌড়ে সত্য ও অনুভূতির সনির্বন্ধ আলো নেই কারও চোখে। সারল্য ও সংবেদনশীলতা এই ধৃষ্ট সময়ে যেন গুরুত্বহীন কিন্তু হেমলাটের মনুষ্যত্ব ও ক্ষমা প্রবণতাই হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য ক্যানভাস যেখানে সময়ের অভিঘাতে সকল ব্যথাজর্জর সম্পর্কের চিহ্ন ও হত্যার দাগ উৎকীর্ণ হতে পারে। নতুন সময়ের পরিবর্তিত অবস্থার অভিঘাত, বিপন্নতাকে গ্রথিত করতে গিয়ে এই নাটক শেক্সপীয়রের বিস্ময়কর সৃষ্টির 'গ্রান্ড ন্যারেশন'কে ভাঙতে থাকে এবং নির্মিত হয় এক 'মেটাল্যাঙ্গুয়েজ' বা অধিভাষা। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যের শেষে পার্টি কাউন্সিলর সুখেনের ভয়াবহ ধমকের পর হেমলাটের 'টুবি অর নট টুবি'—দীর্ঘ সংলাপের শুধু প্রথম পঙক্তির উচ্চারণ নাটকটিকে আর প্যারডির পর্যায়ে বেঁধে রাখে না। নাটকটি হয়ে দাঁড়ায় উত্তর-উপনিবেশিক, উত্তর-বিশ্বায়ন পর্বের নব্য বঙ্গ সমাজের জটিল বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ব্যবহারিক রূপ, যখন কয়েক দশক ব্যাপী লালিত বিশ্বাসগুলো বিপর্যস্ত হচ্ছিল শুধু সমাজ কাঠামোর স্থলে নয়, জীবন প্রবাহের সর্ববিস্তারী মূলেও—

সুখেন : কী জানিস?
হরিশ : না-মানে এই, তোমাদের বাড়ি কংগ্রেসি আর তুমি লাল। আলাদা, আলাদা।
সুখেন : তুই এইটা জানিস। তুই সব মান্ধাতা আমলের কথা বলছিস। এখন আবার লালাদা আলাদা কী? যেদিকে পাওয়ার থাকবে আমরা সেদিকে। কেন না সেখানেই মানুষের ভাল হবার সম্ভাবনা। দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। আর এখতো আমাদের কোনও ঠিকঠাক বিরোধীও নেই।

**   * *   * *

(চলে যায়। নীরবতা। হেমলাট সামনের দিকে আসে। এসে বলে—)
হেমলাট : টুবি আর নট টুবি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন।
হরিশ : কী বলছিস?
হেমলাট : না কিছু না।
হরিশ : টুবি বাস ধরবি? কোথায় যাবি এত বেলায়। কলেজস্ট্রিট?[১১]

এও একধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা। যে নৈর্ব্যক্তিকতায় হেমলাট বোঝে ইউরোপীয় 'এনলাইটমেন্ট'-এর মিথ ও ধাপ্পাকে। তাই হেমলাট শেক্সপীয়র ও তার সভ্যতার নরমেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যঙ্গ করে। ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে নাট্যকারের নিজের অবস্থান থেকে। অর্থাৎ—

আমি এমনকি যখন খুব চুটিয়ে গ্রুপও করেছি তখন সেই গ্রুপের মধ্যে যেমন একধরনের

ইনভলভ্‌মেন্ট ছিল, এক ধরনের প্যাশন ছিল, আবার সেই প্যাশন থেকে কোথাও একধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা ছিল, একধরনের উদাসীনতা ছিল। আমি মাঝে মাঝে অফ পড়তাম। এই অফ হয়ে যাওয়াটা—আমার মনে হয় এই অফ হয়ে থাকা এবং জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে থাকা এই দুটো ব্যাপারেই আমার মনে হয় যে হেমলাট বয়নের পিছনে, রচনা কৌশলের পিছনে একটা বড়ো উপাদান হয়ে উঠেছে।[১২]

এই ছিন্নমূল অবস্থান ও অন্ধকার জীবনের ক্লেদ থেকেই ব্রাত্য বসু নির্মাণ করেন আজকের সময়ের অপমান, অস্থিরতা ও অপমৃত্যুর এক নবভাষা : 'হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা'।

তথ্যসূত্র

১. Pinera Virgilio, "Pinera teatral", in 'Teatro completo' (Havana : Ediciones R 1960), p. 11.

২. Townsend Saraha J., Introduction of 'Electra Garrigo', : Taylor Diana and Townsend Sraha J. (Editors), "STAGES OF CONFLICT A critical anthology of Latin American Theater and Performance", Ann Arbor (USA), The University of Michigan Press, Edition : 4, 2011, p. 177.

৩. Pinera Virgilio, Translated by Carson Margaret, 'Electra Garrigo', II, ibid., p. 185.

৪. ibid, p. 187.

৫. ibid, p. 195.

৬. রবিশঙ্কর বল, "ছেলের মাথায় হাত না রাখলে বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয় না", 'ব্রাত্য', শোভন গুপ্ত (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৯০।

৭. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, "হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা", দ্র. 'অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ ব্রাত্য বসুর নাটক' (সংকলন), প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৯৯।

৮. ব্রাত্য বসু, 'হ্যামলেট দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা', অষ্টম দৃশ্য, "নাটক সমগ্র", কলকাতা, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, মে ২০১০, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯।

৯. রবিশঙ্কর বল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

১০. ব্রাত্য বসু, প্রাগুক্ত, তৃতীয় দৃশ্য, পৃ. ৮৯।

১১. ব্রাত্য বসু, প্রাগুক্ত, চতুর্থ দৃশ্য, পৃ. ৯৬।

১২. রবিশঙ্কর বল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

উল্লেখপঞ্জি

১. ব্রাত্য বসু, 'নাটক সমগ্র', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, ২য় খণ্ড।

২. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ ব্রাত্য বসুর নাটক', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পত্রলেখা, জানুয়ারি, ২০১৩।

৩. শোভন গুপ্ত (সম্পাদনা), 'ব্রাত্য', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩।

৪. Pinera Virgilio, 'Teatro completo', Havana : Edicioners R. 1960.

৫. Taylor Diana and Townsend Sraha J. (Editors), "STAGES OF CONFLICT A critical anothology of Latin American Theater and Performance", Ann Arbor (USA), The University of Michigan Press, Edition : 4, 2011.

রাবেয়া আল বসরি : সুফি, নারী ও অন্যান্য শারীরিক বিতর্ক

রাতুল ঘোষ

ধর্ম এবং নারীর সামাজিক তথা প্রথাগত অবস্থান বরাবরই দ্বান্দ্বিক। পৃথিবীর সমস্ত প্রচলিত প্রাথমিক ধর্মগুলিই একার্থে পুরুষতন্ত্রের অনুগামী এবং সামাজিক ভাবে নারীকে শৃঙ্খলিত করবার প্রয়োজনে ব্যবহৃত। শরিয়তি ইসলামের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যেমন প্রযোজ্য মূলধারার হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও। কিন্তু শরিয়তি ইসলামের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে যে সুফিমতের জন্ম হয়েছিল, যা কিনা ইসলামের সমস্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-প্রকল্পকেও বারংবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল; স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, নারীর অবস্থানের দিক থেকে সেই সুফিমত কতখানি উদার, তা নিয়ে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় নারী সুফি সাধিকার সংখ্যা এতই কম এবং তাঁরা এতখানিই অপরিচিত বা অখ্যাত যে তাদের অবস্থান বা অধিকার নিয়ে আলাদা করে প্রশ্ন করার প্রয়োজনটাই আর থাকে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে-সুফিমতের বিকাশপর্বের প্রাথমিকেই যে সাধকদের নাম করতে হয়, তাদের মধ্যে একজন নারী, এবং খুব বড়ো মাপের সাধিকা ও কবি। তাঁর নাম 'রাবেয়া-আল-আজব্বিয়া আল-কাসিয়া', বা সংক্ষেপে 'রাবেয়া-আল-বসরি', অর্থাৎ বসরা-র রাবেয়া। সম্ভবত সুফি সাধিকাদের মধ্যে ইনিই সর্বাধিক খ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের শুরুর দিকে[১] বসরা নগরে (বর্তমান ইরাকের বাগদাদ) রাবেয়ার জন্ম হয়। পরবর্তীতে তিনি সন্ন্যাসিনীর বা দরবেশের জীবন গ্রহণ করেন এবং সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রেমে ব্যাকুল হয়ে আমৃত্যু অতিবাহিত করেন। রাবেয়ার জীবন নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনায় আসার আগে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা খুঁজে দেখলে এমন একজনের নাম পাই, যার সঙ্গে রাবেয়ার যাপনের মিল রয়েছে। তিনি হলেন মীরাবাঈ। প্রচলিত হিন্দুধর্মের শাসন প্রাবল্য এড়িয়ে তিনি ব্যাকুলা এক সাধিকার জীবন গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী এই সাধিকা ভারতের ভক্তি আন্দোলনের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি। যেটা লক্ষ্য করার, তা হল, ভক্তি আন্দোলনেও কিন্তু আমরা মীরা ছাড়া অন্য কোন সাধিকার নাম পাই না। ঠিক একই-ভাবে আমরা লক্ষ্য করি, প্রচলিত ধর্মের বিরোধী অবস্থানে গেলে, বা ধর্মীয় অনুশাসনের অননুমোদিত সাধনায় পদার্পণ করলে সমাজসীমার বাইরে সরে যেতে হয়, সাধকের নিভৃতি বা দরবেশের একাকী পথিকজীবন গ্রহণ করতে হয় যেটা একাকী নারীর পক্ষে কিছুটা সমস্যার। পুরুষ সাধকেরা অনেকেই সিদ্ধিলাভের পর আশ্রম বা খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন, গঠন করেন শিষ্য পরম্পরা, গ্রহণ করেন গুরুর আসন এবং বহু সংখ্যক মানুষকে দেন বিকল্প ধর্মভাবনার এবং সাধনার আস্বাদ। সচরাচর নারী সাধিকাদের ভাগ্যে জোটে না এই স্থিতিশীলতা বা স্বীকৃতি। তাঁদের সাধনাপর্ব প্রায় আমৃত্যু বিস্তার লাভ করে। সুফির ক্ষেত্রেও যেমন তা সত্যি, তেমনিই সত্যি বৈষ্ণব ভক্তির ক্ষেত্রেও। ঠিক একই প্রেক্ষিতে আমরা আরো একজনের নাম করতে পারি। তিনি হলেন কাশ্মীরের শৈব সাধিকা লাল দেদ বা লাল্লা। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে কাশ্মীরে তাঁর জন্ম।[২] তাঁর জীবনের সঙ্গেও উপযুক্ত সাধিকাদ্বয়ের জীবনের অনেকাংশে মিল রয়েছে। সুতরাং মূলধারার বাইরে বিকল্প ধর্মীয় সাধনার (alternative religious practice) ক্ষেত্রে এই তিন সাধিকা তিন রকমের সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন, এবং তিনজনই খুব বড়ো মাপের কবিও ছিলেন ; কিন্তু এদের তিনজনই সাধনার নিঃসঙ্গতাকে বহন করেছেন। অন্যদিকে, সুফি মত বা বৈষ্ণব অথবা শৈব ভক্তি

আন্দোলনের ইতিহাসে এরা নিজেদের যথাযোগ্য গুরুত্ব হয়তো পান নি। অন্ততঃ, ভারতবর্ষে পান নি। এর কারণ খুঁজতে গেলে আমরা দেখব, ভারতবর্ষে বিকল্প ধর্মীয় সাধনার বিষয়টি সবসময়েই পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমনটি কিনা সব মূলধারার সাধনার ক্ষেত্রেই। কিন্তু এই বিকল্প সাধনাগুলি সবসময়েই নারীভাবের সাধনা, যা পুরুষকে আয়ত্ত করতে হয়েছে। সাধনার তত্ত্ববহ সঙ্গীতগুলিই এ কথার প্রমাণ দেবে। সুতরাং এই আপাতবিরোধী অবস্থানটি আসলে বিকল্প ধর্মীয় সাধনাকে একটি নতুন ভাবনা-কাঠামোয় ফেলে পর্যবেক্ষণ করার দাবী রাখে। বর্তমান প্রবন্ধে মূলত সুফিমতকে কেন্দ্রীয় ভাবনায় রেখে পূর্বোল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় তথা বাংলার বিকল্প ধর্মীয় সাধনার একটি বিশেষ দিক উন্মোচন করা হবে।

এখন প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে ইতিহাসগত দিক থেকে। ভারতবর্ষে বিকল্প ধর্মীয় সাধনা পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এ কথা সীমায়িত। ভারতের বাইরেও বিকল্প ধর্মীয় সাধনায় পুরুষরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন—এ কথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষিতে একটি ভিন্ন ধরণের দ্বান্দ্বিকতা দেখা যায়। সুফিমতকে কেন্দ্র করেই বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ভারতের বাইরে যে সমস্ত সুফি সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছিল, বা যে সমস্ত রচিত সাহিত্য সুফি ভাবনায় ব্যাখ্যাত হয়েছিল; তাদের ক্ষেত্রে পুরুষের ক্রিয়াশীলতাই ছিল প্রধান। ক্রিয়াশীলতা বলতে আমি শারীরিক ক্রিয়াশীলতা বোঝাতে চাইছি। হৃদয়জ তীব্র সংবেদনশীলতা এবং তৎ-সঞ্জাত বেদনাবোধের প্রাবল্যের দিক থেকে দেখলে নারীরাই হয়তো এগিয়ে থাকবেন, কিন্তু জামির 'ইউসুফ-জোলেখা' হোক বা লায়লা-মজনুর প্রচলিত কাহিনী—সর্বত্রই ঘটনাক্রমের মধ্যে পুরুষের টানাপোড়েন অনেক বেশি। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষিতে যখনই রাধা-কৃষ্ণ মোটিফ লৌকিক কাহিনীতে সংযুক্ত হল, তখনই বিষয়টা উল্টো হয়ে গেল। রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী দেখলে দেখব, কৃষ্ণ স্থানু ; অন্যদিকে রাধার অভিযাত্রা হৃদয়জ হলেও তাঁকেই কিন্তু সমাজ-সংসার মিছে করে বাহ্য অভিসারে যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ কাহিনীর চলমানতায় রাধার অংশটি অনেক বেশি 'অ্যাক্টিভ'। ফলে পুরুষ সাধককে নারীভাব-ধারনের দিকে এগোতে হল। এই দ্বান্দ্বিকতার বিষয়টি একটি ভিন্ন ধারার উদাহরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে ১৫৬৬ সালে মীর আবদুল ওয়াহিদ বিলগ্রামি-র লেখা 'হকাইক-ই-হিন্দি' পুঁথিটির পর্যালোচনা করলে। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন হিন্দি সামা-সঙ্গীতের ফার্সি অনুবাদ, যেখানে বৈষ্ণব ধর্ম এবং সঙ্গীতের সঙ্গে সুফির অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী এবং তার বিভিন্ন চরিত্র ও উপাদানগুলিকে বিলগ্রামি সুফি ভাবনায় রূপকায়িত করে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বইতে গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বিলগ্রামির বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য—

> ...(T)he love scenes and rhetorical graces of the poet are not to be understood in the sense that persons of civil minds are dispositions attached to them. Radhika the heroine is heavenly wisdom. The milkmaids who divert Krishnan from his allegiance to her, are the senses of smell, sight, touch, taste and hearing. Krishnan represented as pursuing them is the human soul, which attaches itself to earthly pleasures. The return of Krishnan to his first love is the return of the repentant sinner to God, which gives joy in heaven.

—বিলগ্রামি এখানে ভারতীয়, তথা বৈষ্ণবীয় ভাবনার বিপরীত কথাটি বলছেন। সুফির চোখে শ্রীরাধা

স্বর্গীয় প্রজ্ঞার প্রতীক এবং কৃষ্ণ মানবাত্মার চরম প্রকাশ হয়ে তার দিকে ধাবিত হচ্ছেন! এ-ভাবনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন বিরোধী তো বটেই, (যদিও, গীতগোবিন্দ রচনাকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বভাষ্য গঠিত হয় নি, ফলে বিলগ্রামির একটা স্বাধীনতা থেকেই যায় যে তিনি উক্ত দর্শনের সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়ে এ-ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে তাঁর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই সুফি ভাবনায় ব্যাখ্যা) রাধাকে ভারতীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র-সাহিত্যে যে 'Active' চরিত্র হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তারও বিরোধী। ফলে এই ব্যাখ্যাটি থেকেই আমরা আলোচ্য binary/দ্বান্দ্বিকতা-র একটা জোরালো প্রমাণ পেতে পারি এবং তার প্রকৃতি সম্বন্ধেও একটা আভাস পেতে পারি। অন্যদিকে এটাও মনে রাখতে হবে, সাধনা বলতে যতক্ষণ মানসিক-তপস্যা, ততক্ষণ সব দেশের সাধকই সাধিত ঈশ্বরের প্রেমিকা বা দাসীরূপে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে সমস্ত বিকল্প সাধনাই যোগ ও তন্ত্রের সঙ্গে মিশে একটা দেহ-সাধনার আঙ্গিক সামগ্রিক সাধন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফেলল এবং আমাদের প্রশ্ন সেখানেই। সাধনা যেখানে শরীর-সংশ্লিষ্ট, আর সাধনার ভাবগত উপাদান যেখানে নারীর, সেখানে পুরুষ সাধকের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, দেহে নারীভাবের জাগরণ ঘটানো। এ বিষয়টি সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনায় খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পরিতোষ দাসের ভাষ্যে— 'বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক আপনার মধ্যে চিন্ময়ী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ভাব-সাধনার দ্বারা আপন প্রকৃতিকে শ্রীরাধার অবস্থায় উপনীত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদে মিলিত হ্লাদিনী শক্তিতে পরিণত করেন।'[৪] অন্যান্য দেহসাধনার প্রক্রিয়াগুলিতেও এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সাধকদেহে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ঘটিয়ে যুগনদ্ধাবস্থায় অটল সিদ্ধিলাভ করা। এখন দেখার, বিকল্প সাধনার এই দেহজ ভাবনার দিকটি যে দার্শনিক প্রেক্ষিতে নিজের তত্ত্ব- কাঠামো তৈরি করেছে, তার পেছনে নারীর অবদান কতটা। আর তা দেখতে গিয়েই রাবেয়া-উল- বসরি আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

রাবেয়ার জন্ম অষ্টম শতকে বসরায়, সে কথা পূর্বেই উল্লেখিত। খুবই সংক্ষেপে রাবেয়ার জীবনীর কথা বললে বলতে হয়—তাঁর যৌবনে তাঁকে ঘটনাচক্রে এক অভিজাত পরিবারে ক্রীতদাসত্ব বরণ করতে হয়, তারপর একদিন তাঁর ধ্যানরত পবিত্র মূর্তি দেখে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর মালিক তাঁকে মুক্তি দেন এবং রাবেয়া মরুভূমিতে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে সর্বত্যাগী সাধিকার জীবন বরণ করেন। তিনি একাধিক প্রলোভন-পূর্ণ বৈবাহিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, বহু শিষ্য-শিষ্যাকে তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যাকুলতার পথে আদর্শ দেখিয়ে যান এবং তাঁর অপার্থিব ও অহৈতুকি প্রেমের সাধনায় রত থেকেই আশি-র মাঝামাঝি বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রচলিত পন্থানুযায়ী কোন গুরু ছিল না, তার ব্যাকুল সাধনা ছিল তাঁর স্বায়ত্ত, এবং সেকারণেই তাঁর সিদ্ধি একান্তভাবে তাঁরই অর্জিত। এই প্রসঙ্গে বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, যা এও দেখায় যে বিদগ্ধ সুফি সমাজে (যা অবশ্যই পুরুষের সমাজ) রাবেয়া কতখানি মর্যাদা এবং সম্মান অর্জন করেছিলেন—

> Rabia was in the rank referred to by *Abd al-Qādir al Jīlānī*, when he said that there were two classes of true believers. First, those who seek a master in the way that leeds to the majesty of God, who may act as an intermediary between them and God, people who persuade themselves that their is no way for them to God except by the prophet...so they do not accept as evidence of the

> right way, anything in which they do not see the footsteps of the prophet before them. The second class are those who, when they seek to follow the right path, do not see before them the foot print of any of God's creatures, for they have removed all thought (of what He had created) from their hearts and concern themselves solely with God. It is in this later class that Rabia is placed.[৫]

—এই মর্যাদা সুফির গঠনপর্বের অনেক সাধকেরই প্রাপ্য, যাদের মধ্যে রাবেয়া অন্যতম। অর্থাৎ সাধিকা রাবেয়া সহ-সাধকদের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিলেন। এই বাক্যটিকে গুরুত্ব দিয়ে আমি রাবেয়ার জীবনী শেষ করে প্রস্তাবিত সমস্যাপটে প্রবেশ করব।

প্রথমেই আমি 'তাজকিরাত-উল-আউলিয়া' নামক বিখ্যাত সুফি-সাধকদের জীবনী গ্রন্থে লেখক-সাধক 'ফরিদ-উদ্-দিন্-আত্তার' রাবিয়া সম্বন্ধে শুরুতেই কি বলছেন, তার উল্লেখ করতে চাই A. J. Arberry-র অনুবাদে :

> If anyone says, "Why have you included Rabe'a in the rank of *Men*?" my answer is, that the Prophat himself said, "God does not regard your outward forms." The root of the matter is not form, but intention, as the Prophat said, "Mankind will be raised up according to their intentions." ...*When a woman becomes a "man" in the path of God, she is a man and one cannot any more call her a woman.*

—এই বক্তব্য থেকে সমস্যাটির স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। অন্যান্য canonical ধর্মের মত ইসলামেও ধর্মীয় সাধনা সবসময়েই ছিল পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর নিজেও পুরুষরূপে কল্পিত এবং তাঁর পয়গম্বরও একজন পুরুষ।[৭] এমতাবস্থায় ধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই পুরুষের অধিকার এবং আধিপত্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিকল্প ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে সে সাধনা ভাবগত ভাবে নারীর। আর এর সূত্র লুকিয়ে আছে ইসলাম-খ্রিস্ট-ইহুদি সব ধর্মের তত্ত্বগ্রন্থেই। ইহুদি রহস্যবাদ সবসময় তাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা *Yehwah*-কে সামগ্রিক জৈরায়েল জাতির (তথা দেশ-এর) পতি/স্বামী হিসাবে দেখে এসেছে। বাইবেলের Old Testament-এ নানা অংশে এই ভাবনা পাই যেমন—

> Turn, O backsliding children, saith the lord ; for I am married unto you... (KJV, Jer iii, 14)[৮]
>
> Surely as a wife treacherously departeth from her husband, so have ye dealt treacherously with me, O house of Israel, said the lord (KJV, Jer iii, 20)[৯]

একইভাবে খ্রিস্টান রহস্যবাদ ও মানবাত্মার সঙ্গে পরমেশ্বরের বৈবাহিক তথা নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে। William Ralph Inge, D.D. ১৮৯৯ সালের Bampton lectures-এ *Christian Mysticism* বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> The tendency of Catholic mysticism has been to make the individual soul the bride of Christ, and to treat the *Song of Soloman* as symbolic of "spiritual nuptials" between Him and the individual "contemplative"[১০]

—এবং আরো আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এই যে বিবাহ—তা বিশুদ্ধ আত্মিক না তার সঙ্গে দেহেরও কোনো সম্পর্ক আছে, এই নিয়ে একটা বিতর্কও হয়েছিল, যে বিতর্কে Tertullian[১১] বলেছিলেন, আত্মার সাথে সাথে দেহও যীশুর সঙ্গে বৈবাহিক সংযোগের ক্ষেত্রে গণ্য হওয়া উচিত : " 'If the soul is the bride', he says 'the flesh is the *dowry*" ।[১২] —এই ভাবনা থেকে এটাও খুব পরিষ্কার ভাবে উঠে আসছে যে, সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক প্রকল্পগুলিকে (agency) একটি ধর্মগন্ধী ন্যায্যতার মোড়ক দেওয়া ছিল পুরুষ তাত্ত্বিক সমাজের আর একটি ভূমিকা, যে কারণে বৈবাহিক পণের এমন উপস্থাপনা। যাই হোক, দেহভাবনার কথাটিকে মাথায় রেখে আমরা তবে আবার পুরোনো আলোচনায় ফিরতে পারি এবং জোবের সঙ্গেই এখন একথা বলতে পারি যে রহস্যবাদী মরমিয়া সাধনায় বা বিকল্প সাধনায়, যেখানে সাধ্য ও সাধকাত্মার মধ্যে (দেহ-র প্রসঙ্গে পরে আসব) পুরুষ-নারীর সম্পর্কে রয়েছে, সেখানে সাধনা ভাবগত ভাবে নারীর সাধনা। কিন্তু সাধক হলেন পুরুষ। ফলে, সাধনার পথকে পৌরুষেরই একটা অংশ হিসাবে আত্মীকৃত করা হল। তীব্র হৃদয়প্রাবল্যের এবং নারীভাবের সাধনা হলেও তা হয়ে থাকল মূলত পুরুষের সাধনা। এমন সময় সেই সাধনার পথে সাধিকা-নারীর আবির্ভাব ঘটল—রাবেয়ার তীব্র আবির্ভাব এবং উপস্থিতি কাঁপিয়ে দিল এই প্রচলিত ধারণার ভিত। আর এখানেই সূত্রপাত হল দ্বন্দ্বের। সেই দ্বন্দ্বেরই প্রতিরূপ দেখি যখন পুরুষ সাধকদের মধ্যে জীবনী লেখক আত্তার লিখতে বসেন এক সাধিকার জীবনী। তাই তাকে বলতে হয়, যে, ঈশ্বর রূপ (form) দেখেন না, কাজ দেখেন; আর রাবেয়া তার সাধনকর্মের দ্বারাই পৌরুষ অর্জন করেছেন, যে পৌরুষ একান্তভাবে সাধকের। অর্থাৎ, 'সাধক' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অন্যতম শর্ত হল পুরুষ হওয়া। আর সেজন্যেই রাবেয়ার স্বীকৃতির বয়ানটা হয় এরকম— 'When a woman becomes a "man" in the path of God, she is a man and one cannot anymore call her a woman.'। এভাবেই রাবেয়া সহ-সাধকদের সম্ভ্রম এবং স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন, যা আমরা পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছিলাম, সেই গুরুত্বের কারণ হল এটাই—স্বীকৃতির এই বিশেষ প্রকৃতি।

এই দ্বিধার মধ্যেই কিন্তু রাবেয়া সুফিমতের গঠনপর্বের এক প্রাথমিক দর্শনভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। আরো ভাববার বিষয় হলো এই যে, রাবেয়ার কোন প্রাতিষ্ঠানিক গুরু বা শিক্ষক ছিলেন না। ফলে রাবেয়ার দর্শন সর্বাংশেই তাঁর অনুভূতির দর্শন, যা তাঁর রচিত কবিতাগুলিতে বারংবার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তত্ত্বজটিলতা নেই। আছে বিশ্বাস এবং অনুভবের এক সরল সমাকরণ, যার ফলে রাবেয়ার ভাবনাগুলি আজও বিস্ময়কর। আর একটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। রাবেয়ার পূর্বকালীন সুফি সাধকদের মধ্যেও ব্যাকুলতা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু তার পেছনে অস্তিত্বের একটা প্রশ্ন ছিল। মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক্' বা আমিই পরম সত্য—এই ঘোষণার পেছনে সেই অস্তিত্বের প্রশ্ন একটা বড়ো দার্শনিক মাত্রা নিয়েছে। রাবেয়ার চেয়ে বয়সে বড়ো এবং তাঁর সমকালীন বিখ্যাত সুফি সাধক এবং তাত্ত্বিক হাসান বসরীর (৬৪২-৭২৮ অব্দ) সাধনার ক্ষেত্রেও ইসলামী ভক্ত-ভাবনার বিষয়টি খুবই প্রবল দেখা যায়। ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা হওয়ার ধারণাটি রাবেয়ার সাধনা থেকেই সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে জানা যায়। এ জন্যই তাঁকে বলা হত 'রাবেয়া আল আজবিবয়া' বা আশ্চর্য/ব্যতিক্রমী রাবেয়া। রাবেয়ার কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যাবে তাঁর তীব্র ব্যাকুলতার কথা তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যের কথা। যেমন, এই কবিতাটি—

If I adore you out of fear of Hell, burn me in Hell!
If I adore you out of desire for Paradise,

Lock me out of Paradise.
But if I adore you for yourself alone,
Do not deny to me your eternal beauty.[১৩]

মনে রাখতে হবে, পরবর্তীকালীন সুফি কবিতায় এই ধরনের ভাবনার বা রাবেয়ার সামগ্রিক ব্যাকুলতার একটা উত্তরবহন দেখা যায়। জালালুদ্দিন রুমি বা আমির খসরু, বাবা বুল্লে শাহ বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জ-শকর, প্রভৃতি সাধক কবিদের রচনায় রাবেয়ার ভাবনার প্রতিচ্ছবি মেলে।

কিন্তু আবার দ্বান্দ্বিকতার জন্ম হয় খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পর থেকে যখন সুফিমতের সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, শৈব ও নাথ হঠযোগ এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সংমিশ্রণ হতে থাকে এবং এই মিশ্রণের ফলে বাউল এবং ফকির মতবাদ ও তাদের সাধনপ্রণালী ক্রমোদ্ভূত হয়। ভারতবর্ষে এসে ভাববাদী সুফি মতবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয় দেহবাদী সাধনার ধারা। সুফির দার্শনিকতার তত্ত্বপরিধিতে প্রবেশ করে 'দেহ'—এই ধারণাটি। দেহোত্তীর্ণ বা দেহগত সাধনা—এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দিয়েই মিশ্র সাধনপ্রণালী হিসাবে বাউল-ফকির মতবাদ লোকায়তে স্বীকৃতি এবং বিস্তার লাভ করতে থাকে। এবং সেই সঙ্গে সাধনার-র প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসে 'নারী'-র কথা।

ভারতীয় ধর্মীয় সাধনার ইতিহাসে বাউল-ফকির মতবাদের পূর্বেও পুরুষ নারীর যুগল শরীরী সাধনার ধারাটি প্রচলিত ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধ তন্ত্রেই আমরা নারী-পুরুষের সাধনার কথা পাই। কিন্তু তন্ত্রের নারী পুরুষের সাধনা আর বাউল-ফকিরের নারী পুরুষের সাধনার মধ্যে একটা ভাবগত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্র নারীকে 'মাতৃ' নামে সম্বোধন করে তান্ত্রিক সাধনায় যেখানেই বামাচার সম্পৃক্ত, সেখানে এ-ভাবনাও সুস্পষ্ট যে কেবলমাত্র সাধনার প্রয়োজনে নারীদেহ ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু বাউল-ফকির মতের গড়ে ওঠার পেছনে সহজিয়া বৈষ্ণবের অনেকখানি তাত্ত্বিকতা রয়েছে। তাঁদের সাধনায় নারী 'মাতৃকা' নন, নারীর সঙ্গে সাধকের 'পিরিতি'-র সম্পর্ক। এই সাধনায় শুধু নারী পুরুষের দৈহিক মিলনই কাম্য নয়, আত্মিক মিলনও কাম্য। ফলে আপাতভাবে সাধনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের চেয়ে বাউল-ফকির মতবাদে নারীরা অনেক সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে থাকেন। কিন্তু গভীরে ভাবলে হয়তো দেখা যাবে, বিষয়টি আপতিক। সাধন প্রক্রিয়া এবং তার সিদ্ধি—সবটাই পুরুষের দেহাভ্যন্তরে। সাধন প্রক্রিয়াতে নারী যুক্ত থাকলেও এবং অটল দেহমিলনের সর্বোচ্চতম আনন্দ লাভ করলেও পুরুষের সঙ্গে নারীর এই সাধনসংযোগের বিষয়টিতে নারীর দিক থেকে কোন আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি বা দেহোত্তীর্ণ সিদ্ধির জায়গা আছে কি? —এ বিষয়টি বিতর্ক-সম্ভব এবং নতুন করে ভাবার দাবী রাখে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা পরিসরে আমরা ভিন্ন এক ভাবনার দিকে যাব। তার আগে ভারতে অনুপ্রবেশের পর সুফি মতের সাধনায় 'দেহ' ও 'নারী'-র অনুপ্রবেশ, সাধনার তত্ত্বগত ও কাঠামোগত বিবর্তন এবং লোকায়ত পরিণতি সম্বন্ধে একটা ভূমিকা করার প্রয়োজনেই এই অনুচ্ছেদটি ব্যয়িত হল।

একথা সর্বজনবিদিত যে বাউল সাধকদের তত্ত্বভাষ্য হল তাদের গান, সাধন-সঙ্গীত। সুফিদের মতোই তারাও উপমা-রূপকময় গানে তাদের সাধনার ভাববস্তু এবং তত্ত্ববস্তু ধরে রাখেন। আর যেহেতু তাঁদের সাধনায় দেহতাত্ত্বিক ভাবনা মূল, তাই তাদের রূপকগুলি চমকপ্রদ ভাবে নিজস্ব একটি ঘরানা তৈরি করেছে এ কথা বলাই যায়। এই দেহজ সাধনার ভাবনা থেকেই তারা এই দেহের মধ্যে মসজিদ কাবা, মক্কা-মদিনা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করেছেন এবং তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠাও করেছেন। ফলে বাউল গানে যখন বলা হয় :

মোরাকাবার (মুরাক্বিব্‌হ্‌) নামাজ আগে পড়, মন আমার।
ও এবার একুশ হাজার ছয়শ বারে
নিত্য আসা যাওয়া করে
আবার *দিল মসজিদে* মুর্শিদ বজোগ ধর, মন আমার।।[১৪]

—তখন এ আভাস মেলেই যে এ দিল-মসজিদের সঙ্গে নামাজ পড়ার একটা সংযোগ আছে এবং সে নামাজ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের যৌগিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু বিকল্প সাধনায় মসজিদের রূপকল্প কি বাউল গানেই প্রথম? না, তা নয়। আমরা ত্রয়োদশ শতকে জালালুদ্দিন রুমির সুফি কবিতায় পাই সাধক ও মসজিদের প্রসঙ্গ :

'The mosque that is built in the hearts of saints
Is the place of worship for all, for God dwells there.'[১৫]

রুমির এই ভাবনায় দেহতত্ত্ব অনুপস্থিত। কিন্তু এই ভাবনারও দীর্ঘ কয়েকশত বছর পূর্বে আমরা একই রূপকল্প দেখি আরেকজনের কবিতায়। রাবেয়া-আল-বসরি। তিনি লিখছেন—

In
My soul
there is a temple, a shrine, a mosque.
a church
that dissolve, that
dissolve in
God.[১৬]

—এখানে দেখা যাচ্ছে, শুধু মসজিদ নয়, সমস্ত রকমের ধর্মস্থানই নিজের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করছেন রাবেয়া, যে সর্বধর্ম-সমমাত্রিকতার ভাব জাতপাত-বিরোধী বাউলের গানেও স্বতস্ফূর্ত। এ ছাড়া আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। রুমি বলছেন, সাধকের হৃদয় হল মসজিদ কারণ সেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন (God dwells there); অন্যদিকে রাবেয়া বলছেন, তাঁর হৃদয়ে মসজিদ সহ সব রকমের ধর্মস্থান রয়েছে যেগুলি ঈশ্বরে লীন হয়েছে (that dissolve in God)। ফলে, বোঝাই যাচ্ছে 'ফনা-ফিল্লাহ' বা আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে ঈশ্বরে লীন হয়ে যাওয়ার যে ধারণাটি বাউল-ফকিরদের সাধনাতেও চরম স্তর হিসাবে স্বীকৃত, তার একটা প্রাক্‌-সম্ভাবনা আমরা রাবেয়ার কবিতায় পাচ্ছি।[১৭]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাবেয়ার নিজস্ব উপলব্ধি সঞ্জাত দর্শনভাবনার সঙ্গে বহুযুগ পরের বাউল-ফকিরের তাত্ত্বিক দর্শন-ভাবনায় অন্তঃশায়ী কিছু সাযুজ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফারাক কেবলমাত্র 'দেহ'—এই ভাবনা এবং তার তাত্ত্বিক কাঠামো বিন্যাসে, যে ভাবনা ভারতে সুফির অনুপ্রবেশের পরেই তার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, সাধন স্বীকৃতির প্রশ্নে বাউল নারীকে যতই বঞ্চনা করুক, প্রাচীন নারী-সাধকের একান্ত উপলব্ধির দার্শনিকতাকে নিজের তাত্ত্বিক কাঠামোয় খাপ খাইয়ে নিতে সে কসুর করেনি। এখান থেকে দেখলে বিকল্প সাধনা সাধনা ও নারী—এই ভাবনা পরিসরে ভিন্ন আরেকটি মাত্রা সংযুক্ত হয়। বর্তমান প্রবন্ধেরও শেষ প্রস্তাবনা সেটাই। অন্তিমে বলার, যে এই প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে বৈষ্ণব (মীরাবাঈ) ও শৈব (লাল দেদ্‌) সাধিকাদের দর্শনভাবনা ও রচিত সাহিত্যের সঙ্গে সহজিয়ার প্রতিতুলনা করা হলে নতুন

বিতর্ক-পরিসর তৈরি হতে পারে এবং নারী-র প্রেক্ষিত থেকে আলোচ্য বিষয়টিকে দেখার আরো বৃহত্তর সুযোগ তৈরি হওয়া সম্ভব। সম্ভব 'দেহ'-সংশ্লিষ্ট বিতর্কের নতুনতর দিক উন্মোচন। ভবিষ্যতে কোন প্রবন্ধে সেই ভাবনার ভূমিকা করার আশা রইল।

তথ্যপঞ্জি :

১. মার্গারেট স্মিথের মতে ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে (৯৫ বা ৯৯ হিজরি) রাবেয়া-র জন্ম। দ্র: Margaret Smith, *Rābi'a Basri The Mystic & Her Fellow-Saints in Islam*, New Delhi : Adam Publishers and Distributors, 2010

২. Ranjit Hoskote (trans.) *I, Lalla : The Poems of Lal Ded*, New Delhi : Penguin Books India, 2011

৩. S.A.A. Rizvi, *A History of Sufism in India*, New Dellhi : Munshiram Monoharlal, ১৯৭৫

৪. 'বৈষ্ণব সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ বলেন, 'গায়ত্রী বীজ সিদ্ধ করিতে পারিলে সাধকের চিন্ময় স্বভাব-প্রকৃতির উন্মেষ হয়। এই স্বভাব-প্রকৃতিই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার অংশ। ভাব সাধনায় ভক্ত-সাধক যতই অগ্রসর হন, ততই তাহার স্বভাব-প্রকৃতি পূর্ণ কলা-বিভাগের দিকে ধাবিত হয়। সাধনার সিদ্ধিতে সাধক প্রকৃতিই শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ কলা-রূপিণী হ্লাদিনী শক্তি রাধাতে পরিণত হয় এবং অপরোক্ষ ভাবে কৃষ্ণের সহিত তাহার মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়—

...বিশুদ্ধ সত্ত্ব মানুষ প্রকৃতি রাধিকা।
অতএব নাম তার চম্পক কলিকা।।
চম্পক কলিকা চন্দ্রকাননে বনবাস।
সেই সে রাধিকা দ্বারা রাধিকা প্রকাশ।।
সেই সে অংশিনী রাধা গোলোক রতিপতি।
লীলা রাধা তার নাম মানুষ প্রকৃতি।।'

(বিবর্তবিলাস, পৃ. ১৪)

দ্র: পরিতোষ দাস, 'সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম', কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃ: ১২৪-১২৫

৫. Margaret Smith, *Rābi'a Basri the Mystic and Her Sellow Faints in Islam*, New Delhi : Adam Publishers and Distributors, 2010

৬. A. J. Arberry (trans.) '*Muslim Saints and Mystics' (Episodes from the Tadhkurat -al-Auliya' by Farid al-Din Attar)*, lowa : Omphaloskepsis, 2000, P. 29

৭. এই ভাবনা আরো সুপ্রকাশিত হয় তাজ্‌কিরাত-উল-আউলিয়ারই আরেকটি অংশে। একবার একদল পুরুষ রাবেয়ার কাছে তত্ত্বকথা শুনতে আসে এবং তার পরীক্ষা নেবার জন্য বলে : 'All the virtues have been scattered upon the heads of men. The crown of prophethood has been placed on men's heads. The belt of nobility has been fastened around men's waists. No woman has ever been a prophet'। রাবেয়া এর উপযুক্ত জবাব দেন, কিন্তু বর্তমান আলোচনায় তা এখন আসবে না। যেটা লক্ষ্য করার, তা হল ইসলাম ধর্ম এবং সামাজিক সদ্‌গুণ, ধর্মীয়সিদ্ধির কৃতিত্ব'-এগুলির প্রতি তৎকালীন পুরুষ-শাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। দ্র: পূর্বোক্ত *Muslim saints and Mystics* পৃ: 82

৮. The Holy Bible, Old Testament King James Verson, Jeremiah.

১০. William Ralph Inge, D.D. *Christian Mysticism*, London : Methuen & Co. Ltd, 1913, P. 369

১১. কার্থেজের অধিবাসী Tertullian (১৬০-২৩০ অব্দ) খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্বের একজন বিশারদ ছিলেন এবং খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক পর্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ছিলেন।

১২. William Ralph Inge, D.D. *Christian Mysticism*, London : Methuen & Co. Ltd, 1913, P. 370

১৩. *Rabia al Basri poems, If I Adore you*, PoemHunter. Com, 2012, accessed on 25.4.2013.

১৪. আবদুল হালিম রচিত পদ, 'আসান নগর' নামক বাউল গানের অডিও-সিডি থেকে সংগৃহীত, প্রকাশক : বাংলানাটক ডট কম

১৫. Sashibhusan Das Gupta, *Obsecure Religions Cults*, Kolkata : Firma KLM Pvt. Ltd, 1976, P. 173

১৬. *Rabia al Basri poems*, Poem Hunter. Com, 2012, accessed on 25.4.2013

রবীন্দ্র-প্রবন্ধে রাজনীতি ভাবনা : উন্মেষ পর্ব ১৮৮৩-১৮৯৮

শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিয়ে ইতিপূর্বে অনেকে কাজ করেছেন। শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদারের ৬ খণ্ড 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নিঃসন্দেহে পরিশ্রমী কাজ। পরবর্তী সময়ে ড. অরবিন্দ পোদ্দার 'রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' বইটিতে সমসায়মিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। চিন্মোহন সেহানবীশ-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' বইটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ সমস্ত উপাদান থেকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার স্বরূপটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। "ছোটো ইংরেজ বড়ো ইংরেজের তত্ত্বে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জীবন-সায়াহ্নে পরিণত হয়েছেন 'সভ্যতার সংকটের' মন্থনের ভিতর থেকেই 'মহামানবে'র নিশ্চিত আবির্ভাবে, 'মানব-অভ্যুদয়ে' বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথে।"[১] সমকালের অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা যে অনেক স্বচ্ছ এবং অভ্রান্ত ছিল দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে আজও অনেকে কুণ্ঠা বোধ করেন। ফলে রবীন্দ্রচর্চার এই বিশেষ দিকটি আজও প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে।

রবীন্দ্রমানস ও চরিত্রগঠনে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার শুধুমাত্র বঙ্গের নয়, উপমহাদেশের রাজনীতিসচেতন ও সংস্কৃতিবান পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম। সরকার বিরোধিতাই রাজনীতির একমাত্র লক্ষণ নয়, সরকারকে সহযোগিতা ও আবেদন-নিবেদনের মধ্যেও পরোক্ষে রাজনীতি জড়িয়ে থাকে। উনিশ শতকের রাজনীতির সর্বোচ্চ গুণ ও দোষ ঠাকুর পরিবারে প্রবেশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে সেকথা অকপটে স্বীকার করেছেন। কলকাতার এক গলির মধ্যে কোনও এক পোড়ো বাড়িতে 'স্বাদেশিকের' সভা বসত। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেই সভার সভাপতি। সেই সভায় 'ক্ষাপামির তপ্ত হাওয়া' বইত। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিচিন্তা জন্মলগ্নেই পূর্ণ পরিণতিতে আত্মপ্রকাশ করেনি। দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ঘটনার সাযুজ্যে ক্রম পরিণতির দিকে এগিয়েছে। যথার্থভাবে রবীন্দ্র-রাজনীতির পাঠ নিতে গেলে তাকে ঐতিহাসিক কালানুক্রমে দেখাই সঙ্গত। 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' ১৯২৯, প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। ...যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে, তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত ...কোন বাঁধাধরা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনও এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।"

পার্সিবাগানে 'হিন্দুমেলা'র নবম অধিবেশনে ১৮৭৫ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম স্বদেশমূলক কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' পাঠ করেন। কবির আত্মবিকাশের পথে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এই কবিতায় কবি প্রথম ব্যক্তি ও বিশ্বের দুটি পৃথক জগৎকে একসূত্রে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। সমসময়ে 'ভারতী'তে একাধিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এবং প্রবন্ধগুলিতে দেশের সমকালীন সমস্যাগুলিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করেছেন। দেশের

সমস্যাকে সমগ্র বিশ্বের নিরিখে আলোচনা করায় প্রবন্ধগুলি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যদিও কবি 'জীবনস্মৃতিতে' এগুলিকে 'যা খুশি তাই' লেখা বলে উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যলিপ্সাকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন 'দয়ালু মাংসাশী' ১২৮৮ প্রবন্ধে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তখন সাম্রাজ্যবাদী ডিস্‌রেলির নেতৃত্বে রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিত্ব। ডিস্‌রেলির সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার আদেশ হয়। জুলুভূমি সাম্রাজ্যভুক্ত করার প্রকট লালসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বাঁকা ভাষায় লেখেন—"বিখ্যাত ইংরেজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গোরু... দেখা যাক্, বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। ...উদ্ভিদভোজী ভারতবর্ষকে ইংরেজশ্বাপদেরা দিব্যি হজম করিতে পারিয়ছেন, মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সভাল পেটে মুলেই সহিল না।"[২] সমসময়ে ভারতবর্ষে বড়োলাট লিটনের আফগান নীতির ফলে 'দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ', আফগানদের পরাজয়, কান্দাহারে স্বতন্ত্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা ১৮৮০ স্মরণীয়।

আফ্রিকাও এশিয়া জুড়ে ইংরেজ ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অবাধ আগ্রাসন কবির মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকার চিনের করুণ অবস্থা রবীন্দ্রনাথকে দারুণভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। থিওডোর ক্রিস্টলীব-এর 'The Indo British Opium Trade' গ্রন্থটির ইংরেজি তর্জমা পাঠ করে কবির মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী কূট অভিসন্ধির তীব্র সমালোচনা করে কবি 'চীনে মরণের ব্যবসায়' ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ প্রবন্ধে বলেন—"একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বিষপান করানো হইল। এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল,—'আমি অহিফেন খাইব না।' ইংরেজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুইটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল—'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।'..."

রাজনীতির সীমাহীন অর্থলালসাকে রবীন্দ্রনাথ যেরকম শাণিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন, সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির পরিচিত আবেদন-নিবেদনের সুরের সঙ্গে সহজে মেলে না। এই প্রবন্ধটি যখন লেখা হয় তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়নি। এমনকি সমকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে তখনও এমন বাস্তব সচেতনতার বোধ গড়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথ বিলেতযাত্রার ১৮৭৮ আগেই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচিত্র 'পলিটিকাল ইকোনমি' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রভুত্বের নেশায় মশগুল ইংরেজ জাতির মনুষ্যত্ব সর্বৈব নিখাদ নয়। ১৮৮০ সালে স্বদেশে ফেরার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণনীতি ও হীন মনোবৃত্তিকে কটাক্ষ করে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার একটি অশালীন উক্তির প্রতিবাদে 'জুতা ব্যবস্থা' 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮, প্রবন্ধটি লেখেন। পত্রিকাটিতে বাঙালিদের প্রতি মন্তব্য করে বলা হয়েছিল 'Kick them first and then speak to them' ইংরেজের এই ঔদ্ধত্য বাঙালির আত্মমর্যাদাকে চরম অপমান করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তা সহ্য করেননি। বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তিনি বলেন, "গবর্নমেন্ট একটি আইন জারি করিয়াছেন যে, যেহেতু বাঙালিদের শরীর অত্যন্ত বেযুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেন্টের অধীনে যে যে বাঙালি কর্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কর্মারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে।" আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে মুসাবিদা করে যে মুনাফাই হোক না কেন, তা কখনোই দেশ, জাতি এমনকি নিজের পক্ষেও মঙ্গলকর নয়, এ বিচক্ষণতা ও বলার সাহস সমকালীন অন্যান্য নেতাদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে দেখা যায়নি। বলা যেতে

পারে ইউরোপ সম্পর্কে কবির মোহভঙ্গের শুরু এখান থেকে। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে এমন আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ খুব বেশি চোখে পড়ে না। তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মশক্তির বিকাশ না ঘটিয়ে বাইরে উত্তেজনা সৃষ্টিতে সাময়িক লাভ হলেও স্থায়ী ফল ফলে না। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গিগত শুদ্ধতা কালের সীমানা অতিক্রম করে আজও প্রাসঙ্গিক।

১৮৮৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, কলকাতায় আয়োজিত হয় 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'। সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই কনফারেন্স তিনদিন চলে। মাস ছয়েক আগে 'ইলবার্ট বিল' সংক্রান্ত আন্দোলনে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে উক্ত কনফারেন্স সমধিক গুরুত্ব পায়নি। পট্টভি সীতারামাইয়া 'The history of Indian National congress' গ্রন্থে সম্মেলনের গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে উক্ত সম্মেলনের নেতিবাচক দিকটি প্রাধান্য পেয়েছিল। কেননা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থ উৎকটভাবে প্রকটিত হয়েছিল। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ উপেক্ষিত ছিল। প্রতিবাদে তিনি 'চেঁচিয়ে বলা' 'ভারতী', চৈত্র, ১২৮৯ এবং 'জিহ্বা আস্ফালন' 'ভারতী', শ্রাবণ, ১২৯০ প্রবন্ধ দুটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনাল ফণ্ড' 'ভারতী', কার্তিক, ১২৯০ প্রবন্ধটিকে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও শিক্ষাবিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন বলা যেতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দেশের রাজনৈতিক কাজ পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সালের ১৭ই জুলাই। রবীন্দ্রনাথ এই 'ফণ্ড' স্থাপনের উদ্দেশ্যকে ভালো চোখে দেখেননি। তিনি বললেন, "আমাদের দেশে Political agitation করার নামে ভিক্ষাবৃত্তি করা। ... ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা পাইয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না। ... ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরতার ফল স্থায়ী।" তৎকালীন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করে জনশিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা জনশিক্ষা না থাকলে জনচেতনা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এবং সে শিক্ষার ভাষা অবশ্যই জনগণের ভাষা হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে চারিদিকে 'বঙ্গবিদ্যালয়' তৈরি করার কথা বলেছেন। লক্ষণীয়, শিক্ষা সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি।

দেশের মঙ্গল করার নামে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়া, ভাবের ঘরে চুরি করাকে রবীন্দ্রনাথ সবসময় ঘৃণা করেছেন। 'টৌনহলের তামাশা' 'ভারতী' পৌষ, ১২৯০ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের স্ববিরোধী চরিত্রের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন শাণিত ভাষায়। কলকাতার টাউনহলে তৎকালীন বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্তা ইংরেজ রাজপুরুষদের নিয়ে সভা করেছিলেন ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ সুযোগসুবিধা আদায় করে নেওয়া। এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যথিত আত্মমর্যাদাবোধ বিদ্রূপাত্মক হয়ে ওঠে। "যাহারা দেশকে অপমান করে, দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে না। একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের পাটি সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণাবোধ হয়।" আক্রমণের লক্ষ্য তৎকালীন উচ্চবিত্ত শ্রেণি। 'একটুখানি কাল্পনিক সুবিধার আশা' পেলে এঁরা নিজের এবং দেশের অপমানকেও অনায়াসে হজম করতে পারে।

'হাতে কলমে' 'ভারতী', আশ্বিন, ১২৯১, প্রবন্ধটিও সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের

প্রেক্ষিতে লেখা প্রতিবাদী রচনা। সাবিত্রী লাইব্রেরির অন্তর্গত সাবিত্রী সভার অধিবেশনে ৯ ভাদ্র, ১২৯১ কবি প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা না দিয়ে গঠনমূলক কাজের কথা বলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি না হলে তাদেরকে রাজনৈতিক সচেতন করে তোলা অসম্ভব। নেতাদের গ্রামীণ মানুষের সমান স্তরে এসে দাঁড়াতে হবে। সেবার দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। রবীন্দ্রচিন্তার মূল শক্তি যে আত্মনির্ভরতা, আত্মশক্তির উদ্বোধন তার মূল বীজ এই প্রবন্ধে নিহিত।

নিবিষ্ট শিল্পীসত্তার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ. নিজের দেশকালের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারননি। ব্রিটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থ ভারতবর্ষকে পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির উৎসে পরিণত করে ফেলেছিল। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল। শ্রমজীবী মানুষকে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বাস্তব সমস্যার চাপে তৈরি হয়েছিল তীব্র অভাব ও অসন্তোষ। যার পরিণতি দুর্ভিক্ষ ১৮৭১, দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহ ১৮৭৫। পরিতাপের বিষয় সাধারণ মানুষের এই দুর্দশা ও অসন্তোষকে তৎকালীন শিক্ষিত ভদ্রসাধারণ নিজের করে নিয়ে পরিকল্পিত বিদ্রোহের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি। অথচ হিউম বিভিন্ন সরকারি গোপন রিপোর্ট থেকে সাধারণ মানুষের ক্রমশ বেড়ে ওঠা ক্ষোভের কথা জানতে পেরে শিক্ষিত ও সহযোগিতাপ্রবণ ভদ্রসাধারণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫। সঙ্গত কারণেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী জানিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার আইনসম্মতভাবে পেতে চান ঠিকই, কিন্তু তা কখনোই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক আনুগত্য অস্বীকার করে নয়। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৮৮৬, দাদাভাই নৌরাজী সভাপতির অভিভাষণে জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস কখনোই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্বের আরেকটি ভিত্তিভূমিস্বরূপ। তৎকালীন এই আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের মতটি বিশেষ করে বুঝে নেওয়া দরকার।

কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম দু-তিনটি অধিবেশনের সময় রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ছিল না। লক্ষ করলে দেখা যাবে একটা সময় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির তিনি তীব্র সমালোচক। পরবর্তীকালে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে সমর্থনও করেছেন। কবির সংবেদনশীল মনে যখন যেটি সত্য মনে হয়েছে অকপটে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্র মানসিকতার এই স্ববিরোধ 'মন্ত্রি অভিষেক' 'ভারতী', বৈশাখ, ১২৯৭ প্রবন্ধের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। কলকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উপলক্ষে যে সভার আয়োজন করা হয়, সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল, ইংরেজ সরকার তার মন্ত্রিসভায় ভারতীয় সদস্যসংখ্যা বাড়াতে রাজি, কিন্তু এই সদস্য মনোনয়নের ভার নিজের হাতেই রাখতে চায়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে থাকাই যুক্তিযুক্ত। কংগ্রেসি আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন না করলেও 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের উপর আস্থা রেখেছেন এবং কিছুটা প্রশস্তিও করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচিত হতে হয়েছে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে কঠিন সমালোচনা করে বলেছেন, "...'হাতে-কলমে'র কর্তা রবীন্দ্রনাথ যাহার দোষ ঘোষণা করিয়াছেন, 'মন্ত্রি অভিষেকের' বক্তা রবীন্দ্রনাথ তাহারই অতি সুন্দর সমর্থন করিয়াছেন।"[৩] রবীন্দ্রনাথের কাছে

ব্যাপারটি যে অস্পষ্ট তা নয়, সামনে কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ ছিল না। তাঁর এই সীমাবদ্ধতার প্রশ্নে পরবর্তীকালে নিজেই এই প্রবন্ধের সমালোচনা করে বলেছেন, "যখন 'মন্ত্রি অভিষেক' লিখেছিলুম, তারপর এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে'... আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচালুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্য। ... তখন সেই ইঞ্চি দূরত্বের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়।"[৪] অরবিন্দ পোদ্দার কবির 'গরম ভাষার' সত্যতা মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে যা আছে তা শুধুই 'নতজানু প্রার্থনা'। তর্ক-বিতর্ক, সমালোচনার ঝড় যাই উঠুক না কেন, 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটিকে আমরা সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-রাজনীতিভাবনার একটি মূল্যবান স্তর হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' প্রকাশিত হয় ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার অন্যতম লেখকমাত্র নন, তাঁর 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' এবং তৎকালীন বহু রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ 'সাধনা'তেই ছাপা হয়েছিল। 'কর্মের উমেদার' 'সাধনা' মাঘ, ১২৯৮ প্রবন্ধে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমালোচনা করে বললেন, "আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। ... স্বপ্নেও ভাবি না যে, স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আমাদের এ-অবস্থার কোনো প্রতিকার হইতে পারে।" আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ মূলত 'কর্ম' আর 'যন্ত্রের' বিরুদ্ধে। লক্ষ করার বিষয়—ইউরোপ সম্পর্কে কবির তখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে।

'স্যার লেপেল গ্রিফিন' 'সাধনা' শ্রাবণ, ১২৯৯, প্রবন্ধটি মূলত একটি জবাবি প্রতিবাদ। স্যার লেপেল গ্রিফিন নামক জনৈক ইংরেজ বাঙালির জাতীয় চরিত্রকে কটাক্ষ করে 'ফর্ট নাইটলি রিভ্যু' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। জাতির এহেন অপমান রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। বিদ্রূপাত্মক ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—"কুকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে। তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকার গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই, কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। ... লেখকের অভিপ্রায় যেমনি হউক, বাঙালিদের তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ উক্ত আওয়াজে আর কোনো ফল না হউক, আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে।"

১৮৯২ সালের 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট'-এর সরকারি চাকরিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি উপেক্ষিত হল। উত্তেজনার পারদ চড়ল ভারতীয় রাজনীতিতে। সেইসময় চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' 'সাধনা', অগ্রহায়ণ, ১৩০০, শীর্ষক প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। সভার সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল—"সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। ... কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। ... আমাদের অন্তরের শূন্যতা পুরাইতে না পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই।" বিস্ময়ের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ যখন জাতীয় অপমানের প্রতিবাদ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করছেন, তখন আশ্চর্যরকমভাবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে সমর্থন কিংবা প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল বিল'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর থেকে কংগ্রেস বুদ্ধিজীবীদের একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজ সরকার ব্যাপারটিকে ভালো মনে নেয়নি। নানা কৌশলে জাতীয় ঐক্য এবং কংগ্রেসে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে।

সমসময়ে মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে একটি নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তৈরি হয়। বিশেষ করে 'গোরক্ষণী সভা' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুম্বাই, বিহার, উত্তরপ্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বেধে যায়। এই বিরোধের পশ্চাতে পরোক্ষে ইংরেজদের অদৃশ্য হাত ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়ায় তিনি 'ইংরেজের আতঙ্ক' 'সাধনা', পৌষ ১৩০০, প্রবন্ধটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট—"কংগ্রেসের আর কোনো ক্ষমতা থাক বা না থাক গলার জোর আছে ... এতদিনে ইংরেজ এ কথাটা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে হিন্দুর হস্তে পলিটিকস্ তেমন মারাত্মক নহে। ... মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কংগ্রেস হইতে আশু আশংকার কারণ নাই।"

এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকার 'ম্যাটাবিলি যুদ্ধ'-র খবর কবি জানতে পারেন। রোড্সের সেনাপতিত্বে ইংরেজরা ম্যাটাবোল্যান্ড অভিযান করে। অশিক্ষিত লবেঙ্গুলার সরলতা এবং ইংরেজি না জানার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। 'ট্রুথ' (Truth) পত্রিকায় উক্ত 'ম্যাটাবিলি যুদ্ধ'-র বিবরণ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ 'রাজনীতির দ্বিধা' 'সাধনা', চৈত্র, ১৩০০, প্রবন্ধটি লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে কবি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন, "পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক, মোটা বেতনের ইংরেজ কর্মচারীকে রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। ... তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পাবলিক ওয়ার্কস্ কিছু কিছু খাঁটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ ফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।" সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ অমানুষিকতায় কবি ব্যথিত হয়েছেন। আর্ত মানুষের ক্রন্দনে বিচলিত হয়েছেন।

'রাজা ও প্রজা' 'সাধনা', চৈত্র, ১৩০১, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের কড়া সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কিপলিঙের নাম করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী কবি কিপলিঙ্-দের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, "অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক সুতীব্র ক্ষমতা মদিরার আস্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড মত্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতা-দম্ভ প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষের লেখনিতে অকৃত্রিম অসংকোচ পৌরুষ আকারে একপ্রকার ভীষণ রমনীয়তা ধারণ করে; ইহা ইংরেজের পক্ষে সাহিত্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।" রবীন্দ্রনাথ সমকালীন অন্যান্য নেতাদের মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান না চাইলেও সুবিচার চেয়েছেন। প্রতিবাদ করেছেন।

কংগ্রেস যখন ইংরেজদের তোষামোদে ব্যস্ত তখন ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয়রা অপমানিত হচ্ছে। জাতীয় সিভিলিয়ন বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে এক ইংরেজ অধ্যক্ষের গৃহে আমন্ত্রিত হন রবীন্দ্রনাথ। আমন্ত্রকের গৃহে অপমানকর মন্তব্য শুনে তিনি আহত ও অপমান বোধ করেন। প্রত্যুত্তরে 'অপমানের প্রতিকার' 'সাধনা', ভাদ্র, ১৩০১, প্রবন্ধটি লেখেন। ইংরেজের মুখে 'ন্যায়নীতি ও ধর্মনীতি'র বড়াই হজম করতে পারেননি। তাই এদেশীয় ইংরেজ সমাজের নৈতিক চরিত্রের সমালোচনা করে আলোচ্য প্রবন্ধে বলতে শুনি, "প্রসঙ্গক্রমে জুরির প্রথার কথা উঠল। ইংরেজ প্রফেসর কহিলেন, যে দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।"

তিলককে কেন্দ্র করে পশ্চিম ভারতে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল কালবিলম্ব না করে তা

পূর্ব ভারতে আছড়ে পড়ে। একদিকে শিবাজী উৎসব ১৩ জুন ১৮৯৭, প্লেগ, মহামারী অন্যদিকে ইংরেজ কর্মচারীদের উদাসীনতা ও অপদার্থতা উভয়ে মিলে এক অভিনব উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। 'সিডিশন বিল'-এর অস্পষ্ট পদধ্বনি তখনও বর্তমান। এমতাবস্থায় প্লেগ নিবারণ কমিটির সদস্য ডব্লিউ.সি.র‍্যান্ড এবং লেফটেন্যান্ট হ্যারেস্ট ২৩শে জুন ১৮৯৭ হত্যার সূত্রে তিলককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন পর নাটুভাই যুগলকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮২৭ সালের এই ফৌজদারি আইনের ২৫ নং ধারা মোতাবেক এবং অন্তরায়িত করা হয় সবার অলক্ষ্যে। এখানেই শেষ না হয়ে নাটুভাই যুগলের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারই প্রতিবাদে কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কবির ভাষণটি পরবর্তীতে 'ভারতী', বৈশাখ, ১৩০৫, প্রকাশিত হয়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে কবি উক্ত প্রবন্ধে বলেছিলেন—"ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম, গবর্মেন্ট অত্যন্ত চমকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের লৌহশৃঙ্খল টানিয়ে বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। ... রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন এক অজ্ঞাত, অপরিচিত, বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো পড়িয়া নাটু ভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে।" পরবর্তীকালে ভারতীর প্রসঙ্গ-কথায় জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, ইংরেজের বর্বর দমনপীড়ার নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি ভয়ের নিষ্ঠুরতা মাত্র। ... এবার প্যুনিটিভ পুলিশ, নাটু-নিগ্রহ, সিডিশন-বিলের দ্বারা গর্বমেন্ট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা স্বল্পসংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করি না।"

শিবাজী-উৎসবের ঢেউ যখন বাংলায় পৌঁছায় তখন রবীন্দ্রনাথ তাতে অংশ নিয়েছিলেন। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তকটির ভূমিকা রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন। কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু সেই সময়ের চাটুকারিতা সর্বস্ব পাগড়িধারী লেজুড় সম্প্রদায়ের তুলনায় কংগ্রেসকে তাঁর অনেকটা প্রগতিশীল বলে মনে হয়েছিল। স্বজাতির ঘৃণিত মিথ্যাচার ও আত্মবমাননার বিরুদ্ধে কবি 'মুখুজ্জে বনাম বাড়ুজ্জ্যে' 'ভারতী' ভাদ্র, ১৩০৫ ও 'আলট্রাকনসার্ভেটিভ' 'ভারতী' কার্তিক, ১৩০৫, সমালোচনা করেছেন। 'আলট্রাকনসার্ভেটিভ' প্রবন্ধে কবি বলেছেন, "তবু অতিভক্তিতে তোমাদের কাছে কন্‌গ্রেসকে হার মানিয়ে হইবে। ...তুমি যে রাজভক্তির প্রচুর তৈল-লেপনে পায়োনিয়র পত্রটাকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহার মধ্যে কত অভিসন্ধিই আছে। ... তুমি বল কংগ্রেস মন্দ, আমিও বলি তাই; ... ইতি তোমাদের আদরের আলট্রাকনসার্ভেটিভ।" বাঙালির সুবিপুল আত্মদৈন্যর মধ্যে তিলকের অভিষেক যেমন কালান্তর ঘটনা তেমনি অন্যদিকে স্বদেশি যুগের সূত্রপাতও — লর্ড কার্জন সেখানে উপলক্ষ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজসেবাকে তিনি রাজনীতি থেকে আলাদা করে ভাবেননি। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময় ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সেবাকাজে সহযোগিতা করেছেন। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় তিনি নিরব সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করেননি। প্রত্যেকটি ঘটনা প্রসঙ্গে মনুষ্যত্বের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। উনিশ শতকের শেষভাগে জাতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ও নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারবাদী আন্দোলনকে যেমন রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে

পারেননি, তেমন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ অমানুষিকতা কবিমনে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। পরাধীন স্বদেশকে তিনি কখনো আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবেননি, তাই তাঁর ভাবনার স্বচ্ছতা ও চিন্তনের গভীরতা সুদূরপ্রসারী এবং তাৎপর্যবহ।

উল্লেখপঞ্জি

১। 'রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব'; চিন্মোহন সেহানবীশ, 'পরিচয়' শারদীয় ১৯৮২, পৃ. ৩৫।

২। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' : অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।

৩। 'নব্যভারত', পৌষ ১২৯৭, পৃ. ৪৯৫।

৪। 'শনিবারের চিঠি', মাঘ ১৩৪৬, পৃ. ৪৭৫।

সত্যজিতের ফেলুদা : গোয়েন্দা কাহিনির অন্তরালে ভ্রমণ সাহিত্যের আস্বাদ

শাখী ঘোষ

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে অনন্য প্রতিভা রায়পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র সত্যজিৎ রায়। তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর ও পিতা সুকুমার যে শিল্পচেতনার জন্ম দিয়েছিলেন, সত্যজিৎ ছিলেন তারই উত্তরসূরি। চিত্র, চলচ্চিত্র, ক্যালিগ্রাফি, কোরিয়োগ্রাফি, সাহিত্য, সংগীত সব কিছুতেই তাঁর অবদান ছিল শীর্ষে। তবে, তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত হয়েছিলেন চলচ্চিত্রকার হিসাবে। চলচ্চিত্র নির্মাণের অবসরে তিনি গল্প রচনাও করতেন। তাঁর এই গল্পরচনার সূত্রপাত নিতান্ত প্রায়োজনিক কারণে মাতৃদেবীর অনুরোধে 'সন্দেশ' পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের সূত্রে। কিন্তু, গল্প রচনার সময় সকল প্রায়োজনিকতার বাধা অতিক্রম করে হৃদয় ও মননরসে সিঞ্চিত হয়ে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত কাহিনিগুলোর মধ্যে অন্যতম ফেলুদা কেন্দ্রিক গোয়েন্দাকাহিনিমূলক সিরিজ।

সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজের প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সন্দেশ' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে। এরপর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সত্যজিতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দা উপন্যাস 'বাদশাহী আংটি'। এই সময় থেকেই ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার পাঠক সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মূলত কিশোর সাহিত্য হলেও তাঁর ফেলুদা সিরিজের গল্পগুলো আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রখ্যাত সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে—"আরো বলার কথা, ছেলেমেয়েরা এবং বুড়োরা সবচেয়ে আগে কাড়াকাড়ি করে পড়েছে 'ফেলুদার কাহিনী'।"[১]

সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজের গল্প-উপন্যাস সংখ্যা সর্বমোট ৩৪টা। সেগুলো হল— 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' (১৯৬৫), 'বাদশাহী আংটি' (১৯৬৯), 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' (১৯৭১), 'সোনার কেল্লা' (১৯৭১), 'বাক্স রহস্য' (১৯৭৩), 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' (১৯৭৪), 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' (১৯৭৫), 'জয় বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৬), 'গোরস্থানে সাবধান' (১৯৭৯), 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' (১৯৮১), 'হত্যাপুরী' (১৯৮১), 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' (১৯৮২), 'টিনটোরেটোর যীশু' (১৯৮৩), 'দার্জিলিং জমজমাট' (১৯৮৭), 'নয়ন রহস্য' (১৯৯১)। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ছাড়াও ফেলুদাকে নিয়ে আরও বেশ কিছু ছোটো এবং বড়ো গল্প লেখা হয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আরো এক ডজন' গল্পসংকলনে রয়েছে তিনটি ভিন্ন স্বাদের ফেলুদার রহস্যকাহিনি—'শেয়াল দেবতা রহস্য', 'সমাদ্দারের চাবি', 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'। 'ফেলুদা অ্যান্ড কোং' (১৯৭৯)-এ প্রকাশ পেল আরও দুটি গল্প—'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' ও 'গোঁসাইপুর সরগরম।' 'আরো বারো' গল্পসংকলনে রয়েছে 'গোলোকধাম রহস্য'। 'ফেলুদা ওয়ান, ফেলুদা টু' (১৯৮৫)-তে রয়েছে দুটি রহস্যকাহিনি— 'নেপোলিয়নের চিঠি' ও 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে'। 'একের পিঠে দুই', (১৯৮৮)— এই ছোটো গল্পসংকলনে আছে 'বোসপুকুরে খুনখারাপি'। 'ডবল ফেলুদা' (১৯৮৯)-তে রয়েছে 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা', 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর'। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে শারদীয়া সংখ্যা 'সন্দেশ'-এ বেরোয় আর

একটি ফেলুদাকেন্দ্রিক উপন্যাস 'ডঃ মুনসীর ডায়েরি' যা পরে 'সেরা সত্যজিৎ' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'ফেলুদা প্লাস ফেলুদা'। এতে দুটো গল্প আছে—'গোলাপী মুক্তা রহস্য' ও 'লন্ডনে ফেলুদা'।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের গল্প উপন্যাসগুলো খাঁটি ডিটেকটিভ গল্পের পর্যায়ে পড়ে। তথাকথিত অ্যাডভেঞ্চার মূলক mystery গল্প এগুলো নয়। তিনি নিজে ছিলেন আর্থার কোনান ডয়েলের অনুরাগী। এর পাশাপাশি তিনি অগাথা ক্রিস্টি, আবার শরদিন্দুর ব্যোমকেশও পড়েছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রচলিত গোয়েন্দাকাহিনির ফর্ম ও ট্রাডিশন কখনো কখনো অনুসরণ করেছেন। সত্যজিতের ফেলুদা কেন্দ্রিক কাহিনিগুলোয় মুখ্য ভূমিকা ফেলুদার একার এবং মুখ্য আকর্ষণও ফেলুদা। এই গল্পে তোপসের ভূমিকা একজন সক্রিয় বিবৃতিকারের অর্থাৎ যে কাহিনিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকে কাহিনিকে বিবৃত করে। সে একাধারে ফেলুদার অনুরাগী ভক্ত এবং একজন বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষক। তবে একথাও বলার যে, তোপসে narrator বা বিবৃতিকার হলেও তাকে পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করেছে ফেলুদাই। সে পরোক্ষ guide-narrator. ফেলুদা কাহিনির আর এক চরিত্র লালমোহনবাবু সাধারণ সাদামাটা মানুষের archetype চরিত্র, কাহিনিতে তিনি comic-relief হিসাবে ব্যবহৃত। সত্যজিতের সৃষ্ট এই তিনটি চরিত্র নিঃসংশয়ে জীবন্ত এবং convincing হলেও, এই কাহিনিতে সার্বিক বাংলা ডিটেকটিভ গল্পের ত্রিশূল প্যাটার্ন তিনি কোথাও অনুসরণ করেননি।

সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কাহিনির পটভূমি বা অকুস্থলের ভূমিকা, তাঁর প্রতিটি গোয়েন্দাগল্পেই ঘটনাস্থল একটি জীবন্ত চরিত্ররূপে এসেছে। পটভূমির এই অতিরিক্ত ভূমিকা তাঁর গোয়েন্দাকাহিনিতে ভ্রমণকাহিনি বা travelogue-এর স্বাদ এনে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ স্বয়ং অরুণ বাগচীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> "ফেলুদার গণ্ডী হচ্ছে ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষের মজাদার জায়গাগুলোতে সে যায়। রাজস্থানই বলুন, সিকিমই বলুন, কিংবা বেনারসই বলুন—জায়গাগুলো মোটামুটি আমার দেখা এবং আমি মুগ্ধ হয়েছি বলেই আমার নিজের ফীলিং কিছুটা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছি। সেই জায়গাগুলোকে যথাসম্ভব জ্যান্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছি।"[২]

সত্যজিতের কাহিনিগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর ৩৪টি গল্প উপন্যাসের মধ্যে প্রায় ২০টিতে ভ্রমণকাহিনির স্বাদ আছে। সত্যজিতের ভ্রমণ পিপাসাই এর অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। প্রথমে ছাত্রাবস্থায়, তারপর ডি.জে. কিমারে চাকরি করা কালীন এবং পরে সিনেমার শ্যুটিং-এর কাজে তাঁকে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে হয়েছে। ফলত তাঁর লেখায় ভ্রমণকাহিনির উপাদান অনিবার্যভাবে চলে এসেছে। শৈশবে পিতার মৃত্যুর পর স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশে তিনি তাঁর মা সুপ্রভা দেবীর সাথে চেঞ্জে যেতেন—কখনো লক্ষ্ণৌ, কখনো দার্জিলিং, আবার কখনো বিহার। লক্ষ্ণৌতে তিনি তাঁর মা'র মাসতুতো ভাই অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে থাকতেন। দার্জিলিং-এ যেতেন তাঁর মাসির বাড়িতে আর বিহারে ছিল তাঁর পিসেমশাইয়ের বাড়ি। তাঁর পিসেমশাইকে কর্মসূত্রে বিহারের নানাস্থানে—কখনো হাজারিবাগ, কখনো দ্বারভাঙ্গা, কখনো মজঃফরপুর, কখনো আরাতে থাকতে হত। বালক সত্যজিৎও সেই সূত্রে নানাস্থানে ভ্রমণের সুযোগ পেতেন।

ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর অনুমোদন নিয়ে সত্যজিৎ,

দিনকর কৌশিক, পৃথ্বীশ নিয়োগী এবং মুখস্বামী অজন্তা ইলোরা ভ্রমণে যান। সময়টা ছিল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় তিনি আওরঙ্গাবাদের এলিফ্যান্টা গুহাও দর্শন করেন। নিছক প্রমোদ ভ্রমণ নয়, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থাপত্য দর্শন এবং স্কেচ আঁকা। বিবাহের পর ডি.জি. কিমারে চাকুরিরত থাকাকালীন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সস্ত্রীক লন্ডনযাত্রা করেন আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে। সেখানে ৬ মাস থাকার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি যখন চলচ্চিত্র নির্মাণকেই নিজের পেশা হিসাবে বেছে নিলেন, তখন শ্যুটিং-এর প্রয়োজনে তাঁকে দেশে বিদেশে নানাস্থানে যেতে হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাকেই তিনি নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন ফেলুদা সিরিজের কাহিনিগুলোতে।

ফেলুদা সিরিজের প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। কাহিনির পটভূমি দার্জিলিং হলেও ভ্রমণকারীর উপাদান এতে সেরকমভাবে পাই না, বরং পরবর্তীকালে রচিত 'দার্জিলিং জমজমাট'-এ সেই উপাদান অনেক বেশি পরিমাণে উপস্থিত। দার্জিলিং সত্যজিতের অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। কলকাতায় চাকরি পাবার আগে সুপ্রভা দেবী দার্জিলিং-এর একটি স্কুলে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে ছোট্ট মানিকের মুগ্ধতার কথা পাওয়া যায় তাঁর 'যখন ছোট ছিলাম' গ্রন্থে—"হাঁ করে চেয়ে রইলাম যতক্ষণ না সূর্যের রঙ গোলাপী থেকে সোনালী, সোনালী থেকে রূপালী হয়।"[৩] তাই অনিবার্যভাবেই তাঁর গল্পে বারবার ফিরে এসেছে দার্জিলিং। 'দার্জিলিং জমজমাট'-এ রহস্যের সঙ্গে পটভূমি একেবারে মিলেমিশে গেছে। একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণনা, মেঘলা আকাশ, পড়ন্ত রোদের সোনার রং, সূর্যের গোলাপি রং, আর একদিকে লালটালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলোবাড়ি, সুন্দর বাগান, ঘন ঝাউবন আর খাড়াই পাহাড়—"লাল টালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলো বাড়ি বেশ ছড়ানো, তিন দিক ঘিরে রয়েছে সুন্দর বাগান, আর পিছনে পূর্বদিকে ঘন ঝাউবনের পরেই উঠেছে খাড়াই পাহাড়।"[৪] পটভূমির এই প্রাধান্য এ কাহিনিতে এক অন্যমাত্রা যোগ করেছে।

'ফেলুদা সিরিজ'-এর কাহিনিগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ভ্রমণকাহিনির উপাদান পাই 'বাদশাহী আংটি'-তে। এই কাহিনির পটভূমি লক্ষ্ণৌ। ছোটোবেলা থেকেই লক্ষ্ণৌ ছিল সত্যজিতের প্রিয় শহর। এই শহরের প্রতি নিজের আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> "শহরটার উপরেও একটা টান পড়ে গিয়েছিল। নবাবদের শহরের বড় ইমামবাড়া, ছোট ইমাম-বাড়া, ছত্তর মঞ্জিল, দিলখুশার বাগান—এসব যেন মনটাকে নিয়ে যায় আরব্যোপন্যাসের দেশে। ...ইতিহাস ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এই লক্ষ্ণৌকে পরে আমি গল্পে আর ফিল্মে ব্যবহার করেছি।"[৫]

'বাদশাহী আংটি'-তে সেই পরিচয়ই লভ্য। একাধারে তথ্যজ্ঞাপন আর অপরদিকে বর্ণনা বা ডিটেলের ব্যবহারের সাহায্যে তিনি ভ্রমণ সাহিত্যের আস্বাদ আনতে চেয়েছেন এই কাহিনিতে। 'বাদশাহী আংটি'-তে ফেলুদা প্রথমেই তোপসেকে লক্ষ্ণৌ-এর দর্শনীয় স্থানগুলোর কথা বলেছেন—ভুলভুলাইয়া, গোমতী নদীর উপর মাঙ্কি ব্রিজ, সেপাইদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেন্সি। একদিকে যেমন সত্যজিৎ ভুলভুলাইয়ার ইতিহাসের কথা বলেছেন, তেমনি ভুলভুলাইয়ার ডিটেল বর্ণনাও দিয়েছেন—

> "কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ভুলভুলাইয়া। এদিক ওদিক এঁকে বেঁকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সেগুলো এমন কায়দায় তৈরী যে, যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই মনে হচ্ছে যেন সেখানে ছিলাম, সেইখানেই আবার ফিরে এলাম। একটা

গলির সঙ্গে আরেকটা গলির কোনও তফাত নেই—দু'দিকে মাথার ওপরে নিচু ছাত, আর দেওয়ালের ঠিক মাঝখানটায় একটা করে খুপরি"[৬]।

এ বর্ণনা পাঠকের সামনে ভুলভুলাইয়ারই প্রতিচ্ছবি। দর্শনীয় স্থানগুলোর পাশাপাশি তিনি সেখানকার খাদ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও পাঠককে অবহিত করেছেন—"সান্ডিলা লাড্ডু, গুলাবি রেউরি আর ভুনা পেঁড়া—এই তিন মিষ্টি হল লখ্‌নৌয়ের স্পেশালিটি।"[৭] রামলীলার বর্ণনায় তিনি পুনরায় ডিটেলের ব্যবহার করেছেন—

"প্রায় দশটা মানুষের সমান উঁচু একটা রাবণ তৈরি করে তার ভেতরে বারুদ বোঝাই করা হয়। তারপর দু'জন ছেলেকে মেক-আপ টেপ-আপ করে রাম লক্ষ্মণ সাজায়। তারা রথে চড়ে এসে তীর দিয়ে রাবণের দিকে তাগ করে মারে—আর সেই সঙ্গে রাবণের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গা থেকে তুবড়ি হাউই, চরকি, রংমশাল ছড়াতে ছড়াতে রাবণ ছাই হয়ে যায়। সে একটা দেখবার জিনিস।"[৮]

ফেলুদার কাহিনিতে লক্ষ্ণৌ পটভূমিরূপে আবার এসেছে 'শকুন্তলার কণ্ঠহার'-এ। এখানে ফেলুদার সংলাপে লক্ষ্ণৌ-এর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে—

"শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে। এরকম একটা জায়গা পাবেন আপনি? ব্রীজের একদিকে শহরের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক অন্যদিকে।"[৯]

এখানে সত্যজিৎ বড়ো ইমামবাড়ার বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন একটি বাক্যে—"এর থাম ছাড়া বিশাল হলঘর দেখে এবারও মাথা ঘুরে গেল।"[১০] বলা যেতে পারে, সমগ্র লক্ষ্ণৌ শহর তার জীবনযাত্রা নিয়ে পাঠকের চোখে সজীব হয়ে উঠেছে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিৎ রায় সিকিমের রাজা চোগিয়াল এবং রানি গিয়ালমোর অনুরোধে সিকিমের উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন। আর সিকিম থেকে ফিরে এসে ঐ বছরই তিনি লিখলেন 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'। এখানে লেখক যেমন গ্যাংটকের নানা দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি এখানকার মানুষদের পোশাক পরিচ্ছদ ও বাড়ির কথাও বলেছেন—

"...ফুলের টব সাজানো কাঠের বারান্দাওয়ালা দোতলা দোকান-বাড়ির সারি পেরিয়ে, লাল নীল সবুজ হলদে ডুরে কাটা পোশাকপরা কাঁধে বাচ্চা নেওয়া মেয়ে আর বাহারের টুপি আর রঙবেরঙের জামা পরা সিকিমি নেপালি ভুটিয়া তিব্বতি পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি গিয়ে পৌছল স্নোভিউ হোটেলের সামনে।"[১১]

আবার কোথাও কোথাও তিনি tourist guide হিসাবে পথপ্রদর্শকের কাজও করেছেন–

"বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সেবক রোড। সেবক রোড থেকে ডান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে চড়াই উঠতে আরম্ভ করে। তারপর মাঝে মাঝে নীচেও নামে, দার্জিলিং-এর মতো সমানে চড়াই ওঠে না। রংপোতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার শেষ আর সিকিমের শুরু।"[১২]

রুমটেক মনাস্ট্রি আর সেখানকার লামা ড্যান্সের বর্ণনাতেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন—

"গেটের ভিতর ঢুকে দেখি সামনে একটা বিরাট খোলা উঠোন। সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সাদা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে; তাতে আবার গাঢ় নীল রঙের নকশা করা। এত সুন্দর চাঁদোয়া আমি কখনোও দেখিনি। চাঁদোয়ার নীচে উঠোনের মেঝেতে

লোকেরা সব ভিড় করে বাবু হয়ে বসেছে, আর পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড নকশা করা পর্দার সামনে আট দশ জন লোক ঝলমলে পোশাক আর বীভৎস সব মুখোশ পরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচছে। বাজিয়ের দল লাল পোশাক পরে বসেছে আর নাচিয়েদের ডান দিকে। শিঙাগুলোতে সবচেয়ে গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে, সেগুলো প্রায় পাঁচ-ছ হাত লম্বা। আর সেগুলো বাজাচ্ছে আট দশ বছর বয়সের ছেলেরা। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত থমথমে অথচ জমকালো ব্যাপার। এমন জিনিস এর আগে আমি কখনও দেখিওনি বা শুনিওনি।"[১৩]

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপী গাইন' গল্প অবলম্বনে তৈরি করলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চলচ্চিত্রটি। রাজস্থানের দুটি বিখ্যাত কেল্লা—বুঁদির ও জয়সলমীরের কেল্লা রাজার প্রাসাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। জয়সলমীরের এই হাল্লা রাজার দুর্গই ফেলুদার গল্পে হয়ে ওঠে 'সোনার কেল্লা'। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ প্রায় দীর্ঘ একমাস সত্যজিৎ রাজস্থানে শ্যুটিং করেছিলেন। সেই দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার ছাপ লক্ষ করা যায় তাঁর গল্প পড়তে পড়তে। কাহিনিসূত্রে তিনি এই গল্পে যোধপুর ফোর্ট, কিষণগড় ফোর্ট প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, জয়সলমীর শহরের পত্তনের ইতিহাস বলেছেন, আবার বিকানিরের কেল্লার অস্ত্রাগার, দেবীকুণ্ড প্রভৃতিরও বর্ণনা দিয়েছেন। রাজস্থানী লোকেদের চেহারা ও পোশাকের বর্ণনাও তিনি করেছেন আকর্ষণীয় ভাষায়—

"লোকজন যা দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পাগড়ি আর গালপাট্টার সাইজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এরা সবাই রাজস্থানি। এদের পরনে খাটো ধুতি হাঁটু অবধি তোলা আর একপাশে বোতাম-ওয়ালা জামা। তাছাড়া পায়ে আছে ভারী নাগরা আর অনেকেরই হাতে একটা করে লাঠি।"[১৪]

সত্যজিতের অপর ফেলুদাকাহিনি 'বাক্স রহস্য' পটভূমি সিমলার কুফরি অঞ্চল। এখানেও সত্যজিৎ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর শ্যুটিং করছিলেন। সিমলা দেখে তোপসের যে অনুভূতি হয়েছিল, তা যে আসলে স্বয়ং লেখকেরই, তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়—

"...সিনেমাতে শীতের দেশের ছবিতে অনেক বরফ দেখেছি, কিন্তু সিমলাতে এসে চোখের সামনে বরফ দেখতে পেয়ে যেরকম অবাক হয়েছি সেরকম আর কখনও হইনি। রাস্তায় যদি আমাদের দেশের লোক দেখতে না পেতাম, তাহলে ভারতবর্ষে আছি বলেই মনে হত না।"[১৫]

এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি সিমলার পত্তনের ইতিহাস সম্পর্কেও লেখক পাঠককে অবহিত করেছেন—

"...দার্জিলিং-এর মতো সিমলাও নাকি সাহেবদেরই তৈরি। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেনান্ট রস বলে একজন সাহেব নাকি সিমলায় এসে নিজের থাকার জন্য একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করে। সেই থেকে শুরু হয় সিমলায় সাহেবদের বসবাস।"[১৬]

'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' রচনার সময় তাঁর শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন ছাত্রজীবনের ভ্রমণের স্মৃতি উপাদান জুগিয়েছিল। এই কাহিনিতে তিনি যেমন আওরঙ্গাবাদের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন, তেমনি আবার কৈলাশের দশাবতার গুহার বর্ণনাও দিয়েছেন নিপুণভাবে—

"বেশ বড় একটা হলঘর, তার শেষ মাথায় একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। দু'পাশের দেওয়ালে টর্চ ফেলে দেখি সেগুলোতেও চমৎকার সব মূর্তি খোদাই করা হয়েছে।"[১৭]

ফেলুদার অপর কাহিনি 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর পটভূমি হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ বারানসী। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'অপরাজিত'-এর শ্যুটিং-এর সময় তিনি বেনারসে কাটিয়েছিলেন। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা সত্যজিৎকে এই কাহিনি রচনায় উপাদান জুগিয়েছিল। একদিকে কাহিনির শুরুতে তিনি কাশীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানকার গন্ধবৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনি দশাশ্বমেধ ঘাট, মানমন্দির ঘাটের বর্ণনাও দিয়েছেন—

"দশাশ্বমেধের পাশেই উত্তরে হল মানমন্দির ঘাট। ঘাটের উপরেই একটা বাড়ির ছাতে প্রায় চারশো বছর আগে রাজা জয়সিংহের তৈরি জ্যোর্তিবিদ্যার যন্ত্রপাতি রয়েছে। দিল্লিটার মতোই এটাও একটা ছোটখাটো যন্তরমন্তর।"[১৮]

এর পাশাপাশি তিনি এখানকার টাঙ্গা, বেনারসের গলিঘুঁজি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এবং বিখ্যাত বেনারসী পানেরও উল্লেখ করেছেন। বারানসী পুনরায় পটভূমিরূপে এসেছে 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-তে। এই কাহিনির ঘটনার সূত্রপাত পশ্চিমবঙ্গের সোনাহাটিতে হলেও এর সমাধান ঘটেছে বেনারস বা বারানসীতে। এখানে লেখক বারানসীর কোনো ডিটেল বর্ণনা দেননি, হয়তো একই কথার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় তিনি একাজে বিরত হয়েছেন। শুধু বলেছেন—"আবার সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই গন্ধ। মনে হল এই ক'বছরে একটুও বদল হয়নি।"[১৯]

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' উপন্যাসে সত্যজিৎ রহস্যের গ্রন্থিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই শহর ও সেখানকার ব্যস্ত জীবনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

"মাইলখানেক এগিয়ে যেতে সামনে সমুদ্র পড়ল। আপিস ফেরত গাড়ির স্রোত এড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে এর কোমর উঁচু পাথরের পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাঁচিলের পিছন দিকে সমুদ্রের জল এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

রাস্তাটা বাঁ দিক দিয়ে সোজা পূবে চলে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরে শেষ হয়েছে সেই একেবারে দক্ষিণে, যেখানের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ঝাপসা হয়ে আছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে। ওই ধনুকের মতো রাস্তাটা নাকি ম্যারিন ড্রাইভ।"[২০]

'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' উপন্যাসে রহস্যের ঘটনাস্থল হাজারিবাগ। ছোটোবেলায় সত্যজিৎ ছুটি কাটাতে বেশ কয়েকবার হাজারিবাগ গেছিলেন। সেই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"হাজারিবাগ থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে ভেড়া নদী পেরিয়ে মাইলখানেক হাঁটার পর রাজরাপ্পা। সেখানে গা ছমছম করা ছিন্নমস্তার মন্দিরকে ঘিরে দামোদর নদীর ওপর জলপ্রপাত, বালি, দূরের বন আর পাহাড় মিলিয়ে অদ্ভুত দৃশ্য।"[২১]

এই রাজরাপ্পাই আরও সুন্দর হয়ে ওঠে ফেলুদার গল্পে—"পাহাড়ে নদী, যাকে বলে খরস্রোতা। বর্ষার ঠিক পরে এ নদী পেরোনো নাকি মুশকিল, কারণ তখন জল থাকে হাঁটু অবধি। ছোট বড়ো মেজো সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে, পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে, এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা"।[২২] এই বর্ণনা অনেক বেশি চিত্ররূপময়।

'হত্যাপুরী' গল্পের পটভূমি পুরী। পুরী ছিল সত্যজিতের অত্যন্ত প্রিয় বেড়ানোর জায়গা। এ প্রসঙ্গে সন্দীপ রায় বলেছেন—"প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে আমাদের পুরী যাওয়াটা ছিল বাঁধা। যার ফল অবশ্যই হত্যাপুরী।"[২৩]

এখানে লেখক যেমন একদিকে পুরীর সমুদ্র, নুলিয়া বস্তির কথা বলেছেন, তেমনি লিঙ্গরাজ, কেদারগৌরী, কোনারক, মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের কথাও বলেছেন। যদিও কাহিনির প্রয়োজনে তা অনেক সংক্ষিপ্ত।

'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে'র অকুস্থল নেপাল। গল্পটি প্রায় নেপালের গাইডবুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশপথে কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার সময় যে অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যের সাক্ষী হতে হয়, সত্যজিৎ এই কাহিনিতে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার কখনো বলেছেন ক্যাসিনোর কথা—"নানা রকমের জুয়া খেলার ব্যবস্থা আছে সেখানে। জ্যাকপট, পনুটন, কিনো—এসবই এক একরকমের জুয়ার নাম। আর খেলার জায়গাটাকে বলে ক্যাসিনো।"[২৪] তবে, সবচেয়ে আকর্ষণীয় বোধহয় দরবার স্কোয়ারের বর্ণনা—"দাবা খেলা কিছুক্ষণ চলার পর যেমন ছকের উপর রাজা, মন্ত্রী, বড়ে গজ, নৌকা সব ছড়িয়ে বসে থাকে, তেমনই কোন খামখেয়ালি দানব যেন এইসব ঘরবাড়ি প্রাসাদ মন্দির মূর্তি স্তম্ভ ছড়িয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আর তারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ আর যানবাহন।"[২৫] নেপালের অন্যতম আকর্ষণ পশুপতিনাথের মন্দিরের বর্ণনা দিতেও লেখক বিস্মৃত হননি।

'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' কাহিনিতে ভ্রমণকাহিনির উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। হৃষিকেশ থেকে শ্রীনগর যাওয়ার পথের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"পাহাড় ভেদ করে বনের মধ্যে দিয়ে কেটে তৈরি করা রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠেছে, আবার ঘুরে ঘুরে নামছে। মাঝে মাঝে গাছপালা সরে গিয়ে খোলা সবুজ পাহাড় বেরিয়ে পড়েছে, তারই কোলে ছবির মতো ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে।"[২৬] সর্বোপরি, রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ড যাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্যজিৎ একজন যথার্থ গাইডের কাজ করেছেন।

'ভূস্বর্গ ভয়ংকর'-এর পটভূমি কাশ্মীর। নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে লালমোহন, ফেলুদা আর তোপসের এ যাত্রা আরম্ভ হলেও কাশ্মীর পৌঁছে তাঁরা জড়িয়ে পড়েন এক জটিল রহস্যের সঙ্গে। সেই রক্তাক্ত পটভূমিতেও সত্যজিৎ ডাল লেকের যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন—

> "স্বচ্ছ কাচের মত জল, হাওয়া নেই বলে ঢেউ নেই, তাই আয়নার মতো চারিদিকের পাহাড়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে।"[২৭]

এছাড়া হাউসবোটের ডিটেল বর্ণনাতে এবং গুলমার্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনাতেও সত্যজিতের কলম সমান স্বচ্ছন্দতা ও পারদর্শিতা দেখিয়েছে—

> "এখানে হ্রদ, নদী, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি কিছুই নেই, যা আছে তা হল ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে মসৃণ ঘন সবুজ ঘাস—যা দেখতে একেবারে মখমলের মতো; আর আছে ঝাউবন আর পাইন বন আর ইতস্তত ছড়ানো কিছু কাঠের ঘর বাড়ি। সব মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর।"[২৮]

ফেলুদা সিরিজের অপর কাহিনি 'রবার্টসনের রুবি' লেখার আগে সত্যজিৎ 'অভিযান'-এর শ্যুটিং করতে দুবরাজপুর গেছিলেন, আর এই দুবরাজপুরই আলোচ্য কাহিনির পটভূমি। এই কাহিনিতে একদিকে তিনি যেমন মামা-ভাগনে পাহাড়ের কথা, কেন্দুলির মেলার কথা, বাউলগানের

কথা, বক্রেশ্বরের কথা বলেছেন, তেমনি টেরাকোটার মন্দিরের কথাও বলেছেন। টেরাকোটার বিশেষত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> "মাটি আর বালি মিলিয়ে তা দিয়ে নানারকম মূর্তি ইত্যাদি গড়ে উনুনের আঁচে রেখে দিলে যে লাল চেহারাটা নেয়, তাকে বলে টেরাকোটা। ...এই টেরাকোটার মন্দির ছড়িয়ে আছে সারা পশ্চিমবাংলায় আর বাংলাদেশে। ...কারুকার্য দেখলে মাথা ঘুরে যায়।"[২৯]

এই কাহিনিতে সাঁওতালি নাচের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর 'আগন্তুক' ছবিতে এইরূপ সাঁওতালি নাচের দৃশ্য আছে।

ফেলুদার অধিকাংশ কাহিনিরই পটভূমি ভারতবর্ষের কোনো না কোনো স্থান। কিন্তু 'টিনটোরেটোর যীশু' আর 'লন্ডনে ফেলুদা'র পটভূমি হল যথাক্রমে হংকং ও লন্ডন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপাইনস দ্বীপপুঞ্জের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেওয়ার পথে সত্যজিৎ একদিন হংকং-এ ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি লিখলেন 'টিনটোরেটোর যীশু'। কাহিনির অনুষঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন হংকং এয়ারপোর্ট থেকে হংকং শহরে যেতে হয় হংকং বন্দরের তলা দিয়ে তৈরি একটি টানেলের মধ্যে দিয়ে। হংকং শহরের রাস্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> "ফুটপাথ দিয়ে চলছে কাতারে কাতারে লোক, আর রাস্তা দিয়ে চলছে ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট গাড়ি আর ডবলডেকার ট্রাম। ট্রামের মাথা থেকে ডান্ডা বেরিয়ে তারের সঙ্গে লাগানো, কিন্তু রাস্তায় লাইন বলে কিছু নেই। রাস্তার দু'পাশে রয়েছে দোকানের পর দোকান।"[৩২]

হংকং-এর মতো লন্ডনও তাঁর বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য নিয়ে উঠে এসেছে 'লন্ডনে ফেলুদা' কাহিনিতে। সত্যজিৎ এই কাহিনিতে মাদাম তুসোর মিউজিয়াম, সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল চার্চ, লন্ডনের টিউব রেল, পার্লামেন্ট হাউসের বিগ বেন, বেকার স্ট্রিটের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন লন্ডনের ব্যস্ত জনজীবনের চিত্রাঙ্কনে—"সমস্ত রাস্তাটাই যেন একটা অবিরাম ব্যস্ততার ছবি। আর দোকানের কথা কী আর বলব। ঝলমলে লোভ লাগানো চেহারা নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।"[৩২] অনুমান করা যেতেই পারে, ডি.জে কিমারে চাকরি করাকালীন লন্ডনে থাকার অভিজ্ঞতা তাঁকে এই যথাযথ বর্ণনায় সাহায্য করেছে।

ফেলুদার মতোই গোয়েন্দাকাহিনিতে ভ্রমণের আস্বাদ পাওয়া যায় বিদেশি গোয়েন্দা-কাহিনিগুলোতে। আগাথা ক্রিস্টির পোয়ারোকে নিয়ে রচিত কয়েকটি গোয়েন্দাকাহিনি—'মার্ডার ইন মেসোপটেমিয়া', 'ইভিল আন্ডার দ্য সান' ইত্যাদিতে মধ্য প্রাচ্যের নানা স্থানের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার কোনান ডয়েলের 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস', 'দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার'-এ প্রাকৃতিক বর্ণনা শিল্পের পর্যায়ে উঠে এসেছে। 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস'-এ ওয়াটসন যখন পায়ে পায়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসেছে তখন তার বর্ণনা আকর্ষণীয়।—

> "...The sun was already sinking when I reached the summit of the hill, and the long slopes beneath me were all golden-green or one side are gray shadow on the other... One great gray bird, a gull of curlew, soared a loft in the blue heaven. He and I seemed

> to be the only living things between the huge arch of the sky and the desert beneath it."[৩৩]

বর্ণনার মাধুর্য সত্ত্বেও বিদেশি গোয়েন্দাকাহিনিগুলোতে ভ্রমণসাহিত্যের আস্বাদ ততটা পাওয়া যায় না, যতটা আমরা পাই ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনিগুলোতে। ফেলুদার কাহিনির এই অভিনবত্ব পরবর্তী বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির লেখকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ ব্যাপারে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কাকাবাবু ও সন্তু' সিরিজে এবং ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' সিরিজে। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র ষটবিংশ অভিযানে বোরাগুহালু যাবার পথে বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> "বোট্টাভালসা থেকে ট্রেন ছাড়বার পর চোখ যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল ওদের। যত যায় প্রকৃতি ততই তার পট পরিবর্তন করে। কী সুন্দর সব গ্রাম আর সবুজের দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ...এরপর শুরু হল পাহাড় আর বনভূমি। ঝরনা আর জলপ্রপাত।"[৩৪]

দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় এ বর্ণনা সত্যজিতের মতো সরল, স্বচ্ছ, সাবলীল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়।

ফেলুদা সিরিজের কাহিনিগুলোর বিশেষত্ব হল, সত্যজিৎ অপরাধমূলক ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থিত না করে একটি বিশেষ স্থানের সঙ্গে একীভূত করতে চেয়েছেন। সেজন্যই তিনি কাহিনির শিরোনামের সঙ্গে অকুস্থলের নামটিও জুড়ে দিয়েছেন। পটভূমির প্রতি লেখকের এই অতিরিক্ত গুরুত্বই ফেলুদার কাহিনিতে ভ্রমণসাহিত্যের আস্বাদ যোগ করার পাশাপাশি শিক্ষামূলক মাত্রাও যোগ করেছে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই স্থানের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি সেই স্থানের দ্রষ্টব্যগুলোর বর্ণনার পাশাপাশি অধিবাসীদের পোশাক, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি—সব কিছু সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেছেন কাহিনির গতি ব্যাহত না করে। এইসব তথ্যের সত্যতা ও বাস্তবতা প্রসঙ্গে লীলা মজুমদার বলেছেন—

> "ফেলুদার গল্প উপন্যাসে যে সব অকুস্থলে রহস্য পেকে উঠেছে, সে সমস্ত জায়গার বর্ণনা নিখুঁত। কোথাও কোন ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের এতটুকু ভুলটুকু চোখে পড়ে না।"[৩৫]

ভ্রমণের আস্বাদ ও যথার্থ ডিটেকটিভ গল্পের গুণ সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজের কাহিনিগুলো এক অন্য মাত্রা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এ.বি.সি.ডি.', বিজিত দত্ত (সম্পাদিত), 'সত্যজিৎ প্রতিভা', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, জানুয়ারী, ১৯৯৩, পৃঃ ১২৭।

২. অরুন বাগচী, (সাক্ষাৎকার), 'লেখক সত্যজিৎ', শিবরানী প্রকাশনী, পৃঃ ১০৩।

৩. সত্যজিৎ রায়, 'যখন ছোট ছিলাম', আনন্দ পাবলিশার্স, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৪৯।।

৪. সত্যজিৎ রায়, 'দার্জিলিং জমজমাট', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫।

৫. সত্যজিৎ রায়, 'যখন ছোট ছিলাম', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ৪৫।

৬. সত্যজিৎ রায়, 'বাদশাহী আংটি' 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১।

৭. তদেব, পৃঃ ৩৫।

৮. তদেব, পৃঃ ৩৬।

৯. সত্যজিৎ রায়, 'শকুন্তলার কণ্ঠহার', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫।

১০. তদেব, পৃঃ ৪৭১।

১১. সত্যজিৎ রায়, 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪।

১২. তদেব, পৃঃ ১২২।

১৩. তদেব, পৃঃ ১৪৮।

১৪. সত্যজিৎ রায়, 'সোনার কেল্লা', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।

১৫. সত্যজিৎ রায়, 'বাক্স রহস্য', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২।

১৬. তদেব, পৃঃ ২৮২।

১৭. সত্যজিৎ রায়, 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯।

১৮. সত্যজিৎ রায়, 'জয়বাবা ফেলুনাথ', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৭।

১৯. সত্যজিৎ রায়, 'গোলাপী মুক্তা রহস্য', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ৫৫৩।

২০. সত্যজিৎ রায়, 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৪।

২১. সত্যজিৎ রায়, 'যখন ছোট ছিলাম,' কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ৪৯।

২২. সত্যজিৎ রায়, 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬১।

২৩. সন্দীপ রায়, 'খসড়া খাতায় ফেলুদা'; সন্দেশ, 'ফেলুদা ৩০', অগ্রহায়ণ ১৪০২।

২৪. সত্যজিৎ রায়, 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭।

২৫. তদেব, পৃঃ ৯৮।

২৬. সত্যজিৎ রায়, 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭১।

২৭. সত্যজিৎ রায়, 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩।

২৮. তদেব, পৃঃ ৩৯৮।

২৯. সত্যজিৎ রায়, 'রবার্টসনের রুবি', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৬।

৩০. সন্দীপ রায়, 'খসড়া খাতায় ফেলুদা', সন্দেশ, 'ফেলুদা ৩০', অগ্রহায়ণ ১৪০২।

৩১. সত্যজিৎ রায়, 'টিনটোরেটোর যীশু', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৫।

৩২. সত্যজিৎ রায়, 'লন্ডনে ফেলুদা', 'ফেলুদা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮০।

৩৩. Arthur Conan Doyale, 'The Hound of the Baskervilles', 'The Sherlock Homes Illustrated ominibus', John Murray & Jonathan Cape Publishers Ltd., London, Page No. 76.

৩৪. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'—ষটবিংশ অভিযান, 'পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ৮৯৩।

৩৫. লীলা মজুমদার, 'ফেলুচাঁদ', সন্দেশ, 'ফেলুদা ৩০'—অগ্রহায়ণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থপঞ্জি

ক) আকর গ্রন্থ

১) সত্যজিৎ রায়, ১৯৭৯, একেই বলে শুটিং, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা

২) সত্যজিৎ রায়, ২০০৫, ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা

৩) সত্যজিৎ রায়, ২০০৫, ফেলুদা সমগ্র (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা

৪) সত্যজিৎ রায়, ১৯৮২, বিষয় : চলচ্চিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা

৫) সত্যজিৎ রায়, ১৩৮৯, যখন ছোট ছিলাম, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা

খ) সহায়ক গ্রন্থ

১) Chapman, Raymond, 1998, 'Saytajit Roy, An Intimate Master', Satyajit Ray Flim and Study Collection, Kolkata.

২) Das, Santi, 1998, Satyajit Ray, 'An Intimate Master', Satyajit Ray Film and Study Collection, Kolkata.

৩) Doyal, Artheur Conan, 1978, 'The Hound of the Baskervilles', 'The Sherlock Homes Illustrated ominibus', John Murray & Jonathan Cape Publishers Ltd., London.

৪) Ray, Bijaya, 2007, Bijaya Ray 'Remembers Satyajit Ray at Work', Pocket Art Series Roli Book.

৫) Sarkar, Bidyut, 1992, 'The World of Satyajit Ray' UBSPD, New Delhi.

৬) অরুণ বাগচী, 'লেখক সত্যজিৎ', শিবরাণী প্রকাশনী।

৭) কমল বসু, ১৯৮৫, 'সত্যজিৎ রায় লালমোহনবাবুর প্রতি অবিচার করেছেন', উশ্রী।

৮) জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত, ১৯৯৩, 'নিজের আয়নায় সত্যজিৎ', বদ্বীপ।

৯) দিনকর কৌশিক, ২০১০, 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি', পত্রলেখা।

১০) নলিনী দাশ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, 'সাত রাজার ধন এক মাণিক', নিউ স্ক্রিপ্ট।

১১) পবিত্র সরকার, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, 'কথাসূত্র', মিত্র ও ঘোষ।

১২) পার্থ বসু, ২০০৬, 'সত্যজিৎ রায়', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি।

১৩) পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, 'ছেলেবেলার দিনগুলি', নিউ স্ক্রিপ্ট।

১৪) বিজয়া রায়, ২০০৮, 'আমাদের কথা', আনন্দ পাবলিশার্স।

১৫) বিজিত ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৯৩, 'সত্যজিৎ প্রতিভা', র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন।

১৬) মঞ্জিল সেন, ১৯৮৫, 'অদ্বিতীয় সত্যজিৎ', নন্দিতা পাবলিশার্স।

১৭) মানসী দাশগুপ্ত, ১৯৮৪, 'ছবির নাম সত্যজিৎ', আনন্দ পাবলিশার্স।

১৮) রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮, 'বিষয় সত্যজিৎ', নাভানা পাবলিশার্স।

১৯) রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৯, 'সত্যজিৎ রায় ও অন্যান্য', ইন্ডিয়ান বুক মার্ট।

২০) লীলা মজুমদার, ১৯৮৬, 'পাকদণ্ডী', আনন্দ পাবলিশার্স।

২১) শীতলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণকুমার রায় সম্পাদিত, ১৯৮০, ২য় সংস্করণ, 'সত্যজিৎ রায় : ভিন্ন চোখে', ভারতী।

২২) শ্যামলকান্তি দাশ সম্পাদিত, ১৯৮৬, 'লেখক সত্যজিৎ রায়', শিবরাণী প্রকাশনী।

২৩) সুকুমার সেন, ১৯৮৮, 'ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি', আনন্দ পাবলিশার্স।

২৪) সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৩, 'কথাশিল্পী সত্যজিৎ : প্রতিভা ও পরম্পরা', দে'জ পাবলিশার্স।

গ) কোষগ্রন্থ

১) অলোক রায় সম্পাদিত, ১৯৬৭, সাহিত্যকোষ, এপ্রিল, কলিকাতা - ৭০০ ০০৪।

২) Dev, Ashutosh, Students', Favourite Dictionary, June, 1965, 21st Edition, Dev Sahitya Kutir.

ঘ) পত্রিকা পঞ্জি

১) 'আনন্দলোক' পত্রিকা — সত্যজিৎ সংখ্যা, ৯ই মে, ১৯৯২

২) 'আনন্দলোক' পত্রিকা — সত্যজিৎ সংখ্যা, মে, ১৯৯২

৩) 'কলকাতা' পত্রিকা — ২য় বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মে ১৯৭০

৪) 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা — সত্যজিৎ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৯৯

৫) 'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ' পত্রিকা — ফেলুদা সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

৬) 'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ' পত্রিকা — ফেলুদা সংখ্যা, ১৯৯৭

৭) 'দেশ' পত্রিকা, ৫৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯২

৮) নন্দন : অনন্য সত্যজিৎ, সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি, মার্চ, ১৯৯২

৯) 'নহবত' পত্রিকা, ২৬ বর্ষ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

১০) 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকা — সত্যজিৎ সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯৯২

১১) 'বর্ণমালা' পত্রিকা — সত্যজিৎ সংখ্যা, মে, ১৯৭৯

১২) 'বিভাব' পত্রিকা — ৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

১৩) 'রৈবতক' পত্রিকা — সত্যজিৎ সংখ্যা, ১৯৯২

১৪) 'সন্দেশ' পত্রিকা — ফেলুদা ৩০, অগ্রহায়ণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

১৫) 'সন্দেশ' পত্রিকা — সত্যজিৎ সংখ্যা, নববর্ষ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

১৬) 'নহবৎ', ২৬ বর্ষ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

কবির কলমে লেখা তিন উপন্যাস : নিরবসর আত্মার নির্জন সংলাপ (মাল্যবান, কুয়োতলা, সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা)

সাগ্নিক মিত্র

'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়! অবসর নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?' —কবি হৃদয়ের অমোঘ ও অনিবার্য এই প্রশ্ন থেকেই শুরু করা যাক। কেন? জীবনানন্দ এর উত্তর দিয়েছেন গদ্যে—

> "...পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তা হলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য;—অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ; সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা।"[১]

কবির কথাসাহিত্য সাধারণত এই সম্বন্ধেরই ভাবমুখ্য উন্মোচন। তাই বহির্মুখিতা থেকে অন্তর্মুখিতায়, প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষে, ব্যক্তিসর্বস্বতা থেকে নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে তার যাত্রা। প্রচলিত অর্থে এর কোনও প্লট বা কাহিনি নেই, নেই কোনও বিন্যাস পরম্পরা—কাহিনির যে কোনও অংশ যে কোনও জায়গায় জুড়ে দেওয়া যায়। এমনকি গভীর আত্মার প্রলাপ একোক্তিমূলক ধ্বনির বুনটে আনে কবিতার মতো অতীন্দ্রিয় চেতনা অথবা চিত্রকল্পের প্রবাহ। চরিত্রের সংলাপ লেখা হয় বক্রোক্তি, হেঁয়ালি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কখনো শ্রুতিকটু দুরূহ শব্দের প্রগাঢ় ব্যঞ্জনায়। ভাগ্যবিড়ম্বিত নিয়তিচালিত নায়ক চরিত্রের বাহ্যিক কোনও উত্তরণ নেই; অথবা তা এতই অলক্ষ্যে যে বাইরে থেকে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের পরিণতি ঠিক গ্রীক ট্র্যাজেডির নেমেসিস নয় বরং 'বোধ'-এর অকথিত যন্ত্রণা থেকে জৈবনিক ঔজ্জ্বল্যের খাঁজে খাঁজে মৃত্যু অতিক্রমী জীবনবোধের অ্যান্টিথিসিস। কথাসাহিত্যের গড়পড়তা পাঠক এই রচনাগুলোকে নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ এরা টানটান গল্পের চাহিদা মেটাতে অপারগ। যদিও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবি-কথক একথা বুঝেছিলেন যে—

> "উপন্যাসে গদ্যকারকে সব দিক থেকে সংগঠনের চিন্তা করতে হয়। সেখানে 'Mass Communication'-এর ব্যাপারটিকে ভেবে লিখতে হয়।"[২]

কিন্তু প্রায়োগিকভাবে তাঁর কথাসাহিত্যও কবিতার প্রভাবমুক্ত নয়। এই প্রভাব কি গদ্যশিল্পীর ত্রুটি নাকি নতুনতর সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন? আত্মকথন, চৈতন্যপ্রবাহ, শূন্যতার অনুভব, আমিত্বের সংকট, বোধের উন্মেষ তথা কবির কলমে লেখা উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার নিরিখে রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ের বাংলা সাহিত্যের তিনজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবির লেখা তিনটি উপন্যাসের আলোচনায় আমরা জীবনানন্দ কথিত 'নতুন জলে'র প্রবহমানতায় আর 'নতুন প্রদীপে'র ঔজ্জ্বল্যে খুঁজে দেখতে চাই ঔপন্যাসিকের কলমে লেখা সেই আশ্চর্য অভিন্ন কবিতাকে সুড়ঙ্গলালিত 'ধূসরতা' আর 'নূতনতা'য় যা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন।

প্রথম উপন্যাসটি ১৯৪৮-এর জুন মাসে কলকাতায় বসে লেখা। জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান'। কবির মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর বাদে ১৯৮০-তে 'নিউ প্রিন্ট' পাবলিকেশন থেকে এর প্রকাশ ঘটে। উপন্যাসটি বেরোবার পর পাঠক মহলে তেমন কোনও উৎসাহ দেখা যায়নি। এমনকি উপন্যাসের ভূমিকায় 'নতুন যুগের ভাব ও চিন্তা প্রতিভা' ব্যক্ত করার যে প্রচেষ্টার কথা ছিল সমালোচক মহল তা নস্যাৎ করেছিল। বাংলা উপন্যাসের বিশিষ্ট সমালোচক অমলেন্দু বসুর সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া কমবেশি সকলেরই—'জীবনানন্দের এই উপন্যাসটিকে শেষ পর্যন্ত আমরা... তাঁর কাব্যশিল্পের সূত্রে অন্বিত করতে চাইব।'[৩] কিন্তু এটাই উপন্যাসটির একমাত্র পরিচয় নয়। সম্পর্কের মধ্যে অপ্রাপ্তির শৈত্য, একটি অসহায়া রুগ্ন কন্যা, 'খাটের পুরু গদির ওপর তোশকে বক পালকের মতো সাদা বিছানা'র নিষ্ফলতা একদিকে যেমন নায়ক মাল্যবানের তথা মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশপ্ত স্বরূপের উন্মোচন অন্যদিকে তেমন উৎপলার মেজদা ও বৌদির সুখের দাম্পত্যের বিপ্রতীপতা, অমরেশ ও উৎপলার অবৈধ সম্পর্ক, 'একটা ভাঙা গেলাসের কাঁচগুলোকে জড়ো করে জোড়াতালা দিয়ে প্রত্যেকবারই' জল খাওয়ার ভবিতব্য। বিষণ্ণতার গাঢ় রঙে চোবানো এই উপন্যাস নিঃসন্দেহে বিষয়গতভাবেও যুগোপযোগী। গভীর নৈরাশ্যের ভিতর থেকে কোনও শান্তি, সাধ বা আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছা জাগলেও অবস্থার রূপান্তর অসম্ভব। এই জাতীয় কোনও গভীর নৈরাশ্যবোধ থেকেই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি লেখা হয়েছিল। জীবনের দীর্ঘ নিষ্ফলতার এই কথাটিই যেন অভিব্যক্ত হয়েছে এই উপন্যাস রচনার কিছু আগে ১৯৪৪-এ প্রকাশিত এবং তার অনেক আগে ১৯৩০ থেকে ১৯৪২-এর মধ্যে রচিত 'মহাপৃথিবী' কাব্যে। এক অশ্বত্থ গাছের জবানিতে গভীর নৈরাশ্যময় জীবনের উচ্চারণ শুনিয়েছেন কবি—

> "যেখানেই যাও চলে, হয় নাকো জীবনের কোন রূপান্তর;
> এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
> ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর।"
>
> (বলিল অশ্বত্থ সেই)

আর 'মাল্যবান' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে নায়কের বিয়াল্লিশতম জন্মদিনের রাতে। সারাদিনে তার এই বিশেষ দিনটির কথা মনেই পড়েনি। রাত্রি একটার সময়ে বিছানায় শুয়ে অনেক কথার মধ্যে নিতান্ত এক তুচ্ছ দিনের স্মৃতি উদ্ঘাটিত হল। তবে স্মৃতি ভারাক্রান্ত নস্টালজিয়া নয়; এই মনে পড়ার মূলে আছে ছোটোবেলায় শোনা শীতের রাতে বাউলের গান, সারাদিনের কাজে অবসন্ন শোল-বোয়ালের দিঘির জলে তলিয়ে যাওয়া, নারকোল ঝিরঝিরি পাতার শনশনানি অথবা পরীক্ষার পড়া 'মুখস্ত' করতে করতে অনেকক্ষণ টেবিলে মাথা রেখে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা। এই ছোটো ছোটো ভালোলাগাগুলোই মাল্যবানের বেঁচে থাকার অবলম্বন। অথচ এ সব কথা স্ত্রী উৎপলাকে কোনোদিন বলেনি মাল্যবান। সে তার অভিজ্ঞতায় এ কথা বুঝেছে যে, 'সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে' (আদিলেখন : মহাপৃথিবী)। 'কারুবাসনা' উপন্যাসেও আছে একই ধরনের চিন্তাপ্রবাহ—

> "কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়েই শিল্পসৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুশ্চেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে।"

এ যেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী মধুসূদনের অসুখী দাম্পত্যের বিপরীতক্রম। তবে

সন্তান-সম্ভাবনা সেখানে আপসের যে পথ তৈরি করে দিয়েছিল, সন্তান থাকা সত্ত্বেও এখানে সেই ব্যবধান ঘোচেনি। আসলে মাল্যবান মনে মনে জীবনের রূপান্তর চাইলেও সে পরিস্থিতিকে যেমন বদলাতে পারে না, তেমনি পারে না নিজের মধ্যেও কোনও বদল আনতে। আর রবীন্দ্রনাথের 'শেষের রাত্রি'র নায়িকা মণির মতো নিঃসঙ্গতার কষ্ট জেনেও মাল্যবানকে উপলব্ধি করতে চায় না উৎপলা। তাই মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার গভীর আহ্লাদে ভরা শীতের রাতে মাল্যবান বোঝে না কোন 'জীবনের নিভৃত কুহক' বরং স্বপ্ন-সহবাসের কল্পনায় খড়ের বিছানায় হাঁস-হাঁসিনির ওম তার আকাঙ্ক্ষাকে দীর্ঘতর করে।

এ হেন শৈত্যে নারীর আবির্ভাব ঘটেছে মৃতদেহের মতো। প্রথম কাব্য 'ঝরা পালকে'ই 'কবি' নামের একটি কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন—

> 'শ্মশান শবের বুকে জাগে এক পিপাসার শ্বাস!
> তারি লাগি মুখ তোলে কোন মৃতা—হিম-চিতা জ্বেলে দেয় শিখা
> তার মাঝে যায় দহি' বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা।'

আর উপন্যাসে দেখি এর বীভৎসতম প্রকাশ—

> আমি শুনেছি, একজন খুব রূপসী কুড়ি-একুশ বছর বয়সেই সুস্থ শরীরে হঠাৎ কেন যেন মারা গেল। বিকেল বেলাতে তাকে মাটি দেওয়া হল। তারপর সবাই চলে গেল, যে যার গাঁয়ে। সেখানে আট-দশ মাইলের মধ্যে জনমানব কেউ ছিল না। সন্ধ্যের পরেই একটা লোক এসে মাটি সরিয়ে সেই মরাকে চুরি করে নিয়ে গেল।
>
> 'কেন নিল বলতো?'
>
> 'কুড়ি একুশ বছরের মেয়েমানুষ?'
>
> 'হ্যাঁ, বেশ সুন্দরী ছিল, বেশ সোমত্ত; শবটাকে মাটি খুঁড়ে বার করবার পরও গা ফুটে বেরুচ্ছে, তার গতরের সে কী পুষ্টতা।'
>
> 'এ জন্যেই চুরি করা হয়েছিল—মাল্যবান বললে।'
>
> 'মাল্যবানকে খুব বেশি জাগিয়ে দিয়েছে উৎপলা, কথায় কথায় নিজেও খুব বেশি জেগে পড়েছে আজ'
>
> নীচের ঘরে আর যেতে দেওয়া হল না মাল্যবানকে আজ রাতে। এ রাতটা মাল্যবান ও উৎপলার বেশ নিবিড়ভাবেই কাটল। সমস্ত রাত—সমস্তটা শীতের রাত।

যে উৎপলা মাল্যবানকে তার শয্যা থেকে আলাদা করেছে তাকে তার জীবন 'ফলপ্রসূ' করবার জন্য এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। নারীকে মাল্যবান প্রশান্তির অবলম্বন রূপে পেতে চাইলেও নারী তার কাছে হয়ে ওঠে ভোঁতা, 'বধির নিশ্চল/সোনার পিত্তল মূর্তি'—আত্মজগতের এই শূন্যতাই তাকে একাকিত্বের বৃত্তে উৎক্ষিপ্ত করে। অবশ্য এর বিপরীত মতও আছে। সমালোচকের ভাষায়—

> "এই নয়া আধুনিক সংকটে মাল্যবান এছাড়া কীই বা করতে পারে। বেঁচে তো থাকতে হবে এই পৃথিবীতে, স্বপ্নের ভেতরেই। এ কারণে মাল্যবানকে সদর্থক নায়কও বলা যায়।"[৪]

আসলে জীবনানন্দের প্রেম বিষয়ে চিন্তার স্বচ্ছতা দেহ ও মনের শুদ্ধতা নিয়েই উপস্থিত। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মতো তাঁর প্রেম সংক্রান্ত অনুভবে দেহবাদ প্রবল নয়; আবার দেহকে বাদ দিয়ে শুধু মনের প্রাধান্যও প্রকটিত নয়। মাল্যবান যেমন ভাবে—

> "...মানুষের মন সারাটা দিন—রাতের প্রথম দিকটাও—বোকা হ্যাংলার মতো অপেক্ষা করে যেন নিজের কিছু নেই তার, অন্যে এসে দেবে তাকে, তবে হবে।"

অর্থাৎ শরীর তার কাছে আকাঙ্ক্ষা বা কামনার বিষয় নয়; পূর্ণতার অবলম্বন। এরপরে উপন্যাসে রয়েছে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আপাতভাবে ঘটনাটি নজর এড়িয়ে যেতে পারে —উপনিষদের ও আইনস্টাইন, হোয়াইটহেডের ঈশ্বরের হিসেবের মিল-গরমিল বোঝার মতো সহিষ্ণুতা হারিয়ে একটা বেড়ালছানা খুন। তবে বনফুলের 'আত্ম-পর' গল্পের মতো এই ঘটনা অমনুষ্যত্বের নিয়তি নির্ধারিত প্রতিফল আনে না বরং মাল্যবানের 'রক্তমাংসের শরীরে পাখির মতো লঘুতা' আনে কারণ—

> "কাদাপাঁকের ভেতরে একটা শুয়োরের মতো সমস্ত দিন জীবনটা যেন তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়ায়, বেড়ালের ছানার মৃত্যু তকে বেশ একটা চমৎকার মুক্তি দিয়েছিল"

এর আগে অবশ্য স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেছে, সিনেমায় গেছে মাল্যবান। উৎপলার বড়ো বৌঠানের সন্তান লাভ আর মাল্যবানের অফিসের কেরানি মনোমোহনবাবুর স্ত্রীর ভয়ংকর অসুখ শুধু দুটো সাদামাঠা সংবাদ হয়ে থাকেনি। যথাক্রমিক পরিহাস (চুয়ান্ন বছর বয়সে সন্তান লাভের কারণে) আর দুশ্চিন্তায় (উৎপলারও একইরকম অসুখ হতে পারার আশঙ্কায়) মাল্যবান যেন সকল লোকের মতোই চলতে চেয়েছিল কিন্তু 'নিজের মুদ্রাদোষে' আলাদা হয়ে যাওয়াটাই তার নিয়তি। এ যেন তার স্রষ্টারই প্রতিচ্ছবি। কারণ 'কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই'। তিনি আরও বলেছেন—

> "আমি সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিসকে 'চরম' মনে করে নিয়েছি জীবনের ও সাহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখটার দিয়ে মাঝে মাঝে—টেম্পোরারি সাস্‌পেনশন্ অব ডিজ্‌বিলিফ হিসেবে।"[৫]

কিন্তু এই অবিশ্বাস থেকে সবসময় মুক্তি খোঁজে মাল্যবান। 'হেথা নয়, হেথা নয়; অন্য কোথা অন্য কোনখানে'—কবি প্রাণের এই চিরন্তন পরিক্রমা যেন মিশে আছে তার অন্তরেও। সেই পরিক্রমায় প্রেম-স্বপ্ন-বিশ্বাস-নির্ভরতা সমস্তই অবান্তর হয়ে যায়। তাঁর রচনায় পাঠক শুধু শব্দান্তর্বর্তী শ্লেষ, বিষাদ, যন্ত্রণা আর নির্জনতা খুঁজে পায়। 'সময়ের অন্তঃস্বর, কবিতার বাচন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'র কবি সম্পর্কে সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন 'মাল্যবান'-এর ঔপন্যাসিক সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য—

> "...অবক্ষয়ী আধুনিকতার ধূসর দিগন্তগুলি যখন ঢেকে যাচ্ছিল ক্রমবর্ধমান বি-মানবায়নের ঘনকৃষ্ণ ছায়ায়, মুখ ছিল না কোথাও। মুখোশের মিছিল দীর্ঘায়িত হচ্ছিল কেবলই, ...জীবনের সত্য থাকে না কোথাও, মিথ্যার চতুর ও প্রগল্‌ভ ছদ্মবেশ পরে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় সবাই। অতএব সংবেদনশীল কবিকে লিখতে হয় সর্বব্যাপ্ত এই মুখোশের কথাই।"[৬]

তাই এক শীতের রাতে (রিক্ততার ঋতু অথচ কবিহৃদয়ের পরম কাঙ্ক্ষিত। মনে পড়তে পারে ভাস্কর চক্রবর্তীর 'শীতকাল কবে আসবে, সুপর্ণা?') উৎপলাকে খুব কাছে পেল মাল্যবান। যখন নদীর থেকে নয়, শুকনো শক্ত চুনি-পান্নার ভেতর থেকে জল ঝরছে তখন যেন সে পেল এক জলদেবীকে। কিন্তু—

"আলোড়িত হয়ে কথা বলতে বলতে কেমন আলো-অন্ধকার, সূর্য, শিকরে বাজ, ঝড় বাতাস, মাতৃগণ, গণিকাগণ, উৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ, অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের রোল শুনতে শুনতে মাল্যবানের ঘুম ভেঙে গেল।"

আসলে মাল্যবান ঘুমিয়ে পড়েছিল এঁটো টেবিলে। (হয়তো অমরেশ ও উৎপলার ব্যবহৃত শয্যায়) কিন্তু ঘুম ভেঙে দেখল সেই টেবিল 'কাল সরীসৃপের পিঠের মতো চকচক করছে।'— মধ্যবিত্ত জীবনের এই ভণ্ডামি যেন ঐ অবক্ষয়িত আধুনিকতারই অপর পিঠ। কারণ যেখানে নিবেদন নেই, সেখানে প্রক্ষালন স্বতোসিদ্ধ। শুদ্ধতার ধারণা সেখানে শাশ্বত হতে পারে না। মাল্যবানকে তাই উৎপলা জাগিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করেনি আর মাল্যবান অনুভব করেছিল 'জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ'।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় উপন্যাসটির কথায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কুয়োতলা'। উপন্যাসটির উৎস হিসেবে জানা যায় যে—

১৯৫৩-৫৪-এ নিজস্ব সম্পাদনায় শক্তি 'শঙ্খ' নাম একটি ত্রৈমাসিক কাগজ প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তিনি স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার ছদ্মনামের আড়ালে 'কুয়োতলা' নামে একটি গল্প লেখেন। তাঁর সহপাঠী নিত্যপ্রিয় ঘোষের মতে—'সম্ভবত এই 'কুয়োতলা' গল্পটিই পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসটির প্রথম পাঠ।'[৭]

নিরুপম নামে এক জনৈক কিশোরের প্রেমানুভূতির উৎসারণই আখ্যানটির আপাত পরিচয় কিন্তু আত্মগত বেদনার গভীরতম বিন্দু পর্যন্ত এর সম্প্রসারণ। রচনাকালের দিক থেকে মাল্যবানের সঙ্গে এর ব্যবধান মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের। কিন্তু বই আকারে 'কুয়োতলা'-র প্রকাশ ঘটে অন্তত উনিশ বছর আগে ১৯৬১-তে। যদিও গল্প থেকে উপন্যাসে পৌঁছোতে আরও বছর তিনেক লেগেছিল। সে হিসেবে 'কুয়োতলা' উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৫৬-৫৭। এক দশকের ব্যবধানে লেখা এই দুই উপন্যাস যেন স্বগতকথনের ভঙ্গিমায় লেখা বাংলা কবিতার দুই প্রধানতম কবির আত্মকথন। এই বাইরের মিলটুকুর অবকাশ ছেড়ে দিলে পড়ে থাকে অবচেতন মনের একা কথা বলা। তবে মাল্যবানের সমস্যা যেখানে দাম্পত্যজীবনের অপূর্ণতা থেকে জাত নিরুপমের সমস্যা সেখানে কৈশোরক মনের কৌতূহল থেকে উৎপন্ন যৌন অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং আধো-ছোঁয়া, না ছোঁয়ার বৃত্তে নারীর শরীর ও মনের পরিধি-পরিক্রমা। নিরুপমের এই আখ্যানে আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতাও দুর্লক্ষ নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী থেকে জানতে পারি বহড়ু স্টেশন সংলগ্ন এক শরিকি বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারে মাতামহ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। বহড়ুর গ্রামীণ পরিবেশে গাছ-পালা, বাগান-পুকুরের সহজ প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে অজস্র শৈশবস্মৃতি। কাছারিবাড়ির বাগানে বাতাবিলেবুর বল নিয়ে খেলা, আমলকিতলা, পুকুরপাড় ভর্তি মাছরাঙার গর্ত, দোলমঞ্চ, ইস্টিশন—সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এক পাড়া-গাঁ তাঁর চেতনার একটা বড়ো অংশে ছায়া ফেলে গেছে। শক্তির মামাতো ভাই অমল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা থেকে জানতে পারি—

"...বহড়ু স্টেশন সংলগ্ন দাদামশাইয়ের নতুন তৈরি করা 'মৃণালিনী কুটির' ...বাগানঘেরা একতলা বাড়ি। উঠানে কুয়োতলা, পিছনে নিমতলায় শান বাঁধানো খিড়কীর পুকুর। 'মৃণালিনী কুটিরে' বাসিন্দা বলতে দুই শিশু, আমার দাদাভাই (শক্তি), আমি, আমার ন' পিসিমা (শক্তির মাসীমা) এবং আমাদের দাদু স্কুলের মাস্টার মশাই সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়।"[৮]

উপন্যাসেও পাই তিরিক্ষে মেজাজের দাদু আর খিটখিটে টাকুমাসিকে (সম্ভবত এই ন' পিসিমা), পাশাপাশি নায়েবমশায়ের নাতনি শ্যামলি, স্বামী পরিত্যক্তা সবিতাদি, হান্দা, রক্মিনী, গঙ্গা মামা, কানু মামা প্রভৃতি চরিত্রগুলিও যেন শক্তির খুব কাছ থেকে দেখা। এই উপন্যাস পড়লে বোঝা যায় ঘুরে ফিরে যেন নিজেকেই, নিজের পরিমণ্ডল সমেত যাবতীয় ঘটনাপুঞ্জকে দেখবার একটা চেষ্টা আছে। উপন্যাস নির্মাণের প্রাথমিক শর্তগুলো পালন করেও এ যেন এক ভূতগ্রস্ত বালক নিরুপমের জবানিতে নিজের অনুভব বৃত্তের পরিপূর্ণ নির্মাণ। ধরতাই হিসেবেই ঔপন্যাসিক বলেন—

"বিষয়টি ছিলো কিংবা প্রকৃত বিষয় ছিল না—একটা ছোট্টা পাকা ঝিঁকুর ছেলে আর তার পরিপার্শ্ব।"[৯]

নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এই গল্প এগিয়েছে। বাল্যকাল থেকে কৈশোর পর্যন্ত অনুভূত কিছু একান্ত বিষাদ, ভালোবাসা, একাকিত্ববোধ, বয়ঃসন্ধির যৌন আকর্ষণ ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে দেখা প্রকৃতি ও মানুষ এই উপন্যাসে কোনও তথাকথিত প্লট ছাড়াই এক সামগ্রিক চলচ্চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—'একটি হৃদয় হইতে আরেকটি হৃদয়ে যাইবার সিঁড়ি নাই,/যদি না দুটি হৃদয়ই একতলায় হয়।' মাল্যবান যেমন সেই সিঁড়ি খুঁজে পায় না তেমনি নিরুপমও। টাকু মাসির সঙ্গে নিরুর সম্পর্কটিই উপন্যাসে সবচেয়ে জটিল। তাদের সম্পর্কে 'রূপ ও হৃদয় রক্ত স্বেচ্ছাচার উন্মাদ প্রাণের ভয় ও ভরসা ছিল পাশাপাশি।' সম্পর্কের তিক্ততা সত্ত্বেও যেন নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ এই সম্পর্কের নৈতিক সীমারেখাকে ছাপিয়ে যায়। ঘুমন্ত মাসির বেদনার সামনে এসে নিরুর নিরুচ্চার অভিব্যক্তি আমাদের সচকিত করে তোলে—

"মাসি, মাসি, তোমায় ডাকচে। একটা হাত ইচ্ছে করেই কোমরের ওপর ফেলে চাপ দিলো। মাসি তোমায় ডাকচে বোধহয়। হাতে ঘাম লেগেছে। কোমরের কষি-খোলা।"

এই বর্ণনা যতখানি সাহসী, ততখানি বিতর্কিত। সমালোচকের বিশ্লেষণ—

"...একে সহ্য করা, চলিত বাংলা উপন্যাসে অভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে একরকম অসম্ভব—সে পাঠক যদি চতুরঙ্গ, পদ্মানদীর মাঝি, পথের পাঁচালি, বিপন্ন বিস্ময়, সুহাসিনীর পমেটম পড়ে থাকেন তাহলেও।"[১০]

'পথের পাঁচালী'র উল্লেখ কিছুটা আকস্মিক। তবে উপন্যাসের পরিপার্শ্ব রচনায় প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে গ্রহণ করেছেন তাতে বিভূতিভূষণ থাকলেও নিরুপমের দুটো ডাগর চোখ—

"...কখনই সরল বিভূতিভূষণের মতন শুদ্ধ ও সামগ্রিক নয়—বেশ তেড়াবেঁকা, একবগগা, নষ্ট আর পচ-ধরা, যা নিরুপম নামের সঙ্গে মেলে না, এইরকম একটা কাটাছেঁড়া চোরা কাহিনী আর কথাভর্তি, ছবি ভরা এক গদ্য।"[১১]

উপন্যাসটি প্রকাশের বছর সাতেক পরে এক সাক্ষাৎকারে শক্তি জানিয়েছিলেন—

"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে। ...মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একেবারে শিরা টান করে পড়তে হয়। ...বিভূতিভূষণ খুব কাছের লোক বলে মনে হয়।"[১২]

আসলে বহড়ুর যে গ্রামীণ পটভূমিতে শক্তি বেড়ে উঠেছিলেন তার মধ্যে নিশ্চিন্দিপুরের ছায়া দুর্লক্ষ নয় কিন্তু জীবন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সেই বিশুদ্ধ চোখ তিনি খুঁজে পাননি বরং জীবনানন্দ কথিত সেই বোধের অকথিত যন্ত্রণায় 'নষ্ট শসা-পচা চালকুমড়ার ছাঁচে, যে-সব হৃদয় ফলিয়াছে —সেই সব' কাহিনি রচনা করতেই তিনি আগ্রহী হয়েছেন। এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাজুয্য। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় ডাক্তার শশীর চিকিৎসা পদ্ধতি (মতির বুক পরীক্ষা) যেমন কুসুমের যৌন ঈর্ষাকে জাগিয়ে তোলে এই উপন্যাসেও তেমনি শামলির ঋতুমতী হওয়ার আনন্দ নিরুপমের মনোজগতে যে প্রতিক্রিয়া আনে তাকে যদি দেহ মনের সুদূর পারে নিজেকে হারিয়ে ফেলা বলি তবেই হয়তো জীবন-আহূতির অন্যতর অথচ প্রত্যক্ষতর অর্থ পরিস্ফুট হয়—

"চোখের তারা চকচক করে উঠলো। কালচে। ভয় পাচ্ছো কেন? এই, এই শামলি— ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো। কান্না নাকি। বুকের পাশ দিয়ে পিঠ জড়িয়ে মুখটা নিরুপম শামলির ওপর চেপে ধরলো। শুকনো শামলির ওপর।"

অথচ এই ভালোবাসার পূর্ণতা ব্যাহত হয় মাসির অধিকারবোধে। নাকি বাল্যের নামমাত্র বিবাহ জীবনে নিরুর প্রতি অন্যতর কোনও আকর্ষণ ছিল টাকুমাসির। স্বপ্নের ভেতর অবচেতনে ভয় পেতে থাকা নিরু জড়িয়ে ধরে বড়োমাসির সেজো মেয়ে মুকুটকে। কিন্তু তার পরক্ষণেই 'ছিঃ' শব্দে তড়িতাহতের মতো ছিটকে যায়। উপন্যাসটি প্রকাশের কয়েক বছর পর ১৯৬৫-তে প্রকাশিত 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' কাব্যের 'হৃদয়পুর' কবিতাটি এই কাহিনির সূত্রে যেন নতুন করে পড়া যায়—

তখনো ছিল অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা।
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা
ডুবিয়াছিলো নদীর ধার আকাশে অধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন
কী কাজ করে করিয়া পার যাহার ভ্রূকুটিতে
সতর্কিত বন্ধ দ্বার প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর এখনো, এই বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালে ছেলেখেলা? (হৃদয়পুর)

অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈদান্তিক' কবিতার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল। 'ভিতরে কত মিষ্ট ফল তীক্ষ্ণ স্বাদ ফুলের তীর/... বেরিয়ে এলেই নেই।' অথচ অবচেতনের এই চাহিদাগুলোই জীবনে অনাবশ্যক জটিলতা নিয়ে আসে। তাই পরিণত নিরুপম বুঝতে পারে স্মৃতি মানে বিষ। তাই দাদুর মৃত্যু, অন্ধকার রাতে খিড়কি দরজা দিয়ে মাসির বেরিয়ে যাওয়া একাকী জীবনের অপরিসীম শূন্যতা সত্ত্বেও নিরুপমকে দেয় 'দাঁড়াবার জায়গা' অথবা উন্মার্গগামিতার সহজতর পথে এই প্রত্যয়ে পৌঁছোনো যে 'বেশিদিন পড়ে থাকা উচিত হবে না।'

শক্তি 'এলোমেলো' নামের একটি অগ্রন্থিত স্মৃতিচারণামূলক গদ্যে 'কুয়োতলা' প্রসঙ্গে বলেন যে স্বগতকথনের মধ্যে দিয়ে নিজের অন্তরাত্মাকে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা সহ উন্মোচনের তাগিদেই তাঁর এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। তাই অবিরল ধারাবর্ষণ আর বিদ্যুতের চমকে নিরুপমের

মনোগহনে যে আশ্চর্য ভাষাস্রোত তৈরি হয় কবি-কলমের স্পর্শ ব্যতীত তা অসম্ভব। বিপন্নতার মাঝখানে ধ্রুবপদের মতো জেগে থাকে সেই কথাগুলো—

> "সে আরো ক্ষীণভাবে শুয়ে থাকে, যেন চায় হাওয়ায়, আভূমিনত নয়, শূন্যে শুয়ে থাকা, বিঘ্নকারী হিসেবে নয়। চারিধারের সাপগুলি এখনো সাপের। মানুষের নয় বলে নিরুপম কৃশকায় হয়ে ন্যূনতম বিছানায় যেন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে অস্ফুটে কোনো সোহাগময় শস্যক্ষেত্র পার হয় তেমনভাবে শুয়ে থাকে।"

আমাদের নির্বাচনের শেষ উপন্যাসটি আরও তিন দশক পরের। ১৯৯৪-তে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত এবং ১৯৯৫-তে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে বই আকারে প্রকাশিত জয় গোস্বামীর 'সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা'। এই উপন্যাসের নায়ক সর্বনাম চিহ্নিত—'সে'। অর্থাৎ যে কেউ হতে পারে। নিরুপমের মতো জগৎ ও জীবনের প্রতি নির্বিশেষ টান তার নেই; নেই মাল্যবানের মতো পরিচ্ছন্ন কল্পনাশক্তি বরং সে যেন নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকা এক মানুষ; আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত। উপন্যাসের যাত্রা বর্তমান থেকে অতীতে আবার অতীত থেকে বর্তমানে। সে বর্তমানে একটি ব্যাঙ্কের সামান্য কর্মচারী। বিবাহিত। কিন্তু উৎপলার মতোই দাম্পত্য জীবনে অসুখী তার স্ত্রী মঞ্জরী। হয়তো খুব বেশি নয় তার চাহিদা—ছেলের পড়াশোনার জন্য সামান্য সঞ্চয়, দু'একবার জঙ্গল-পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া, একটা গিজার সমেত বাথরুমের ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, নিজেদের একটা ছোটো বাড়ি। কিন্তু সে চায় একটু নিভৃতি। জীবনের এই চাওয়াগুলো হয়তো তুচ্ছ নয়; হয়তো কেন খুবই স্বাভাবিক এই চাওয়াগুলো কিন্তু সে এসবের বাইরে চায় নিজের জন্য একটা সুড়ঙ্গ। সে মনে করে—'এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার দরকার। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা।'

দ্বিতীয় ভাগে বলা হয় অতীতের কাহিনি। রত্ন এবং তার বন্ধুত্বের কথা দিয়ে শুরু। রত্নরা বড়োলোক। নানারকম তেল, সাবান, প্রসাধনদ্রব্য থেকে শুরু করে বনস্পতি, হরলিক্স, টর্চের ব্যাটারি ডিস্ট্রিবিউটর। আর সে তখনও চাকরি পায়নি। টিউশনি করে। এই রত্নর বান্ধবী ঝোরা। ঝোরার সঙ্গে সামান্য মান-অভিমানের পালাকে তুচ্ছ করে শাওয়ার খুলে স্নান করে রত্ন আর তাকে এই বলে সাবধান করে যে পৃথিবীতে একদিন আর জল পাওয়া যাবে না। সে কিন্তু ঝোরার চোখে জলের বিন্দু লক্ষ করেছিল আর যখন ঝোরা সাইকেল চালিয়ে রোদের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল তখন তার মনে হল শুকিয়ে যাবে না তো ঝোরা?

এরপর তার জীবনে ঘটে দুটো ঘটনা। একদিন টিউশন পড়িয়ে বাড়ি ফেরবার পথে অন্ধকারে দু'জন কোথা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ঠেসে ধরল একটা বাড়ির দরজার সঙ্গে। বজ্র কঠিন জোরে কয়েকটা আঙুল চেপে ধরল তার চোয়াল, মাথা ঠুকে গেল পেছনে, নাকে এল উৎকট গন্ধ। কিন্তু তারপর তার কাছে বই খাতা, পেন ইত্যাদি দেখে ওরা তাকে ছেড়ে দিল, তার বাবার ওষুধের যে প্রেসক্রিপশনটা পড়ে গিয়েছিল সেটা গুঁজে দিল তার পকেটে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও একইরকম আকস্মিক। ঝোরা তার জন্য প্লেটে করে সাজিয়ে আনে সন্দেশ। সেই সন্দেশের টুকরো তার দাড়িতে লাগলে সে খোঁজে রুমাল। কিন্তু মুছবার জন্য হাত তুলতেই—

> "তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝোরা। কাঁধ দুটো আঁকড়ে মুহূর্তে ঠেসে দেয় দেওয়ালে। সপাটে। ঠিক যে জায়গায় ধরেছিল সেই 'ওরা', অচেনারা, ঠিক সেই জায়গাতেই

ঝোরার মুঠো আঁকড়ে বসে যায়। পিঠের ঠিক সেই আহত অংশ আবার ধাক্কা খায় দেয়ালে।...

ব্যথায় সে ছটফট করে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝোরার আঙুল তার চোয়াল চেপে ধরে। ঠিক যেখানে ওরা ধরেছিল।"

এই দুটো ঘটনা উপন্যাসে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সে বোধহয় বুঝতে পারে এভাবে নিজেকে মেলে ধরে রাখলে যে কোনো সময়ে যেকোনো দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে। জীবনে চলার পথে সুরক্ষা আবশ্যক। ব্যাপারটা অবশ্য তাকে সংস্কারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমন বড়ো বোনের ডিভোর্সের সংবাদ নিয়ে শঙ্করমামার সঙ্গে আসে এক ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক। সেই সুকল্যাণ নামের লোকটির সঙ্গে বড়ো বোন যায় তার জামাইবাবু রণজিতের কাছে। তাদের বাড়ি থেকে কলকাতা যেতে ঘণ্টা দু'য়েক লাগে। বলে যায় রাত্রে পিসির বাড়ি থেকে সোমবারে ফিরবে কিন্তু ফিরল সোমবার রাত দশটার পর। এই ঘটনার পর বড়ো বোন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। তবে কি ঐ সুকল্যাণ নামের লোকটা কোনোভাবে তার বোনের অসহায় অবস্থার সুযোগে তাকে ঠকিয়েছিল? এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। তবে এই ছেলেটি যেন এসব ঘটনার বৃত্তে জীবনের এক আবছা মানে খুঁজে পায়। জয়ের 'শুভ আগুন শুভ ছাই' নামের কবিতাটির দ্বিতীয়াংশের কয়েকটি পংক্তির সঙ্গে যার মিল খুব প্রত্যক্ষ—

"এখন সব আদর আর প্রহার
শূন্যে ফেটে গেছে, কেবল জলার পাশে ফণা
ওঠায় প্রিয় সাপেরা, জালে ওদের দেবী জাগে
এখনো এই গুহায়, দেহে কালরাত্রি নিয়ে।"

সুতরাং লোহার বাসরঘরের চেয়ে দৃঢ়তর প্রতিরক্ষার প্রয়োজন। বিপদের লক্ষণগুলো চেনা প্রয়োজন। একটা বই সে সবসময় কাছে রাখে যার ছিয়াত্তর পাতায় গাওস্কর লিখেছেন—"I had planned how I was going to tackle the bowling. So when Angshuman and I walked out to bat I was feeling relaxed." বইটার নাম 'Runs and Ruins'। রত্ন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পরে এক সহকর্মীর কাছ থেকে বইটা ধার নিয়ে সে রেখে দিয়েছে। কোনও টাক মাথা বা ফ্রেঞ্চকাট লোককে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে কারণ তার জীবনের বিভিন্ন দুর্ঘটনার আগে এরকম কোনও না কোনও লোককে সে দেখেছে। সে ইচ্ছে করে নয় নম্বর টোকেনধারী লোককে আটকে রেখে এইটটি এইট, সেভেনটি এইট ডাকতে থাকে। একবার ন'নম্বর টোকেনধারী একটা লোককে ভুলবশত বেশি টাকা দিয়ে ফেলায় তাকে হয়রানি হতে হয়েছিল তাই তারপর থেকে শুধু নয় নম্বর নয়, উনিশ, বা চুরানব্বই নম্বর টোকেনধারীও তার বিরাগভাজন। রত্ন একদিন বলেছিল যে পৃথিবীতে জল ফুরিয়ে যাবে তাই রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে সে অজস্র পাত্রে জল ভরে রাখে।

মনে হতে পারে লোকটি উন্মাদ। তার বাইরের আচরণগুলো সেরকমই ভাবায় কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে বর্তে থাকতে গেলে এরকম অনর্থক বন্ধনেই জড়িয়ে থাকতে হয়। উপন্যাসের শেষ পর্বে মঞ্জরীর চাওয়া আর তার চাওয়ার বৈপরীত্য সত্ত্বেও যে কথোপকথন তৈরি হয় তা যেন অলটার ইগোর টানাপোড়েনে ব্যক্তিসীমানাকে অতিক্রমণের আত্যন্তিক প্রচেষ্টা বা আরও বড়ো করে দেখলে মানবজীবনে 'চাহিদা' নামক অনিবার্য প্রক্রিয়াটিরই নতুন সংজ্ঞার্থ নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটির প্রথমাংশের সঙ্গে এর মিল প্রকট।

"... বলো না, এক্ষুণি ম্যানেজার হতে গেলে কী দরকার? কী দরকার।
হ্যাঁ হ্যাঁ। বলো না, এক্ষুণি ম্যানেজার হতে গেলে তোমার কী কোয়ালিফিকেশন দরকার।
কী কোয়ালিফিকেশন দরকার।
অ্যাঁ।
সুড়ঙ্গ থাকলে ইচ্ছেমতো লুকিয়ে পড়া যাবে।
ম্যানেজার হলে নিশ্চয়ই অনেক মাইনে হবে তোমার।
তখন ইচ্ছে করলেই বেশ ডাকা যাবে সবাইকে।
দিদিদেরও, হ্যাঁ, ইচ্ছে করলেই...
তুমি ইচ্ছে করলেই আধো অন্ধকার। তুমি ইচ্ছে করলেই জলস্রোত।"

'ইচ্ছে' শব্দটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানারকম তাৎপর্য দেওয়ার মাধ্যমে যেন 'তাসের দেশে'র ছকে বাঁধা নিয়ম ভাঙার কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে কারণ 'সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে/সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে...' অতএব কবির নিজস্ব ইচ্ছের বশবর্তী হয়েই 'কবন্ধ বিবাহ' নামে একটি কবিতায় জয় বলেন—

"তবু পৃথিবীতে জন্মেছ, এই বিস্ময়ভরা ধরণী
তুমি কি কখনও প্রণয়গন্ধ বনে আনন্দ করোনি?
শরীরে অরণি রাখোনি কখনও? তবে অনুতাপ ছেড়ে দাও, শোনো
মাঝগঙ্গায় যে পারে ডোবাতে, চাও সেই খোলা তরণী।"

আসলে কাছি টুকরো করে না ফেলতে পারলে তার খোলা হাওয়ায় নিজেকে ডোবানো যায় না। মাল্যবান তাই ভালোবাসাকে 'ধুলো আর কাদা'র বেশি কিছু ভাবতে পারে না। প্রেমের মালা গলায় পরতে না পেরে মাল্যবান প্রকৃত প্রস্তাবে মাল্যহীন। নিরুপম বেশিদিন বাঁচতে চায় না কারণ জীবনপ্রবাহের চেনা জোয়ারে সে বেমানান। তার উপমা এই কারণে দুর্লভ নয় যে সে সন্ন্যাসী বরং সংসার আবদ্ধ হয়েও তার অসাড়তা বুঝতে পারার নির্জ্ঞানচেতনা সচেতন মৃত্যুচিন্তায় তার অনন্যতার পরিচয় আর জয়ের উপন্যাসের 'সে' একটা কলমের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটায় ঢুকে পড়তে চায়। কলমের কাছে চায় শক্তি। অথবা শকুন্তলা বলে যে মেয়েটি তার ডানা এঁকেছিল সেই মেয়েটিকে সে খোঁজে যদি তার কল্পনার ছোঁয়ায় সে উড়ে যেতে পারে। একা একা কথা বলার মধ্য দিয়ে এই তিনটি উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে একটা কবিতার সম্প্রসারিত রূপ। যে কবিতার সাধারণ বিষয়—ভূমি থেকে ভূমার দিকে যাত্রা।

বইপত্র

মূল বই

১. জয় গোস্বামী, 'দশটি উপন্যাস', আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২
২. জীবনানন্দ দাশ, 'উপন্যাস সমগ্র', গতি-ধারা, বাংলা বাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২১শে বইমেলা, ২০০০
৩. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'গদ্যসংগ্রহ-১', দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা ১৯৯৬

সহায়ক বই

১. অশ্রুকুমার সিকদার, 'কবির কথা কবিতার কথা', অরুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০
২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'কবিতার মুখোমুখি', এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫
৩. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি', রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০১
৪. জয় গোস্বামী, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রতিভাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০১২
৫. জীবনানন্দ দাশ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, দ্বাদশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৭
৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'কবিতার বহুস্বর', প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯
৭. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, দশম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪
৮. শান্তনু কায়সার, 'গভীর গভীরতর অসুখ গদ্যসত্তার জীবনানন্দ', বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১১৯৭

পত্র-পত্রিকা

১. কবিতাবাসর, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদনা প্রভঞ্জন হালদার, ২৫ নভেম্বর ২০১০
২. কবিতীর্থ, বিশেষ ব্যক্তিত্ব : শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা উৎপল ভট্টাচার্য, জুন ১৯৯৫
৩. পরিকথা, বিস্মৃত বাংলা উপন্যাস, সম্পাদনা. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০১০
৪. পশ্চিমবঙ্গ, কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা, প্রধান সম্পাদনা. তারাপদ ঘোষ, এপ্রিল ২০০০
৫. রক্তমাংস, নিজের জীবন, বীজের জীবন, সম্পা. গৌতম ঘোষদস্তিদার, জানুয়ারি, ২০০১
৬. জীবনানন্দ দাশ ঃ 'কবিতার কথা', পশ্চিমবঙ্গ, কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, পৃ. ৯
৭. সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য, 'গদ্যশিল্পীর ছোটগল্প : রূপ ও রূপান্তর', 'কবিতাবাসর', বইমেলা, ২০১১, পৃ. ২৪৭
৮. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসসমগ্র, ভূমিকা, গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, ২১শে বইমেলা ২০০০, পৃ. ৯
৯. মনোজ চাকলাদার, 'শীত ঋতু ও জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়ক', 'পশ্চিমবঙ্গ', কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা ১৪০৭, পৃ. ১০১
১০. জীবনানন্দ দাশ : 'কবিতা প্রসঙ্গে', 'নিজের জীবন, বীজের জীবন', সম্পা. গৌতম ঘোষদস্তিদার, 'রক্তমাংস' বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ১২
১১. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'সময়ের অন্তঃস্বর, কবিতার বাচন', 'কবিতার বহুস্বর', প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৫৪
১২. সুদীপ্ত মাজি : 'ভাষা ও ভাবনার এক আশ্চর্য ভূগোল : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কুয়োতলা', বিস্মৃত বাংলা উপন্যাস, পরিকথা, দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০১০, পৃ. ২৬৩
১৩. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি', প্রথম অধ্যায় : কবি জীবনকথা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০১, পৃ. ২

১৪. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'গদ্যের গার্হস্থ্যে', গদ্যসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬, পৃ. ১১

১৫. সমীর সেনগুপ্ত, 'সম্পাদনা বিষয়ে', 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৩

১৬. শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'গদ্যের গার্হস্থ্যে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১৭. প্রভাতকুমার দাস, 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য : তাঁর পদ্যেরই সাঁকো', কবিতীর্থ, জুন ১৯৯৫, পৃ. ৪১-৪২

মল্লিকার কবিতায় নারী : রূপে রূপান্তরে পুরাণপ্রতিমা

সুতপা দত্ত

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা নারী প্রধান। সেখানে আছেন পৌরাণিকযুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক এবং বর্তমান যুগের অজস্র মেয়েরা, মেয়েদের দিক থেকে বলা কথায় মেয়ে কবির কণ্ঠস্বরে আবহমান কালের মানবীর ধারাভাষ্য যেন উঠে এসেছে কবিতাগুলিতে। পুরাণপ্রতিমা অর্থাৎ সেই পৌরাণিক যুগের নারীপ্রতিমা রূপে রূপান্তরে আজও বহতা ধারার মতো সার বেঁধে চলেছে, চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। বদলেছে শুধু বাইরেটা। চাকচিক্য, যুগের ফ্যাশন আর বিশ্বায়নের পর্দাটা সরাতেই কিন্তু বেরিয়ে পড়তে পারে ভারতীয় নারীর সনাতন রূপ আর তার প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দ্বিমুখী ব্যবহারের চোরা স্রোতটি। মল্লিকা সেনগুপ্ত গবেষকের নিষ্ঠায় পুরাণ খুঁড়ে তুলে এনেছেন আধুনিক মেয়েদের প্রত্নপ্রতিমা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যাদের একই সঙ্গে বানিয়েছে দেবী ও লাঞ্ছিতা।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার দিন থেকেই মেয়েদের নিজের সম্পত্তি বলে জেনেছে পুরুষ। পিতা-স্বামী-পুত্রের অধীন নারী ব্যবহৃত হয়েছে পণ্য হিসাবে। নারীকে মহত্ত্বের শীর্ষে তোলা হয়েছে তার মাতৃত্বে, মা হলেন দেবী 'মা হওয়া মুখের কথা নয়'[১], অথচ এই মাকেই হত্যা করতে পারে পুত্র, পিতার আদেশে। নারী এক এমন মূলধন যাকে শুল্ক হিসাবে ব্যবহার করা যায়, জুয়াতে বাজি রাখা যায়। স্বীকার করা হয় না নারীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। নারীর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি যে আজও বহাল রয়েছে মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর পৌরাণিক কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে খুব স্পষ্ট করে তা দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে যে নারীকে শক্তির আধার হিসাবে কল্পনা করেও এই দ্বিচারী সমাজ তাকে সীমায়িত করতে চেয়েছে সাংসারিক গণ্ডিতে মল্লিকা সেনগুপ্ত আবার সেই শক্তির প্রতিমূর্তিকে বোধন করেছেন মেয়েদের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর লড়াইয়ের ক্ষেত্রটিতে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'বেতকলসির জল' ("হাঘরে ও দেবদাসী")[২] কবিতাটিতে রেণুকার কথা বলেছেন। ঋষি জমদগ্নির স্ত্রী, পরশুরামের মা, রেণুকা। সমস্ত জীবন-যৌবন স্বামীসেবা করে পাঁচ পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও যাঁকে নিজের সামান্য মানসিক চ্যুতির জন্য স্বামী পুত্রের দণ্ড মাথা পেতে নিতে হয়। এই চ্যুতির সংজ্ঞা পুরুষ নির্ধারিত। একদিন নদীতে জল আনতে গিয়ে রেণুকা "চিত্ররথ নামক এক রাজাকে তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে জলকেলি করতে দেখে কার্মাতা ও অসম্বৃতা অবস্থায় আশ্রমে ফিরে এলে জমদগ্নির সন্দেহ ও ক্রোধের উদয় হয়। তিনি রেণুকাকে হত্যা করার জন্য একে একে পুত্রদের আদেশ করেন। কিন্তু তারা কেউই মাতৃহত্যা করতে রাজি হন না। এই সময় কিশোর পরশুরাম গৃহে ফিরে এলে তাকে একই আদেশ করেন। পিতৃ-আদেশের পূর্বাপর বিবেচনা না করেই পরশুরাম মাতাকে হত্যা করেন।"[৩] মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় এই রেণুকা একজন দৃপ্ত নারী যাঁর 'ক্রুদ্ধ চোখ চাবুকের মতো'[৪] যিনি অকপটে বলতে পারেন—

> "আমি জবাবদিহির হাড়িকাঠে মাথা পাতব না
> তোমরা পিতা ও পুত্র তোমাদের করণীয় ঠিক করে নাও
> এতগুলো বছরের পরিশ্রম, সংসার পালন
> কোন মানদন্ডে তার বিচার করবে?"[৫]

বস্তুত নারীর গৃহশ্রমকে কোনও মর্যাদাই দেওয়া হয় না। অন্যত্র মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন প্রাচীন কাল থেকে মেয়েরা যে ঘরকন্না, সংসার প্রতিপালন, সন্তানকে বড়ো করার মতো দায়িত্বপূর্ণ, শ্রমসাপেক্ষ অথচ মজুরিহীন কাজ করে সেগুলি কি কোনও মূল্যই পাবে না নতুন সাম্যবাদী সমাজে ('আপনি বলুন, মার্কস')[৬]। এখানে রেণুকা যেন মল্লিকারই মুখপাত্র হয়ে বলে ওঠেন—

"কোন মূল্যে স্বাধীনতা কিনে নিতে হবে
বলে দাও—স্বামীপুত্র মিলে ঠিক করো—
এক্ষুনি চুকিয়ে দিই সেই মহাঋণ আজ সর্বনাশ হোক"[৭]

কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে না আছে নারীর স্বাধীন ইচ্ছার মর্যাদা আর না আছে তার অবদানের স্বীকৃতি। তাই জমদগ্নি তাঁর পুত্র পরশুরামকে বলতে পারেন 'সমাজ পুরুষের/নারীরা প্রজনন যন্ত্র আমাদের/এ কথা কে না জানে!'[৮] এইখানে এসেই মিথ্যে হয়ে যায় স্বামী স্ত্রীর সাত জন্মের সম্পর্ক, মিথ্যে হয়ে যায় ছেলের কাছে মায়ের দেবীত্বের মহিমা। বস্তুত, সতীত্ব, মাতৃত্ব সবই এক একটা কৌশল নারীকে পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খলে বাঁধবার জন্য। পুরুষতন্ত্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে যে নারীর অস্তিত্বটুকু মুছে ফেলতেও তাদের বাধে না সেকথা মল্লিকা সেনগুপ্ত বারবারই প্রমাণ করেছেন। 'মা' কবিতায় ('মেয়েদের অ আ ক খ') বলেছেন—

'মায়ের গা থেকে যত অতিকথা কবিতা কল্পনা
পলেস্তারা খুলে ফেলে দেখো, তারও রক্তে উত্তাপ
তারও বুকে ধক্‌ধক্ করে হৃদরোগ, প্রণয়ের ভাষা
মাতৃহত্যা মনে পড়ে ওরেস্টেস, পরশুরামের!'[৯]

আমাদের পুরাণের পরশুরামের মতোই গ্রীক পুরাণে ওরেস্টেস তার মা ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে হত্যা করেছিল এবং সেখানেও দেবপিতা জিয়ুসের যুক্তি অনেকটা জমদগ্নির মতোই—

"The mother is not the parent of the child
which is called her's, she is the nurse who tends to growth
of young seed planted by its true parent, the male"[১০]

যেহেতু 'নারীর ব্যাভিচারে ডোবে সমাজ/নিয়ম গড়েছেন শাস্ত্রকারগণ'[১১] সেহেতু পুরুষ তখন নেয় শায়েস্তার ভূমিকা, ছেলের হাতে লাগে মাতৃহত্যার রক্ত। আজকের দিনে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে পরিবারের সম্মান বাঁচাবার জন্য বাপ-ভাইয়ের হাতে মেয়েদের যে হত্যা 'অনারকিলিং'-এর তক্‌মা পেয়েছে রেণুকার হত্যা কি সেই একই শ্রেণির নয়?

চিরদিনই মেয়েদের দেখা হয় একটা সমাজের, জনজাতির মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে। তাই যুদ্ধ বিগ্রহে পরাজিত জাতির মেয়েদের নষ্ট করা প্রতিপক্ষের সেনাদের কাছে একটা প্রধান লক্ষ্য। মেয়েরা যেন দুধের মতো, সহজেই নষ্ট হয় আর নষ্ট মেয়ের সংসারে বা সমাজে কোনও স্থান নেই। তাই সমাজ সংসারের সম্মান বাঁচাতে তৈরি হল জহরব্রত, সহমরণ প্রথা, অগ্নিপ্রবেশ। মেয়েদের মরতেই হবে, হয় শত্রুর হাতে অথবা স্বজনের হাতে, নিস্তার নেই কোথাও। এমনই ষোলোহাজার নারীর কথা মহাভারতের মৌষলপর্ব থেকে তুলে এনেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর 'মৌষলপর্বের মেয়েরা' ("মেয়েদের অ আ ক খ")[১২] কবিতায়। যদুবংশ ধ্বংস হল যখন, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের মৃত্যুর পর অর্জুন তাদের দেহ সৎকার করলেন। কিন্তু তাঁদের বিরাট হারেমের ষোলোহাজার

নারীর কী হবে? এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জানতেন বিধবার জীবনে আর কোনও কিছুতেই কোনও অধিকার নেই। তাই রোহিণী, মদিরা, দেবকী এবং ভদ্রা এঁরা স্বামীর চিতাতেই সহমৃতা হলেন। বাকিরা জীবনের আশায় চললেন অর্জুনের সঙ্গে। পথে পঞ্চনদের দেশে, সম্ভবত পাঞ্জাবে তাঁদের তাঁবু পড়ল, আর সেখানেই আক্রমণ হল ডাকাতের। অর্জুন তখন বৃদ্ধ, তাই তিনি কিছুই করতে পারলেন না। দস্যুরা নারীদের হরণ করতে লাগল এবং কেউ কেউ স্বেচ্ছায়ও তাদের সঙ্গ নিল। এইখানে মল্লিকা ব্যক্ত করেছেন রক্তমাংসের নারীরও যে কামনা থাকতে পারে এবং সেটা সতীত্বের ফাঁপা অহংকারের চেয়ে বেশি কিছু সেই সত্যিটা—

"স্বামীকে মাত্র একরাত যারা পেয়েছে
ওই দস্যুর চাহ্‌ত তাদের স্বপ্ন"[১৩]

পুরুষপ্রধান সমাজ ভালো চোখে দেখে না নারীর যৌনচেতনা, বিপরীত রতি এখানে নিন্দার এবং নারীও যে বাঁচতে চায় পুরুষের তৈরি ধর্ম তাকে অস্বীকার করে। তাই অবশিষ্ট যে নারীরা জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে অর্জুনের সঙ্গে এসে ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছোলেন, সেই রুক্মিনী, জাম্ববতীরা দেখলেন "রক্ত রেশমে সোনা গহনায় ওই প্রস্তুত অগ্নি/বিধবা পোড়ানো তন্দুর, যাকে ধর্ম/সতীমন্দির বানায় ভারতবর্ষে।"[১৪] কবিতার শেষে কবির সংযোজন আরও কিছু নাম, যারা মৌষলপর্বের মেয়ে নয় কিন্তু সনাতন ভারতবর্ষের রীতির বলি আজকের পৃথিবীর "রূপ কানোয়ার, এবং প্রত্যন্ত পাথর প্রতিমার কোন এক লক্ষ্মী গড়াই ...।"[১৫]

মল্লিকা সেনগুপ্ত মেয়েদের প্রতি এহেন ব্যবহারের জন্য কোনও একক পুরুষকে দায়ী করেননি, দায়ী করেছেন 'পিতৃতন্ত্র নামে এক দর্শন ও তার নিজস্ব আচরণবিধি'[১৬]-কে। তিনি বলেছেন 'চিরকালীন পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলিতে বাবার যে চিত্রকল্প নির্মাণ করা হয় তা প্রায় ঈশ্বরের সমতুল'[১৭]। আর তাই—

"রাজার কন্যা মাধবী
জন্মেছি আমি অতীতে
আমাকে বিক্রি করেই পিতা ও প্রেমিক
ধর্ম অর্থ মোক্ষ নিয়েছে জিতে
তোমাদের কাছে শোনাতে এসেছি আজকে
অদ্ভুত সেই গালব মাধবী কাহিনী"[১৮]

যযাতির কন্যা মাধবী। "বিশ্বামিত্র মুনির শিষ্য গালব গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য চাঁদের মত শুভ্র অথচ একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ এইরূপ আটশত ঘোড়া সংগ্রহ করার চেষ্টায় যযাতির কাছে প্রার্থী হন। যযাতি সেরূপ ঘোড়া দিতে না পেরে নিজকন্যা মাধবীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে বলেন, এই কন্যাকে শুল্ক হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়ে গালব অন্য কোন নরপতির কাছ থেকে অনুরূপ ঘোড়া সংগ্রহ করতে পারেন।"[১৯] কিন্তু তখন কোনও রাজার কাছেই এই বিশেষ ধরনের ঘোড়া এতগুলো ছিল না। তাই পর্যায়ক্রমে অযোধ্যার রাজা হর্যশ্ব, কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ ঊশীনরের কাছে মাধবীকে এক বছর করে রেখে দুশো দুশো করে মোট ছয়শত ঘোড়া সংগ্রহ করেন গালব। কিন্তু এর পরেও বাকি দুশো ঘোড়া কোনও রাজার কাছেই না পাওয়ায় গালব তাঁর গুরু বিশ্বামিত্রকেই প্রস্তাব দেন এক বছরের জন্য মাধবীকে গ্রহণ করার। 'তপস্বী প্রলুব্ধ'[২০] হলেন কারণ এমন নারী 'দুর্লভ রত্ন'[২১]। এই চারজন পুরুষের ঔরসে মাধবীর চারটি পুত্র হয়েছিল, যথাক্রমে—বসুমনা,

প্রতর্দন, শিবি এবং অষ্টক। মাধবীকে ব্যবহার করে গালব গুরুদক্ষিণার দায় থেকে মুক্ত হন, যযাতি দ্যাতা হিসাবে চরম প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং অপুত্রক পুরুষেরা পুত্র লাভ করেন কিন্তু মাধবী? তাঁর কথা কি কেউ ভেবেছেন? মাধবীর পিতা মাধবীর বিনিময় মূল্য বিষয়ে কত সহজেই গালবকে বলতে পারেন—

"মাধবীর অধিকার দিন গুনে দিও
অশ্বের গণনা করে প্রাপ্য বুঝে নিয়ে
আবার ফিরিয়ে এনো, এই স্বর্ণপ্রসূ
নারী দেবে আমাদের সুখ ও সম্পদ।"[২২]

যেন কন্যা পিতার সম্পত্তি। দান চাইতে আসা ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে না দেওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, কিন্তু তা বলে কন্যাকে দান করতে হবে? বস্তুত এখানে কিন্তু কন্যার ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করে তাকে বস্তু হিসাবেই মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এখানে মনে পড়তে পারে গ্রীক পুরাণে ইফিগেনাইয়ার কথা। "স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ"-এ প্রসঙ্গক্রমে মল্লিকা সেনগুপ্তই পিতৃতন্ত্রী বাবাদের নিষ্ঠুরতার অন্যতম উদাহরণ হিসাবে বলেছেন অ্যাগামেমননের কথা, জাহাজ আটকে গেলে বাতাসকে অনুকূল করার জন্য দৈবজ্ঞদের নির্দেশে যিনি তাঁর কিশোরী কন্যা ইফিগেনাইয়াকে বলি দেন। মাধবীও পিতৃতন্ত্রের বলি। তাই 'সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন জননী',[২৩] 'পুরুষের ভারে ক্লান্ত মাধবী'[২৪]-কে

"অপরাধবোধ ক্লিষ্ট গালব যেদিন
বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে বললেন, নারী
ক্ষমা কর অপরাধ, তুমি কি সম্মত
মাধবীর চোখ ফেটে রক্ত নেমে এল।
সেই রক্ত আজও থাকে নারীর সিঁথিতে।"[২৫]

মাধবীর ঘটনা থেকে অন্য আর একটি যে তথ্য বেরিয়ে আসে সেটা হল মহাভারতের যুগে তখনও মেয়েদের যৌনবন্দিত্ব ছিল না। মল্লিকা সেনগুপ্ত বলেছেন "যদিও তখন বিবাহ বা নারীর ওপর পুরুষের দান করার স্বত্ব স্থাপিত হয়ে গেছে তবুও পূর্বতন সামাজিক আচার অনুসারে নারীর মুক্ত যৌনতা স্বীকৃত ছিল। দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীকেও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও মাধবী, দ্রৌপদী, কুন্তি কেউই স্বেচ্ছায় স্বনির্বাচিত পুরুষের সংসর্গ করেন নি, পিতা, মাতা বা স্বামীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিলেন মাত্র।"[২৬] কথিত কুন্তী দ্রৌপদীকে না দেখেই পাণ্ডবেরা যা এনেছেন তা পাঁচ ভাইকে ভাগ করে নিতে বলেছিলেন। নারী যে কোনও ভাগাভাগির বস্তু নয় তা কি কুন্তী বোঝেননি, অথবা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাতে এমন দুর্মূল্য নারীরত্নের জন্য তাঁর পাঁচ ছেলের মধ্যে কলহ বিবাদ হয়ে শক্তিক্ষয় না হয়ে যায়? দ্রৌপদীর ইচ্ছে অনিচ্ছে এখানে গুরুত্বহীন। তাঁর আক্ষেপ, তাঁর প্রেম এবং যন্ত্রণার কথা মল্লিকা শুনিয়েছেন 'দ্রৌপদীর স্বামীরা' কবিতায়—

'পাঁচটি পুরুষ মিশেছে জীবনে
পঞ্চভূতের শরীরে
সুখে ও দুঃখে চৈত বৈশাখে
প্রেমে শঙ্কায় মরি রে'[২৭]

পুরুষতন্ত্র এটা প্রচার করে থাকে যে মেয়েদের থেকে অশান্তির সূত্রপাত। পৃথিবীর চারটি মহাকাব্যেই মহাযুদ্ধগুলির কারণ নারী। তারা এটা বলে না, যে, নারীর জন্য পুরুষের লোভ, রিরংসা এবং তার উপর আধিপত্য স্থাপনের রেষারেষিই মহাযুদ্ধগুলির মূলে। মহাকাব্যের নায়িকার কণ্ঠস্বর শোনাননি কোনও মহাকবিই, কিন্তু আজকের 'কথামানবী' দ্রৌপদীর হয়ে প্রশ্ন তোলেন—

'স্ত্রীকে পণ রাখার অধিকার কে দিল স্বামীকে?'[২৮]

অথবা যেন দ্রৌপদীই আজকের মেয়েদের হয়ে কথা বলেন—

"হে পুরুষ
রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে?
না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে
তার মুখ কালো করে দিতে চাও।"[২৯]

এ তো আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, পুরুষ জেনে এসেছে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, নারীও তাই। কিন্তু তার মধ্যেও কোনও কোনও নারী থাকেন যিনি আগুন বন্যা, দ্রৌপদীও তেমন একজন নারী যিনি ভরা সভায় দাঁড়িয়ে অপমানিত হওয়ার পরও প্রশ্ন করেছিলেন, প্রতিবাদে, বিস্ফারিত ক্রোধে মুখর হয়ে উঠেছিলেন—

'তোমরা বিধান দাও, তোমরাই বোবা হয়ে থাক
পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ, প্রতিশোধ রমণীর শ্লীলতাহানিতে
....
....
ওরে দুঃশাসন শোন, দেবতাও এসে তোকে বাঁচাবে না
মহাযুদ্ধে পাণ্ডবেরা প্রতিশোধ নেবে দারুণ লজ্জার'[৩০]

আজও পৃথিবী জুড়ে তারা দাপটে বেঁচে আছে যারা মেয়েদের কাপড় ধরে টান মারে, যারা স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই ভাবে না, যারা মেয়েদের স্বপক্ষে কথা বলাকেই বলে 'নারীবাদ'। নারীবাদ নিছক কোনও পশ্চিম থেকে আমদানি করা ভাবধারা নয়, 'নারীবাদের উৎস আছে আমাদের দেশেই'[৩১] শীর্ষক নিবন্ধে মল্লিকা সেনগুপ্ত দ্রৌপদীকেই চিহ্নিত করেছেন নারীর বুদ্ধি ও জেদের সেই প্রতীক হিসাবে যা যুগে যুগে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করেছে। পুরাণের এই সব মেয়েরা দেবী নন, কিন্তু মানবী হয়েও দেবীত্বে উত্তীর্ণ পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিতে তাদের সহনশীলতা, ত্যাগ ও সতীত্বের আদর্শের জন্য। কিন্তু আধুনিক নারী কবি তাঁদের দেখেন অন্যভাবে। দেখেন এঁদের জীবন আসলে পুরুষের ব্যবহার, অপমান আর প্রভুত্বের চাপে পিষ্ট হতে থাকার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। নারীকে দেবী বানানো পুরুষতন্ত্রের একটা চাল, একটা উদাহরণ তার দ্বিচারিতার। নয়তো শক্তির মূলীভূত আধার হিসাবে নারীকে কল্পনা করেও তার শক্তিকে খর্ব করার প্রয়াস এত ব্যাপক কেন! পৌরাণিক দেবী দুর্গা শক্তির প্রতিমা। অথচ তাঁর অসুরদলনী চণ্ড তেজকে বাঁধ দিতে চাওয়া হচ্ছে পুত্র কন্যা সহ এক ভরাট সংসারের গণ্ডিতে। এই দ্বিচারিতার একটা খুব যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নিরূপণ করেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত—

"এই আরোপিত মাতৃপূজা নারীর প্রকৃত সংহারী শক্তিময়ী আত্মপ্রকাশের উপর ভাবঘন অলৌকিক দূরত্ব আরোপ করে। প্রথম থেকেই যেন বলে দেওয়া হয় যে,

কঠোর শক্তিময়ী আর মমতাময়ী গৃহবধূর মাঝখানে একটা দেওয়াল উঠে আছে। এবং যেহেতু এ দেওয়াল ভাঙবার নয়, সেহেতু ঘরের মধ্যে শক্তিময়ীর প্রকাশও কাম্য নয়। দেবীরা তো মুষ্টিমেয় তাই হাজার হাজার বাঙালী মেয়ের কাছে তাঁরা অনুপ্রেরণার দৈনন্দিন রোল মডেল হয়েও ধরা দেন না।"[৩২]

কিন্তু যখন মেয়েদের নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, বঞ্চনা থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে, যখন দরকার মেয়েদের আত্মশক্তির জাগরণ তখন তো দুর্গাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে নিজের ভিতর! মল্লিকা সেনগুপ্ত তাই খেটে খাওয়া, স্বনির্ভর, প্রতিবাদী, ধর্ষিতা, জঙ্গি-টেররিস্ট সব ক্ষেত্রের মেয়েদের মধ্যে খুঁজে পান 'আমার দুর্গা'কে—

"উপোসে রোগাটে মেয়ে পাহাড়ের নেপালি পার্বতী
কয়লা খনিতে খাটা কালি মাখা নিরক্ষর মেয়ে
হে দেবী মোহিনী শক্তি, মহামায়া, লক্ষ্মী, সরস্বতী
হে নারী গৃহিনী শক্তি, কর্মময়ী, পতিতা, ধর্ষিতা
অগ্নিবর্ণা অগ্নিদৃষ্টি উপকথা মানবী কল্পনা
নিজেকে বাঁচাও তুমি আকস্মিক ঠেলা গুঁতো থেকে
হাত তোমার খড়গ হোক, বুদ্ধি হোক খোলা তলোয়ার
আগুনসম্ভবা তুমি, নারী হাতে প্রথম ক্ষমতা
তুমি সেই প্রতিবাদী উঁচুমাথা আশ্চর্যমানবী
দেবীর মুখোশে তুমি নারীমুখ লাজুক দজ্জাল।"[৩৩]

কবি দুর্গাকে খুঁজে পান পাহাড়ি মেয়ে উমা পার্বতী গিরির মধ্যে, যে দার্জিলিং-এর শীত থেকে বাঁচতে বিড়ির উত্তাপ নেয়, মদ্যপ পলাতক স্বামীর তোয়াক্কা না করে নিজেই স্কোয়াশ ফলিয়ে নিজের টাকা রোজগার করে। তিনি এই শক্তিময়ী দেবীকে খুঁজে পান সাঁওতালি মেয়ে দুর্গা সোরেন-এর মধ্যে যে পড়াশুনা করে আর যৌনহেনস্থাকারী স্যারের নোংরা হাতটা মুচড়ে দিতেও দ্বিধা করে না। তার স্বপ্ন সে মহাকাশচারী হবেই—আর একজন কল্পনা চাওলা যার মহাকাশযান ভেঙে পড়ে না। দেবীর কাছে কবির প্রার্থনাও পুরুষতন্ত্রের শেখানো বুলির থেকে আলাদা নারীর নিজস্ব প্রার্থনা—

"আমার পুরুষ যেন ভালবাসা আনে
আমার নারীরা বাঁচে মুক্ত পৃথিবীতে
আমার জীবন যেন কর্মময় থাকে"[৩৪]

দুর্গা নারীশক্তি, মাতৃকাদেবী, অথচ তাঁর পূজায় মানবীর কোনও স্থান নেই। মেয়েরা শুধু ফলমূল কাটা, ভোগ রাঁধা, আলপনা দেওয়া আর কিছু স্ত্রীআচারের অধিকারী কিন্তু ঋত্বিক অনিবার্যভাবেই ব্রাহ্মণ পুরুষ। এই প্রাগৈতিহাসিক নিয়মের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। তাঁর প্রতিবাদ কুমারসম্ভবে শিব-পার্বতীর শৃঙ্গারকল্পনার বিরুদ্ধে 'একুশ শতকের নারীর কল্পনায় দুর্গা অন্য শৃঙ্গারের কথা বলে' এতদিন ধরে শিবলিঙ্গ ফুল বেলপাতা পেয়েছে—

"বিশ্ব এবং নারীপৃথিবীকে এখনও
যোনিপথ ধরে শাসন করেন লিঙ্গ
উমার রাজ্যে উলটোরতির রাজ্যে
অবাধ্য নারী ক্ষমতাবদল চাইছে"[৩৫]

দেবী দুর্গা এক কথায় নির্মিত স্ত্রীলিঙ্গ ধারণার সবকটির বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবির কাছে প্রতিভাত হন। তাই তিনি বলেন "দুর্গাই একুশ শতকে নারীর ক্ষমতায়ন।"[৩৬] দুর্গা দিব্যমানবী। তাঁর মহাতেজ যেন আগুন হয়ে জেগে ওঠে মাটির পৃথিবীর প্রত্যেক নারীর মধ্যে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত একুশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে বিনির্মাণ করেছেন পৌরাণিক নারীদের। আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বদলায়। বদলায় ভাষা, রীতি, নৈতিকতা, আদর্শ এবং মূল্যবোধও। বদলানোই উচিত। কিন্তু সেই বদল বিশেষ ঘটেনি নারীর জীবনে। রামরাজত্বের অটল আদর্শ 'প্রাণ যায় বচন না যায়' আজ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নমনীয় হয়েছে কিন্তু বদলায়নি সতীত্বের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রায় দেড়শো বছর পর ১৯৯৫ সালে রাজস্থানের দেওরালা গ্রামে অষ্টাদশী রূপকানোয়ারের সতী হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে এখনও ভারতবাসীর মনে সতীত্বের ধারণা কতটা বদ্ধমূল। আজও মানুষ সতী মার মন্দির, থানকে শ্রদ্ধা করে। আজও শুধু বিহার, উত্তরপ্রদেশের অশিক্ষিত গ্রামগুলি নয়, পশ্চিমবঙ্গেও পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে নানা ছুতোয় চলে নারী হত্যা। খবরের কাগজ ভরে থাকে ধর্ষণ, শিশুকন্যার পরিত্যাগ ইত্যাদি খবরে। নারী-নির্যাতনের অন্ত নেই অন্যদিকে সমান তালে চলেছে পুরুষতন্ত্রের মগজ-ধোলাই করা মা মাসিদের 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ'-এর কার্যক্রম। আজ ২০১৩ সালে বিশ্বনারী দিবসের পূর্বাহ্নে ৭ই মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় স্বাতী ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার মেয়েদের জন্য এটা সেটা ব্যবস্থা করছেন, স্কুল পড়ুয়ার জন্য সাইকেল, আসন্নপ্রসবার জন্য ফ্রি ভ্যানরিক্সা, দু একটা লেডিজ স্পেশাল ট্রেন, কিছু চাকরি যার মাইনে অল্প খাটুনি বেশি। "এদিকে মেয়েরা দেখছে আগেও যা পরেও তা। তারা লেখাপড়া শিখছে, রোজগার করছে, ভোটেও জিতছে। অথচ লাথি ঝাঁটা সহ্য করেও উঠোনের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে। মেয়েরা পুড়ে মরে, গলায় দড়ি দেয়, তবু কেন ঘর থেকে বেরিয়ে নতুন জীবন খোঁজার সাহস পায় না"?[৩৭] কারণ মেয়েরা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, পুরুষের সঙ্গে বুঝে নিতে আজও সাহস পায় না সে। আজও তার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ, পৌরাণিক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একই ধারাবাহিকতায় চলেছে নারীহিংসা ও তার সামাজিক স্বীকৃতি। তাই তো চেষ্টা দমনের মধ্যে থেকে দুর্গার উদ্বোধনের। কবিরা আশা করেন, পথ দেখান, আর তাই হয়তো বাস্তবের মেয়েদের মধ্যে থেকেও উঠে আসছেন দিল্লিতে দামিনীর মত সাহসিনী যিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও দোষীদের শাস্তি চান, আসছেন মালালা ইউসুফজাই-এর মতো প্রতিবাদী যিনি মৃত্যুভয় উপেক্ষা করেও তালিবানি ফতোয়ার বিরুদ্ধে কণ্ঠ তোলেন। এঁদের মধ্যেই আমরা আবার খুঁজে পাই নতুন যুগের দ্রৌপদীকে, দুর্গাকে—পুরুষতন্ত্র যতই তার স্বর রুদ্ধ করার চেষ্টা করুক।

উল্লেখপঞ্জি

১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "মেয়েদের অ আ ক খ", 'মা', পৃষ্ঠা ১৬৫।

২। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "হাঘরে ও দেবদাসী", 'বেতকলসির জল', পৃষ্ঠা ৯৮।

৩। জীবন সাহা, সংকলন ও সম্পাদনা, 'নারীচরিতাভিধান', দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

৪। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "হাঘরে ও দেবদাসী", 'বেতকলসির জল', পৃষ্ঠা ১০১।

৫। দ্রষ্টব্য ৪ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ১০২।

৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্ককরণ মার্চ ২০১২, "অর্ধেক পৃথিবী", "অপাপমানবী", 'আপনি বলুন মার্কস', পৃষ্ঠা ১১৫।

৭। দ্রষ্টব্য ৪ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ১০৩।

৮। দ্রষ্টব্য ৪ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ১০৫।

৯। দ্রষ্টব্য ১ সংখ্যক টীকা।

১০। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৯, "খোলনলচে বদলে ফেলুন পরিবারের", পৃষ্ঠা ৭০।

১১। দ্রষ্টব্য ৪ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ১০৬।

১২। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "মেয়েদের অ আ ক খ", 'মৌষলপর্বের মেয়েরা', পৃষ্ঠা ১৮৮।

১৩। দ্রষ্টব্য ১২ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ১৯১।

১৪। দ্রষ্টব্য ১২ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ১৯১।

১৫। দ্রষ্টব্য ১২ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ১৯১।

১৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৯, 'পিতার পৃথিবীতে', পৃষ্ঠা ২৭।

১৭। দ্রষ্টব্য ১৬ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ২২।

১৮। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "আমরা লাস্য আমরা লড়াই", 'মাধবীর গান', পৃষ্ঠা ২৮৯।

১৯। দ্রষ্টব্য ৩ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ৪১১।

২০। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "কথামানবী", 'মাধবীজন্ম', পৃষ্ঠা ২৩১।

২১। দ্রষ্টব্য ২০ সংখ্যক টীকা।

২২। দ্রষ্টব্য ২০ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ২২৯।

২৩। দ্রষ্টব্য ২০ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ২৩২।

২৪। দ্রষ্টব্য ২৩ সংখ্যক টীকা।

২৫। দ্রষ্টব্য ২৩ সংখ্যক টীকা।

২৬। দ্রষ্টব্য ২০ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ৬৮।

২৭। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "মেয়েদের অ আ ক খ", 'দ্রৌপদীর স্বামীরা', পৃষ্ঠা ১৬৬।

২৮। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "কথামানবী", 'দ্রৌপদীজন্ম', পৃষ্ঠা ২০৭।

২৯। দ্রষ্টব্য ২৮ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ২০৯।

৩০। দ্রষ্টব্য ২৮ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ২০৮।

৩১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র', বিকাশ গ্রন্থভবন, প্রথম প্রকাশ ২০০২, "নারীবাদের উৎস আছে আমাদের দেশেই", পৃষ্ঠা ৬৩।

৩২। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র', বিকাশ গ্রন্থভবন, প্রথম প্রকাশ ২০০২, "মাতৃপূজার নামে...", পৃষ্ঠা ৮৮।

৩৩। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২, "ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে", 'আমার দুর্গা', পৃষ্ঠা ৪০০।

৩৪। দ্রষ্টব্য ৩৩ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ৪০২।

৩৫। দ্রষ্টব্য ৩৩ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ৪০৮।

৩৬। দ্রষ্টব্য ৩৩ সংখ্যক টীকা, পৃষ্ঠা ৪০৯।

৩৭। স্বাতী ভট্টাচার্য, "কটা মেয়ে জমির উত্তরাধিকার পায়" আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা ৪।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলি

১। জীবন সাহা সংকলন ও সম্পাদনা, নারীচরিতাভিধান, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১১।

২। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মার্চ ২০১২।

৩। মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৯।

৪। মল্লিকা সেনগুপ্ত, পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র, বিকাশ গ্রন্থভবন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০২।

ব্যবহৃত পত্রপত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদক অভীক সরকার, বৃহস্পতিবার, ৭মার্চ ২০১৩।

সাহিত্যে বারাঙ্গনা চরিত্র : মাতৃত্ববোধে উত্তরণ

সুধাংশুশেখর মণ্ডল

প্রস্তাবনা

বিশ্ব সংসারে মায়ের বিকল্প কিছু হতে পারে না। শুধু মনুষ্য সমাজে নয় পশু সমাজেও। বিধাতার অপার কৃপা, শাবক ভূমিষ্ঠ হতেই মানবী মায়ের বুক ভরে নেমে আসে পীযূষ ধারা। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। সদ্য ভূমিষ্ঠ অসহায় সন্তানের আগামী পৃথিবীতে টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন তার মা। তাইতো বাউল কবি সোচ্চার কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—"মায়ের মত আপন কেহ নাই...।" তবে স্মরণ রাখতে হবে, সন্তানের কাছে কেবল জন্মদাত্রী মা-ই সর্বেসর্বা নয়। শৈশবে যে সন্তান মাকে হারিয়েছে, সেই মাতৃহারা শিশু যদি কোনও নারীর বাৎসল্যে পালিত হয় তাহলে সে নারীও মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত হবার দাবি রাখে। কারণ মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগসূত্র বাৎসল্যে যা নারীর সামাজিক পরিচয় নিরপেক্ষ এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। দেবকী-গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পালিতা মা যশোদা কিংবা ধাত্রী-পান্নার উদাহরণ পুরাণে ইতিহাসে বিরল নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর পরিচয় রয়েছে আনন্দময়ী চরিত্রে যিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের বৌ হয়েও জন্মসূত্রে আইরিশ গোরাকে কোলে তুলে আজন্মের সংস্কারকে ত্যাগ করেছিলেন শুধু বৃহত্তর মানবধর্মের সত্য রক্ষার জন্য। তাই নিঃসংকোচে বলা চলে মা আর সন্তানের মধ্যে জাত-ধর্ম এমনকি সামাজিক পরিচয়ের কোনও ব্যবধানই হয়ে ওঠার কথা নয়, কিন্তু হয়। সমাজ মাঝে মাঝে মা ও সন্তানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

বারাঙ্গনার মাতৃত্ববোধ

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।"[১]

এই আপ্তবাক্যটি মহাকবি তাঁর 'উর্বশী' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন হয়তো উদ্ভিন্না যৌবনা উর্বশীর পৌরাণিক পরিচয়কে স্মরণ করে। উর্বশী ও পুরুরবার প্রেম কাহিনিও পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যেখানে পুরুরবার প্রতি একান্ত প্রেমাসক্ত হয়ে মর্ত্যে দীর্ঘদিন স্ত্রীরূপে উর্বশী একত্রে বসবাস করেছিল এবং পুরুরবার ঔরসজাত সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিল। তাই উর্বশীর পরিচয় শুধু এটুকু নয় যে সে নৃত্য-গীত-সৌন্দর্যে নন্দনবাসীদের হৃদয় জয় করত মাত্র। তার পরিচয় এটাও যে, সে মর্ত্যে কারো জননী। কবি নিজেই তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে লিখেছেন—"ফুলের পরিণতি ফল যেমন, তেমনি নারীর যৌবন কুসুমের পরিণতি সন্তান।"[২] চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সন্তান গর্ভে ধারণ করে নারীত্বের তথা মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছিল। চিত্রাঙ্গদা প্রমাণ করেছে—"নহি আমি শুধু সেবার রমণী।"[৩]

নারী মাত্রেই পুরুষের কামনা পূর্তির সাধন মাত্র নয়। কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর 'মহিলা কাব্যে' নারীর সামাজিক পরিচয় নির্দিষ্ট করেছেন চারটি রূপে—জননী-বধূ-কন্যা-ভগিনী। আর সমাজের 'না'-এর গণ্ডিকে যারা অতিক্রম করে শুধু জীবন ও জীবিকার তাড়নায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয় সমাজের দৃষ্টিতে তারা বারাঙ্গনা। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে মাতৃত্ববোধ নারীর

মৌল প্রবৃত্তি আর সে কারণেই তা সামাজিক পরিচয় নিরপেক্ষ। তাই বারাঙ্গনাও নারী বলেই তার অন্তরে সদা জাগ্রত থাকে নারীর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যার মধ্যে অন্যতম মাতৃত্ববোধ। বারাঙ্গনার হৃদয়ে মাতৃত্বের আকুলতাকে হয়তো সমাজ স্বীকৃতি দিতে চায় না কিন্তু তার যে মাতৃত্ব প্রতিনিয়ত অজস্র ধারায় নির্ঝরিত তা বোঝা যায় বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ড. স্মরজিৎ জানার বক্তব্য পাঠ করলে। তিনি লিখেছেন—"যৌনকর্মীরা মাতৃত্বের কাঙাল-হয়তো সমাজের আর সব মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি মাত্রাই।...এক আধজন নয় ডজন ডজন যৌনকর্মী গর্ভধারণ করতে না পারার জন্য কান্না আর হতাশায় ভেঙে পড়েন।"[৪] এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে বিভিন্ন সাহিত্য সংরূপে। কবি-নাট্যকার-কথাকাররা স্রষ্টা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হয়ে তাঁর আপন আপন সাহিত্যকর্মে সেই সব যন্ত্রণাদীর্ণ বারাঙ্গনা চরিত্র নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, যারা পারিবারিক বিভিন্ন সম্পর্কে বাঁধা পড়তে ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু নিষ্ঠুর মানব সমাজ তাদের কাতর ডাকে সাড়া দেয় না।

সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন জুড়ে বিভিন্ন লেখকের সাহিত্যকর্মে উঠে এসেছে 'বারাঙ্গনার মাতৃত্ববোধে'র স্বরূপ। প্রকট হয়েছে বারাঙ্গনা হয়েও সময় বিশেষে কেমন করে তারা হয়ে উঠেছে স্নেহময়ী জননী। সুবিস্তৃতকাল ধরে বহমান ক্লেদাক্ত জীবনের মাঝে মাতৃত্বের সুখে উদ্বেল, বেদনায় যন্ত্রণাহীর্ণ কিংবা কর্তব্যে অবিচল বারাঙ্গনারা সমাজের চোখে ঘৃণিত হয়েও হৃদয় উজ্জ্বল প্রকাশে মহীয়সী হয়ে উঠেছে কাব্যে-নাটকে-গল্পে কিংবা উপন্যাসের পাতায়। তার দৃষ্টান্তসহ পর্যালোচনাই হবে এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য

বহুমুখী ধারায় বহমান ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, কামশাস্ত্র ছিল তার মধ্যে একটি অন্যতম ধারা। বারাঙ্গনা বা গণিকা প্রথা হল এই কামশাস্ত্রের খণ্ডিত অংশ। একালে বারাঙ্গনা বলতে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতে কিন্তু তেমনটি ছিল না। অবস্থানের দিক দিয়ে তারা 'দেহজীবী' হলেও পটভূমি ছিল ব্যাপক ও বর্ণময়। "সেকালে বিশেষত নাগরিক জীবনে আভিজাত্য দ্বারা বেশ্যাবৃত্তি পরিপোষিত হতো। বেশ্যা বা গণিকার সামাজিক মর্যাদাও এখনকার মতো ছিল না। স্বয়ং দেশের রাজা গণিকাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাৎসরিক ১০০০ পণ বেতন দিয়ে রাজা তাঁর প্রাসাদে গণিকাদের নিয়োগ করতেন। তাদের আয়ের একটা বড় অংশ কর হিসাবে রাজার কোষাগারে গৃহীত হতো। এসব কারণে প্রাচীন ভারতের দেহজীবা গণিকারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হতো।"[৫] ফলত প্রাচীনকালে গণিকালয়ে গমন সাধারণের ক্ষেত্রে খুব একটা লজ্জাকর বা গোপনীয় ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া প্রাচীন ভারতে বিশেষত বেদোত্তর যুগে ও রামায়ণ-মহাভারতাদি 'এপিক' যুগে কুমারী কন্যা জনিত যৌন-সংস্রব ও কুমারী কন্যার গর্ভসঞ্চার সমাজে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এই সন্তান 'কানীন' পুত্ররূপে স্বীকৃতি পেলেও সসম্মানে বাঁচার সুযোগ পেত। বহুক্ষেত্রেই এই 'কানীন' পুত্রের মায়েরা বারাঙ্গনায় পর্যবসিত হত। তাদের বিরুদ্ধে সমাজের কোনও ভ্রূকুটি না থাকায় সাধারণ মায়ের মতো সন্তান প্রতিপালনে তাদের জুড়ি মেলা ভার। প্রাচীন ভারতের এমন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বারাঙ্গনা মায়েদের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এমন সাহিত্য খুব একটা অপ্রতুল নয়।

বারাঙ্গনাবৃত্তি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অনুমোদিত ও সম্মানের হওয়ায় তাদের নারী

হৃদয়ের কোমল অনুভূতিগুলি স্বতোৎসারিত ধারায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেত। বিশেষ করে তাদের মধ্যেকার মাতৃত্ববোধ বড়ো মধুর রূপে পরিব্যপ্ত হয়েছে যার সাক্ষ্য তৎকালের বিভিন্ন সাহিত্যের প্রতি পরতে পরতে ছড়িয়ে। মাতৃত্বের মহিমায় যারা আসীন, সহজেই যাদের নাম মনে আসে তাদের মধ্যে অন্যতম বসন্তসেনা, আম্রপালী, জবালা, শলাবতী প্রমুখ বারাঙ্গনা নারী। এদের মধ্যে কেউ সদা-সর্বদা নিজের সন্তানের জন্য, কেউ অপরের সন্তানের জন্য একরাশ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে বেঁচে আছে শুধু মাতৃত্বের গর্বে। বারাঙ্গনা হলেও তাদের আচরণে সহজেই মূর্ত হয়ে উঠেছে পুত্র-স্নেহের আকুলতা, যা সাধারণ মায়ের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথমে ভাসের 'চারুদত্ত' ও পরে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে গণিকা বসন্তসেনা নায়িকা-রূপে সু-অঙ্কিত। উজ্জয়িনীর গণিকা শ্রেষ্ঠা অসামান্যা রূপসী এই বসন্তসেনা এক বসন্ত উৎসবের রাত্রিতে জুয়ারি ব্রাহ্মণ চারুদত্তকে ভালোবসে ফেলে এবং বহু সাধ্য-সাধনার পর তার সঙ্গে মিলিত হয়। বারাঙ্গনা হিসাবে এটাই হয়তো বসন্তসেনার আসল পরিচয়। কিন্তু তার পরেই মৃৎ-শকটের জন্য চারুদত্তের ছেলে রোহসেনকে কাঁদতে দেখে যেভাবে তার বুক বঞ্চিত মাতৃত্বের হাহাকারে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং মাতৃস্নেহে আপ্লুত হয়ে গায়ের সমস্ত গহনা খুলে রোহসেনকে খুশি করতে তার মাটির রথটিকে সাজিয়ে দিয়ে তাকে 'মা' বলে ডাকতে শেখায় তাতে বসন্তসেনার বারাঙ্গনা থেকে প্রকৃত মাতৃত্বে উত্তরণ ঘটেছে। চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী বসন্তসেনার নারীত্ব পূর্ণতা পয়েছে রোহসেনের মাতৃ পরিচয়ে। সংসারে বোধকরি এমন কিছু ছিল না যা বসন্তসেনার অধিগত নয়। বাকি ছিল শুধু এই মাতৃত্বের স্বাদ, যা সে লাভ করল রোহসেনকে বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত করে। গণিকা আম্রপালী বৌদ্ধ সাহিত্য 'বিনয়বস্তু জাতকে'র (কাহিনিটি ঐতিহাসিক, 'মহাবগ্গ'তে সংক্ষিপ্তাকারে আছে) নায়িকা স্বরূপ। মগধরাজ বিম্বিসারের সাহচর্যে সে পুত্র সন্তানের জননী হয়েছিল পরে মাতৃত্বের অমৃত স্নেহধারায় তাকে ক্রমেই বড়ো করে রাজদরবারে পিতার নিকট পাঠিয়েছিল। অর্থাৎ বারাঙ্গনা আম্রপালী শুধু সন্তানের জন্ম মাত্র দেয়নি সে পুত্রকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মাতৃ-কর্তব্য যথোচিত পালন করে মাতৃত্বের আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জবালাও তদ্রূপ। 'ঋগ্বেদ' কিংবা 'মহাভারতে'র কাহিনিতে তার স্থান অটুট। সে বারাঙ্গনা হওয়া সত্ত্বেও নারীত্ব ও মাতৃত্বের তাগিদে সত্যকামকে সুশিক্ষা গ্রহণে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে প্রেরণ করেছিল এবং সকল সংশয় ও সামাজিক ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সত্যকামকে সে সত্যকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। গৌতমের আশ্রমে সত্যকাম স্বীয়গুণে ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। একালের মহাকবিও তাকে নিয়ে কবিতা (স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতা) না লিখে পারেননি।

বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবগ্গ'তে (৮, ১/৩-৪) শলাবতী রাজগৃহের প্রধানা গণিকা। একসময় সে সন্তানবতী হয়ে পড়লে গর্ভস্থ সেই সন্তানকে স্বাভাবিক ভাবে জন্ম দিতে প্রেমিকদের কাছে অসুস্থতার ভান করে। অর্থাৎ সে আর কাউকে সঙ্গদান করতে চায় না পাছে সন্তানের কোনও ক্ষতি হয়। বারাঙ্গনা মায়ের মাতৃত্ববোধের এ এক অপূর্ব নজির। ভূমিষ্ঠ হয়ে এই সন্তান বয়ঃকালে জীবক কুমারভৃত্য নামে বিখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল (অবশ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে শলাবতী জীবিকার জন্য দাসীকে দিয়ে যেভাবে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেছিল তাতে তার মাতৃত্বের চেয়ে বারাঙ্গনা জীবনকে আরও কলুষিত করেছে)। অর্থাৎ বসন্তসেনা ব্যতীত আম্রপালী, জবালা, শলাবতী এরা প্রত্যেকেই আপন সন্তানের জন্য যেভাবে প্রাণপাত করেছে

তাতে অকপটেই বলা যায় তারা মাতৃত্বের শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত। আর বসন্তসেনা অপরের সন্তানের মুখে মাতৃ সম্ভাষণে আপ্লুত হয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে তার চিরাকাঙ্ক্ষিত মাতৃসত্তার জাগরণ ঘটেছে বলা যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনই ছিল বারাঙ্গনাদের বিচরণ ক্ষেত্র। বারাঙ্গনা চরিত্র এমন সাবলীল ভঙ্গিতে এখানে উঠে এসেছে তা বোধহয় বিশ্বের অন্য কোনও সাহিত্যে এমন ব্যাপক নজির নেই। হয়তো সেকালের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এদের জন্য বিশেষ অনুকূল ছিল। হয়তো সেই কারণে বারাঙ্গনারা সেখানে শতধারায় বিকাশ লাভের সুযোগ পেয়েছিল। তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য বহুগুণেই ম্রিয়মাণ। বারাঙ্গনা চরিত্র পর্যালোচনায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য যদি সূর্যশিখা হয়ে থাকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য হবে মুহ্যমান দীপালোকের মতো। মূলত, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে কেবল দেব-দেবীদের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। কেবল বিদ্যুৎচমকের মতো চকিতে উঁকি দিয়ে গেছে কতিপয় সাহিত্যে যা ছিল শুধুমাত্র আভাসে ইঙ্গিতে। ‘চর্যাপদ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’, ‘বিদ্যাসুন্দর’ প্রভৃতি সাহিত্য যাদের মধ্যে ছিল অন্যতম। তবে এই সকল কাব্য সাহিত্যে হীরামালিনী ছাড়া তেমন কোনও বারাঙ্গনা চরিত্র সরাসরি উপস্থাপিত হয়নি। আর এখানে হীরামালিনীর মাতৃসত্তা কাব্যে প্রকাশিত নয় বলে তেমন কোনও আলোচনার দাবিও রাখে না। তবে এর পশ্চাতে বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান। মধ্যযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার দ্বারা তাড়িত। সারা বঙ্গদেশ জুড়ে একদিকে মুহুর্মুহু বিদেশি মুসলমান আর বর্গির হাঙ্গামা, অন্যদিকে জল-জঙ্গলে ঘেরা দেশের জলে কুমির ও ডাঙায় বিষধর সর্প আর মাংস পিয়াসি শার্দূলের পদতাড়না। দু'য়ে মিলে বাঙালির ওষ্ঠাগত প্রাণ। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মতো তাদের সমাজ জীবন নিরুপদ্রব ছিল না। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুভয় পিছু ধাওয়া করত। এমনই এক পরিবেশে থেকে লেখকদের পক্ষে দৈবনাম নেওয়া ছাড়া মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ছিল আকাশকুসুম কল্পনা। তাই এ যুগের সাহিত্য হয়ে উঠেছিল দেব-নির্ভর সাহিত্য। সাধারণ মানুষের কথা যেখানে ব্রাত্য থেকেছে, বারাঙ্গনারা তো দূরঅস্ত; কল্পনার অতীত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

প্রাচীন থেকে আধুনিক সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান। হাজার হাজার বছর ধরে মহাকালের তরঙ্গ-মুখর স্রোতে ভাসতে ভাসতে নানান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের জন-জীবনে পড়েছে আধুনিকতার প্রচ্ছায়া। অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্নে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা হলেও সমালোচ্য বারাঙ্গনার স্বরূপ তেমন ভাবে উঠে আসেনি। ছড়ায়-কবিতায় তা আংশিক ভাবে বিধৃত। অতঃপর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গদ্যের সহস্র ধারা উন্মুখ হয়ে প্রবাহিত হতে থাকলে অচিরেই তাতে ‘বারাঙ্গনা’র অনুপ্রবেশ ঘটে। ইংরাজ আনুকূল্যে এসে নব্য বাবু-শ্রেণিদের দৈনন্দিন জীবনে যে ব্যভিচার-বেলেল্লাপনা ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল বারাঙ্গনারাই তাতে গতি প্রদান করে। তৎকালে অর্থাৎ উনিশ শতকে রচিত ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’, ‘নববাবু বিলাস’ প্রভৃতি সাহিত্য তার প্রমাণ দেয়। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে সরাসরি কোনও বারাঙ্গনা চরিত্র সৃজিত হয়নি। একমাত্র বঙ্কিমের সাহিত্যে ‘বারাঙ্গনা’ চরিত্র হিসাবে উঠে আসে এবং এরপর

থেকেই তাদের জয়যাত্রা বর্ণাঢ্যময়তায় ভরে ওঠে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, বৈদিক জন-জীবন ও আধুনিক জন-জীবনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রাচীন মানব সমাজের সঙ্গে আধুনিক মানব সমাজের কোনও তুলনাই চলে না। অথচ এই জন-জীবনই সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আধুনিক জন-জীবন নানান সমস্যা সংকুল ও জটিলতায় আচ্ছন্ন। বিশেষত প্রাচীন সমাজে বারাঙ্গনাবৃত্তি যে বিশেষ সম্মানের ছিল সেকালের নানান সাহিত্য তা প্রমাণ দেয়। কিন্তু একালে বারাঙ্গনাবৃত্তি ঘৃণার ও অপমানের। সমাজের চোখে তারা নিন্দিত। ঠিক ঘৃণার কারবারি হিসাবেই তারা সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে। তবে সমাজ যতই অবজ্ঞা করুক না কেন, বারাঙ্গনা তো নারী। নারীর সকল কোমল বৃত্তিগুলোই তো তাদের মধ্যে বহমান। বিশেষ করে সাধারণ মায়ের মতোই তারাও মাতৃত্ববোধে মহীয়সী। প্রাচীন সাহিত্যের গণিকাদের মতো একালের সাহিত্যের কোনও কোনও বারাঙ্গনা সন্তানের জন্য পাগলিনী প্রায়। কী কাব্য, কী নাটক, কী গল্প-উপন্যাস সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বারাঙ্গনা মায়ের গভীর আকুতি।

একালের সাহিত্য ধারায় বারাঙ্গনার মাতৃত্ববোধ মূলত দু'টি ক্ষেত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, নিজের সন্তানের জন্য ও পরের সন্তানের জন্য। প্রাত্যহিক জীবনে হাজার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে সন্তানকে যথাযথ প্রতিপালনে, প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার স্বপ্নে তারা বিভোর। তবে প্রায়শই বারাঙ্গনা জীবনে একটা হতাশাবোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এই হতাশা আর শূন্যময় পরিণাম তাদের জীবন থেকে পাওয়া। অবশ্য এর জন্য সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিই দায়ী। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বিশ শতকের প্রথমার্ধে জনজীবন ছিল নানান অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠায় ভরা। বাঙালি তথা ভারতবর্ষের আপামর জনগণ দেখেছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের স্বরূপ, ১৯১৪-এর প্রথম মহাযুদ্ধের বিভৎসতা, ১৯৩০-এর সন্ত্রাসবাদ, ১৯৩৯-এর আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নৃশংসতা, ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৬৪-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও স্বাধীনতালাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল উদ্বাস্তু সমস্যা। এই যদি হয় সমাজচিত্র, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। এই সময়ের সাহিত্যে যেসকল বারাঙ্গনা চরিত্র উঠে এসেছে তারা প্রায় প্রত্যেকই নানান অস্থিরতায় এবং অনিশ্চয়তায় দ্বিধাদীর্ণ। তাই তো প্রাচীন সাহিত্যের গণিকারা ছিল রাজানুগ্রহে প্রতিপালিতা, আর একালের বারাঙ্গনারা জনগণ কর্তৃক নিগৃহীতা ও অপমানিতা। সমগ্র জীবন তাদের হতাশার অন্ধকারে আবৃত। তবুও ক্ষণিক চমকিত দামিনীর মতো তাদের কারো কারো চরিত্র আপন কর্তব্যগুণে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেই সত্য মানবকুল সহজে বিস্মৃত হয় না। সাধারণে বিমোহিত হয় তাদের মাতৃত্ববোধে। এক লহমায় যেন তাদের সকল জীবন-যন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে যায়।

আপন সন্তানের জন্য বারাঙ্গনাদের ব্যাকুল হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্যে অপ্রতুল নয়। কবি নজরুল তাঁর 'বারাঙ্গনা' কবিতায় সোচ্চার কণ্ঠে বলেছেন—

> "কে বলে তোমায় বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে।
> হয়তো তোমায় স্তন্য দিয়েছে সীতাসম সতী মায়ে।"[৬]

সমাজের বহু প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। বারাঙ্গনার প্রতি তাঁর দৃষ্টিকোণেও মেলে মানবতার সুর। তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বারাঙ্গনা পুত্র দ্রোণ অথবা সত্যকামের কথা এমনকি বারাঙ্গনা মা ঘৃতাচী, জবালার মাতৃত্বও তাঁর কলমে অপার মহিমায় ভূষিত। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে এমন কিছু চরিত্র—নীলা, পুলিনের মা, নীলিমা,

কাশীবাসিনী, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গণিকা, জুনি, প্রমদা, মাতঙ্গী, আনোয়ারবাই, ফিরোজবাই, চামেলি, লক্ষ্মী, উত্তরা, চম্পা, পারুল, তমসা প্রমুখেরা যারা সামাজিক পরিচয়ে বারাঙ্গনা হলেও যে কোনও মায়ের মতোই সন্তানের মঙ্গল কামনায় সদাসর্বদা নিবেদিত প্রাণ। ধরা যাক, আশুতোষ মুখোপাধ্যয়ের 'মাশুল' গল্পে নীলার কথা। অসুস্থ শিশু কন্যা সন্তানকে বারান্দাতে নিজের মায়ের কাছে রেখে ঘরের মধ্যে বাবু জয়ন্তকে রাতের পর রাত দেহ দান করেছে কেবল সন্তান প্রতিপালন আর ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে। বাস্তবের কষ্টি পাথরে নীলার মাতৃত্ব খাদহীন সোনার মূল্যে বিকশিত। অনুরূপ ভাবে কবিতা সিংহের 'চিত' গল্পে পুলিনের বারাঙ্গনা মা কী বিষম কষ্ট সয়ে পুলিনকে মানুষ করেছে তার অপূর্ব চিত্র এখানে উদ্ঘাটিত। পুলিনের মা যখন খাটের উপর বাবুর সঙ্গে মিলিত হয়, তখন পুলিন খাটের নীচে একাকী শায়িত। কিন্তু বাবুকে ফাঁকি দিয়ে—"কখনো কখনো মা নিজের হাতটা নামিয়ে দিত পুলিনের কাছে, পুলিন সেই হাতটা চোখে গালে বোলাত।"[৭] বৃত্তি এখানে মার বাৎসল্যেও বসাতে চেয়েছে নিষ্ঠুর থাবা কিন্তু মার অকৃত্রিম ভালোবাসা, অন্য দিকে শিশুর মাতৃ-নির্ভরতা এই দু'য়ের সংযোগে এমন মাতৃত্বের চিত্র পাঠক হৃদয়ে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে। লেখিকার অপর গল্প 'নীলার গভীরে' নায়িকা নীলিমা যে ভাবে সন্তান পাবার আকাঙ্ক্ষায় দিনের পর দিন দেহ দান করেছে তাতে মাতৃত্বের সুখ আস্বাদনের জন্য তার আকুলতা সহজেই অনুমেয় কিন্তু শুধু মা ডাক শোনার আকাঙ্ক্ষাতেই তার মাতৃত্ববোধের পরিসমাপ্তি ঘটেনি বরং সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আর পাঁচটা মায়ের মতোই ব্যাকুল হয়ে সন্তানের পিতৃপরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কাশীবাসিনী'র বিধবা জীবনের সামান্য ভুলে দীর্ঘ দিন আপন সন্তানের নিকট ছদ্ম পরিচয়ে কাল যাপন করতে হয়েছিল। সন্তানকে কাছে পাবার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা কাশীবাসিনীর মাতৃহৃদয়ের উজ্জ্বল প্রকাশ যা তার ছলনাকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাসে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গণিকা নিজের পুত্র সন্তানের অসুস্থতায় যেভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সাহায্যের প্রত্যাশায় পুরন্দরের স্মরণাপন্ন হয়েছে তাতে সে গণিকা হয়েও মাতৃত্বে উজ্জ্বল। 'জুহুবীচের সেই মেয়েটা' গল্পে প্রফুল্ল রায় স্ট্রীট ওয়ার্কার জুনির মধ্যে দিয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গণিকার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। সে অসুস্থ সন্তানকে বাঁচাতে আগ্রাসী সোমনাথ চ্যাটার্জীর কাছে নিজের দেহের বিনিময়ে পঁচিশ টাকা প্রার্থনা করেছে। বারাঙ্গনা মায়ের মাতৃত্বের এ এক অপূর্ব নজির।

নারীর কাছে মাতৃত্বের অর্থ শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া নয়, নয় শুধু মাতৃ সম্বোধনে সম্বোধিত হওয়ার সুখে আত্মহারা হওয়া। 'মা' শব্দটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কর্তব্য, নিজেকে ভুলে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার কামনা-কিছু স্বপ্ন-কিছু আশা। সামাজিক প্রতিকূলতা বারাঙ্গনা মায়ের সেই সাধনা, সেই স্বপ্নকে বার বার ভেঙে দেয় তবু তাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকে না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'জামাই' গল্পে প্রমদা মেয়ে বকুলকে মানুষ করতে একদিন পতিতাপল্লি ছেড়ে ভদ্রপল্লিতে এসে বাসা বেঁধেছিল। সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প 'শনি'র মাতঙ্গী তার মেয়ে যমুনাকে বিয়ে দিতে ছেয়েছিল ভদ্রঘরের সন্তান নরেশের সঙ্গে। এজন্য সে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নিয়েছিল কিন্তু পরিণামে জুটেছিল বঞ্চনা! সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ উজাড় করে দিয়েও তার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অনুরূপ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাইজি'তে আনোয়ারবাই মেয়ে মতিকে সভ্যসমাজে রেখে মানুষ করে তাকে সুখী করতে ভদ্র ঘরে বিবাহ দিয়েও স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর 'যমুনাবাই' উপন্যাসে ফিরোজবাইও একই দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। মেয়েকে নিয়ে তারও স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে

যায়, বাস্তবে রূপ পায় না। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণে আসা স্বাভাবিক, বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' নামক বৃহৎ উপন্যাসে বাইজি মায়ের কথা, কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নপুরী'তে চামেলির কথা, অথবা নিমাই ভট্টাচার্যের 'ওরাও মানুষ' গল্পে লক্ষ্মী, উত্তরা, চম্পা, পারুলদের কথা যারা জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটাতে পুত্র-কন্যাদের সুশিক্ষাদানে, সুখী জীবন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করে প্রকৃত জননীর কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছে। তাদের দুর্ভাগ্য যে সামাজিক পরিচয় তাদের কল্পনা-আশা-স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

শুধু কাব্য বা কথাসাহিত্যে নয়, নাটকেও বারাঙ্গনা মায়ের বিশেষ প্রচ্ছায়া পড়েছে। নাটকে এমন কিছু বারাঙ্গনার দেখা মেলে যারা বারাঙ্গনাবৃত্তি গ্রহণ করেছে পরিস্থিতির চাপে, মাতৃত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম অবস্থাতেও তারা কিন্তু মায়ের কর্তব্য বিস্মৃত হয়নি। নিজের জীবনের গহন আঁধারেও তারা জ্বালিয়ে রেখেছে মাতৃত্বের অমলিন দীপশিখাটুকু। প্রসাদকুমার ভট্টাচার্যের 'বাইজি বধূ'তে তমসা কুমারসাহেব কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে গণিকাবৃত্তির আশ্রয় নিলেও কুমারসাহেবের ঔরস-জাত সন্তান স্মৃতিকণাকে সার্থক মানুষ করে তুলতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। তমসা থেকে সে সুরাইয়া বাইজিতে রূপান্তরিত হয়েছে বটে কিন্তু মায়ের কর্তব্য থেকে সে ক্ষণিকের জন্য সরে আসেনি। অসীম হালদারের 'কলির কালনেমি'তে দস্যু টারজানের সন্তানকে প্রতীক্ষা গর্ভে ধারণ করেছে, আবার টারজানের প্ররোচনায় সে বারাঙ্গনাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। তবুও আপন সন্তানের জন্য মাতৃত্বের হাহাকারে সে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে। কুমার নিরঞ্জনের 'শূন্য সিঁথির বদলা নিলাম'-এ রোজিনা শয়তান মাধব ব্রহ্মচারীর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেও মুহূর্তের জন্য আপন মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়নি। নির্মল মুখার্জীর 'বারবনিতা বধূ'তে চাঁড়ালের মেয়ে রুক্মিণী কুমারী জননী হয়েও সন্তানকে নিজের স্নেহ থেকে ক্ষণিকের জন্য বঞ্চিত করেনি। এমনি ভাবে আরও নাটক-কথাসাহিত্যে অসংখ্য বারাঙ্গনা চরিত্র চিত্রিত হয়েছে যারা তাদের ঘৃণিত জীবনে আপন সন্তানকে ঘিরে প্রতিনিয়ত দেখত কল্পিত সুখের স্বপ্ন। মাতৃত্বের মহিমায় তারাও ক্ষণিকের জন্য হয়ে ওঠে গরীয়সী। স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' কাব্যের 'সতী' নামক কবিতাটি—

"তারি মাঝে বসে আছে পতিতা রমণী।
মর্তে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতী শিরোমণি।।"[৮]

আপন গর্ভজাত সন্তানের নিকট প্রকৃত মা হয়ে ওঠার জন্য বারাঙ্গনাদের অন্তর মথিত আকুল ক্রন্দন সাহিত্যের পাতায় বড়ো মোহময় রূপে ফুটে উঠেছে। কিন্তু সব বারাঙ্গনার ভাগ্যে তো এই সুযোগ ঘটে না। তারা যে ঘৃণিত বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত (একালের দৃষ্টিতে), বিবাহ-স্বামী-সংসার-সন্তান তো তাদের জন্য নয়। একবার যার পদস্খলন ঘটেছে সমাজ আর কখনোই তাদের গ্রহণ করে না। বাকি জীবনটা তাদের হতাশায়, নিরাশায় আর মিথ্যা স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে হয়। এই যাদের পরিণতি, হৃদয়ের সুপ্ত মাতৃত্ববোধ কিভাবে তা স্ফূর্তি পাবে! আপন গর্ভজাত সন্তানের মা হয়ে ওঠার কাহিনি যেমন আছে, সেরকমই আছে এমন বারাঙ্গনার কথা যারা অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে অসীম মমতায়। একারণেই শুধু তারা তথাকথিত ভদ্রসমাজের মায়েদের সমসারিতে আসীন হবার যোগ্য। তাদের কেউ কেউ মাতৃ-কর্তব্যে অটল, কারুর চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে মাতৃস্নেহ, কেউবা মায়ের মতোই সব বিপদ থেকে সন্তানকে দু'হাতে আগলে রাখতে চেয়েছে। পরের সন্তানকে কাছে টেনে যারা প্রকৃত মাতৃত্বের মহিমায় সমাসীন সেক্ষেত্রে কয়েকটি নাম সহজেই স্মরণে আসে, যথাক্রমে—

'শ্রীকান্তে' রাজলক্ষ্মী, 'তুরুপে' বিনোদিনী, 'চোর চোর'-এ ললিতা, 'লঘুগুরু'তে উত্তম, 'নন্দ আর কৃষ্ণা'তে কৃষ্ণার গণিকা মা, 'মেলা'তে কমলি, 'হিঙের কচুরি'র নামজাদা বারাঙ্গনা, 'নিশিকুটুম্বে' সুধামুখী, 'রূপবতী'তে রাধারাণী, 'আকস্মিক'-এ কুঞ্জ, 'মন্থশেষ'-এ দাঁতি বিন্দি, 'পতিতার সিদ্ধি' নাটকে চারু প্রমুখ বারাঙ্গনা চরিত্র। এরা কেউ মা নয়, কখনো মা হতেও পারবে না। অথচ পরের সন্তানকে নিজের সন্তান ভেবে তাদের সুখী করতে নিজের সমগ্র জীবনকে উজাড় করে দিয়েছে। সাহিত্যিকদের সহমর্মিতায় ঘৃণিত বারাঙ্গনা চরিত্রে এই যে মোহনীয়তার স্বাদ মেলে সে সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো অনেক কল্লোলীয় কবিদের কবিতাতেও এমন নিদর্শন পাওয়া যায়—

"লাঞ্ছিতা পতিতার উদ্‌ঘাটিলে দ্বার
সতীত্বে তাহারে কৈলে অভিষিক্ত
জয় নব সাহিত্য জয় হে...।।"

ধরা যাক, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এ রাজলক্ষ্মীর কথা। জীবনের দুর্বিপাকে পড়ে সে পাটনার বিখ্যাত পিয়ারী বাইজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া শৈশবে তথা বাল্যের সঙ্গী শ্রীকান্তকে অস্তমিত যৌবনের স্বর্ণদ্বারে অকস্মাৎ উপস্থিত হতে দেখেও রাজলক্ষ্মীকে অটুট সংযমের শিকার হতে হয়েছিল। পাছে সতীনের ছেলে বঙ্কু তাকে ভুল বোঝে। বঙ্কুর কাছে সে এখন 'মা'। এই মাতৃত্বের আসনকে অবিচল রাখতে প্রণয়াস্পদকে পেয়েও দূরে সরিয়ে দেওয়ায় প্রমাণ করে মাতৃত্বের মহিমায় সে গরবিনী। এই রাজলক্ষ্মীর মধ্যেই তো অচিন্ত্যবাবুর কবিতার সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যায়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তুরুপ' গল্পে ডাকসাইটে গণিকা বিনোদিনীর দাপটে চৌধুরী জমিদারবাবুরা তটস্থ। তাকে বশে আনতে তাদের কন্যাসন্তানকে তুরুপ হিসাবে পাঠিয়ে সন্তান অপহরণের দায়ে বিনোদিনীকে কারারুদ্ধ করে। অথচ চৌধুরীদের কন্যাসন্তান তাকে মা বলে ডাকতে বিনোদিনীর অভিব্যক্তি—"সে যেন একবার মাতৃসম্বোধনেই তাকে চিরদিনের মত মাতৃত্ব পদে অভোষিক্ত করিয়া লইয়াছে। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল সে আমাকে মা বলিয়াছে, মা বলিয়াছে।"[৯] বিনোদিনীর এই আকুতি আপামর বারাঙ্গনাদের, কেউ বলতে পেরেছে কেউ পারেনি। বুদ্ধদেব বসুর 'চোরচোর'-এ ললিতা রাতের অন্ধকারে আগন্তুক অর্বাচীন চোরকে কৌশলে ঘরের মাঝে বন্দি করে সযতনে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পারিয়েছিল। এর মধ্যে দিয়েই তো প্রকাশ পেয়েছে ললিতার অন্তর মথিত মাতৃত্ববোধ। জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' উপন্যাসে উত্তম গণিকা জীবন পরিত্যাগ করে বিপত্নীক বিশ্বম্ভরের বাড়িতে এসেছে তার স্ত্রী হয়ে এবং তারই মা মরা মেয়ে টুকিকে আপন সন্তান ভেবে তাকে মনের মতো মানুষ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। কিংবা তাঁর 'নন্দ আর কৃষ্ণা'তে কৃষ্ণার মা গণিকা হলেও যে ভাবে কৃষ্ণার ছলনা-জাল ছিন্ন করে সহজ-সরল যুবক নন্দকিশোরকে মুক্ত করেছিল এ সবই তাদের মাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তারাশঙ্করের 'মেলা' গল্পে হারিয়ে যাওয়া বালিকা মণিকে নিয়ে বারাঙ্গনা কমলি মাসির আগ্রাসী দৃষ্টি থেকে মুক্ত করতে রাতের অন্ধকারে ছাউনি ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এই কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তো প্রকাশ পেয়েছে কমলির অন্তরের অতৃপ্ত মাতৃত্ববোধ। "তাহার মুখ পানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কি বলে ডাকবো? কমলি যেন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলল—মা।"[১০] এই কথায় বারাঙ্গনা কমলির অন্তরের মাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আর আমাদের মনে কোনও প্রশ্ন জাগে না।

এমনি ভাবে মনোজ বসুর 'নিশিকুটুম্বে' কালীঘাটের বারাঙ্গনা সুধামুখী নদীতে (আদিগঙ্গা) কুড়িয়ে পাওয়া শিশু-সাহেবকে যত্নে ও স্নেহে বড়ো করে তুলেছিল। বলা যায়, সুধামুখীই সাহেবের

মা হয়ে তার নারীত্বের সুপ্ত মহিমার জাগরণ ঘটিয়েছে। কিংবা লেখকের 'রূপবতী'তে দেহ বিক্রয়ত্রী রাধারাণী তার মামাতো বোনের কলঙ্ক ঘোচাতে তারই কুমারী সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে আপন মাতৃস্নেহে তাকে ধীরে ধীরে বড়ো করে তুলেছিল। তাই তো নিঃসংকোচে বলা চলে, সেইই শিশুটির মাতৃস্বরূপিণী। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আকস্মিক'-এ গণিকা কুঞ্জ রাখুর প্রতি স্নেহ ব্যাকুল হয়ে যেমন মাতৃত্বের স্বরূপ ব্যক্ত করেছে তাতে সমালোচকের ভাষায় বলতে হয়—"রাখুর প্রতি তাহার সর্বগ্রাসী অপত্য স্নেহ ভাববিলাসের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে।"[১১] তবে বারাঙ্গনা জীবনে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে যুবনাশ্বের 'মন্থশেষ' গল্পে। খেঁদিত দলের শিশু অপহারক বাঞ্ছা বড়োলোকের একটি বাচ্চা ছেলেকে সোনার হারের লোভ দেখিয়ে তুলে এনেছে। সেই ছেলেকে দেখা অবধি দাঁতি বিন্দির (বারাঙ্গনা) মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। "পেটের ক্ষিধে, সারা গায়ে ক্ষিধে ক্ষিধে, এসবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না; সে ক্ষিধের তৃপ্তির পথও তার জানা ছিল। কিন্তু বুকের মাঝখানটাতে এ কিসের ক্ষিধে! এ যে একদম নতুন।"[১২] এই নতুন ক্ষিদেটা হল মাতৃত্ববোধ। মাতৃত্বের ব্যাকুল প্রার্থনায় ছেলেটিকে সে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কেঁদে ফেলেছে এবং খেঁদির সঙ্গে একটা চুক্তি করে ছেলেটিকে থানায় পৌঁছে দিতে গিয়ে ছেলে চুরির অপরাধে সে কারারুদ্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে 'অপমানবর' কবিতায় একজন বারাঙ্গনার জবানিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা সেই ছত্র দু'টি—

"কাঁদিয়া তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে।
লোভে পড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।"[১৩]

এছাড়া, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'পতিতার সিদ্ধি' নাটকে চারু দারিদ্র্যের তাড়নায় অভাবী স্বামী ঘর ছেড়ে বারাঙ্গনাবৃত্তিতে আশ্রয় নিলেও পরবর্তীকালে সেই রাখুর দ্বিতীয় স্ত্রীর অর্থাৎ সতীনের ছেলেদের মানুষ করতে তার অর্জিত বিষয়-সম্পত্তি অকাতরে অর্পণ করার মধ্যেই ফুটে উঠেছে চারুর অতৃপ্ত মাতৃত্ববোধ। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে 'দুর্বার মহিলা সংগঠনে'র নানান কর্মসূচির কথা। যার সাহায্যে বারাঙ্গনারা ঘৃণিত জীবন থেকে মুক্ত করে আপন আপন সন্তানকে সুশিক্ষাদানে বড়ো করে তোলায় অহরহ ব্যাপৃত।

উপসংহার

পরিশিষ্টাংশে রবিঠাকুরের 'পতিতা' কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে বলা যায়—

"তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে।
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।"[১৪]

বারাঙ্গনার জীবনে এক পূজার গন্ধ তাদের মাতৃত্বের সাধনা। এই মাতৃত্বই এনে দেয় তাদের প্রবঞ্চিত নারী জীবনে মুক্তির সাধ। প্রাচীন সমাজে বারাঙ্গনারা পায়নি কোনও অবহেলা, বরং তারা সম্মানিতা। তাই মাতৃত্ব তাদের জীবনকে করে তুলেছে আরও মধুরতর। কিন্তু একালে বারাঙ্গনারা সমাজ কর্তৃক বড়োই অবহেলিতা, অনাদৃতা, ঘৃণিতা। কাজেই মাতৃত্ববোধ ক্ষণিকের জন্য তাদের জীবনে সুখের বাতাবরণ সৃষ্টি করলেও অনেকাংশেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাসের ঘরের মতো অচিরেই সেই স্বপ্ন-সাধ ধূলিসাৎ হয়েছে। অবশ্য এর জন্য দায়ী সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। কিন্তু

বারাঙ্গনা জীবন থেকে মধুময় মাতৃত্বের উদ্বোধনে ক্ষণিক বিদ্যুৎচমকের মতো তারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সেই অনুভূতি স্রষ্টার লেখনীতে ছত্রে ছত্রে যেমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে সহসা যেন উন্মুক্ত হয়ে যায় আমাদের মনের আর একটি আগল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, সমাজের এই ব্রাত্য জীবনের নিষ্করুণ বর্ণমালার উপলব্ধিতে। শুধু সেকাল থেকে একালে নয়, আগামী দিনেও বারাঙ্গনারা সাহিত্য স্রষ্টার সহমর্মিতা নিয়ে সাহিত্যের পরতে পরতে রূপায়িত হবে এই প্রত্যাশা রেখে বলা যেতে পারে, শুধু ঘৃণা আর উপহাস নয় আপন কর্তব্যগুণে সন্তানের স্নেহময়ী জননী রূপে তাদের এই আত্মপ্রকাশ পাঠকের বোধ ও বোধিকে শুধু তৃপ্ত করবে তাই নয় সামাজিক মানুষের বিচার বোধে তা সংযোজিত করবে এক নতুনতর মাত্রা।

তথ্যসূত্র

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'চিত্রা' কাব্যে 'উর্বশী' কবিতা।
২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য।
৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য।
৪) ড. স্মরজিৎ জানা — 'যৌনকর্মীদের জীবনসত্য', পৃষ্ঠা নং ৫০।
৫) দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় — 'সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা', 'লেখকের কথা' অংশে, পৃষ্ঠা নং ১।
৬) নজরুল ইস্‌লাম — 'সাম্যবাদী' কাব্যে 'বারাঙ্গনা' কবিতা।
৭) ড. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত — 'বারবনিতাদের গল্প' গ্রন্থে কবিতা সিংহের 'চিত' গল্প।
৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'চৈতালি' কাব্যের 'সতী' কবিতা।
৯) ড. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত — 'বারবনিতাদের গল্প' গ্রন্থে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তুরুপ' গল্প।
১০) ড. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত — 'বারবনিতাদের গল্প' গ্রন্থে তারাশঙ্করের 'মেলা' গল্প।
১১) ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে, পৃষ্ঠা নং ৪৬৭।
১২) যুবনাশ্ব — 'পটডাঙার পাঁচালী' গল্পগ্রন্থে 'মন্থশেষ' গল্প।
১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'অপমানবর' কবিতা।
১৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'পতিতা' কবিতা।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

সংস্কৃত সাহিত্য — ঋগ্বেদ, মহাভারত, ভাসের-চারুদত্ত, শূদ্রকের-মৃচ্ছকটিক।

বৌদ্ধসাহিত্য — বিনয়বস্তু জাতক, মহাবগ্গ।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য — চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাসুন্দর।

বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাস—

১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — উপন্যাস : শ্রীকান্ত।
২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — গল্প : কাশীবাসিনী।
৩) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় — গল্প : তুরুপ।
৪) যুবনাশ্ব — গল্প : মন্থশেষ।

৫) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — গল্প : আকস্মিক।

৬) জগদীশ গুপ্ত — উপন্যাস : লঘুগুরু, নন্দ আর কৃষ্ণা।

৭) বুদ্ধদেব বসু — গল্প : চোর চোর।

৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — গল্প : মেলা।

৯) নরেন্দ্রনাথ মিত্র — গল্প : জামাই, বিদ্যুৎলতা।

১০) বিমল মিত্র — উপন্যাস : কড়ি দিয়ে কিনলাম।

১১) মনোজ বসু — উপন্যাস : নিশিকুটুম্ব, রূপবতী।

১২) সন্তোষকুমার ঘোষ — গল্প : শনি।

১৩) হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় — গল্প : বাইজি, যমুনাবাঈ।

১৪) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — গল্প : মাশুল।

১৫) প্রফুল্ল রায় — গল্প : জুহুবীচের সেই মেয়েটি।

১৬) কবিতা সিংহ — গল্প : চিত, নীলার গভীরে।

১৭) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — গল্প : স্বপ্নপুরী।

১৮) নিমাই ভট্টাচার্য — উপন্যাস : ওরাও মানুষ।

বাংলা নাটক—

১৯) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ — পতিতার সিদ্ধি।

২০) প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য — বাইজি বধূ।

২১) অসীম হালদার — কলির কালনেমি।

২২) কুমার নিরঞ্জন — শূন্য সিঁথির বদলা নিলাম।

২৩) নির্মল মুখার্জী — বারবনিতা বধূ।

বাংলা কবিতা—

২৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সতী, পতিতা, অপমানবর।

২৫) নজরুল ইসলাম — বারাঙ্গনা।

২৬) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — কল্লোলের কবিতা।

সহায়ক গ্রন্থ

১) গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থ নিলয়, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২।

২) চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপদ, সংস্কৃত সাহিত্যে বারাঙ্গনা, সুবর্ণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮।

৩) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, নারীর মূল্য, শরৎ সমগ্র, দে'জ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ।

৪) জানা, স্মরজিৎ, জীবন, যৌনতা ও যৌনকর্মী, দুর্বার প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ।

৫) তর্করত্ন, পঞ্চানন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, কামসূত্র (বাৎসায়ন), কোলকাতা, ১৯৯৮।

৬) দত্ত, মৃণালকান্তি, যৌনকর্মীদের জীবনসত্য, দুর্বার প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫।

৭) দেবী, মানদা, শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত, চিরায়ত, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪।

৮) দেবসেন, সুবোধ, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯।

৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশার্স, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৩।
১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৪।
১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,. মডার্ন বুক এজেন্সি।
১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্, বেশ্যাসংগীত ও বাইজিসংগীত, সুবর্ণরেখা, ২০০১।
১৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র ও রমলা দেবী, ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
১৪) বসু, রাজনারায়ণ, সেকাল আর একাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ, ১৮৭৪।
১৫) বসু, নিতাই, শরৎচন্দ্র, জীবন ও সাহিত্য।
১৬) বসু, দেবকুমার, কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য।
১৭) ভট্টচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫।
১৮) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪।
১৯) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুতুল, দে'জ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪।
২০) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, তারাশঙ্কর, দেশ কাল সাহিত্য।
২১) মিত্র, সরোজমোহন, শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা।
২২) রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশার্স, ২০০০।
২৩) সিংহরায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮।
২৪) সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., নবম সংস্করণ, ২০০৩।
২৫) সিংহ, কালীপ্রসন্ন, মহাভারত, বসুমতী, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮০।
২৬) সিকদার, অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।
২৭) গোস্বামী, নৃপেন্দ্র, বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি।
২৮) চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, বিভূতিভূষণ, জীবন ও সাহিত্য।
২৯) চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, প্রচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালির উত্তরাধিকার।
৩০) দত্ত, রমেশচন্দ্র, ঋক্‌বেদ সংহিতা।
৩১) দাশগুপ্ত, শক্রজিৎ, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক।
৩২) পাল, রবিন, কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ।
৩৩) বসু, দেবাশিষ, গবেষণার গোলে উনিশ শতকের পতিতা।
৩৪) বসাক, রাধাগোবিন্দ, কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র।
৩৫) বিদ্যাভূষণ, ব্রজেন্দ্রনাথ, কালিদাস গ্রন্থাবলী।
৩৬) ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত, সমাজ ও সাহিত্য।
৩৭) রায়, ত্রিদিবনাথ, যৌন মনোদর্শন।
৩৮) সেন, দীনেশচন্দ্র, কাশীদাসী মহাভারত।
৩৯) হাসনাৎ, আবুল, যৌনবিজ্ঞান।
৪০) A.B. Keith, Sanskrit Drama.
৪১) A.B. Keith, History of Sanskrit Literature.

৪২) Dr. Moti Chandra, The World of Courtesans.

৪৩) N.K. Bose, Cultural Anthropology.

৪৪) H.S. Chakladar, Studies of Kamasutra.

৪৫) S.K. Banerjee, Aspect of Ancient Life.

৪৬) C. Hayward Lon, Introduction Dictionary of Courtesans.

৪৭) Maryse Choisy, Psychoanalysis of Prostitutes.

৪৮) Greenwald and Aron Kritch, Prostitute of Literature.

৪৯) L.H. Morgan, Ancient Society.

৫০) Max Muller, History of Ancient Sanskrit Literature.

৫১) Max Muller, The Hymns of The Rig-Veda.

অবরোধের আড়াল ভেঙে : আত্মকথার উন্মোচন ও স্বনির্ভর নারী

সুলগ্না খান

প্রাক্-কথন

"একটি আন্তর জীবন, যার কোন ব্যবহার্য লক্ষ নেই, সেটিকে শূন্যতায় ডুবে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে, দুর্দমনীয়ভাবে সে সহ্য করে যে—বিদ্যমান অবস্থা, তার বিরুদ্ধে নিজেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার জন্যে, যে—বিশ্বে তার সত্তা সে চরিতার্থ করতে পারে না, তার থেকে ভিন্ন একটি বিশ্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে, তাকে আশ্রয় নিতে হয় আত্ম-প্রকাশের।"[১] 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' গ্রন্থে 'স্বাধীন নারী'র এই সংজ্ঞায়নের মধ্য দিয়ে সিমোন দ্য বোভোয়ার খুঁজে পেতে চেয়েছেন বিচিত্র ধরনের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের জগতে স্ব-অস্তিত্ব সন্ধান করে নিতে যাওয়া সেই নারীকে, যে পুরুষের পৃথিবীতে প্রান্তিক অবস্থানে বাস করেও অর্থপূর্ণ করে তোলে নিজের জীবনকে, প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অন্বেষণ করে চলে আত্মার প্রতিমাকে। নারীর ক্ষমতায়ন যেমন একাধারে নারীর ক্ষমতাবৃদ্ধির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় তেমনি সেই সঙ্গে তা নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতারও ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে নারীর ব্যক্তিগত উপলব্ধি তাঁকে প্রণোদিত করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তথা নিজের জীবনকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াতেও সে হয়ে ওঠে সমভাবে উৎসাহী। আত্মসচেতনতার বোধ নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাগত ক্ষমতাকেই শুধু সুদৃঢ় করে না বরং পরনির্ভরশীলতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে আত্মক্ষম হয়ে উঠতেও সাহায্য করে। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বেচ্ছাধীন বিচরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য, ইচ্ছানুযায়ী জীবিকা বা পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা, ক্ষমতা কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর মত প্রকাশের পরিসরটিকেই বিস্তৃততর করে তোলে। সৃজনশীল স্বাবলম্বিতা অর্জনের এই একক সংগ্রামের ইতিহাসে আমরা খুঁজে পাই এমন কিছু মুক্তিকামী নারীকণ্ঠকে যাঁদের আত্মজীবনী হয়ে ওঠে সুদীর্ঘকালীন অবদমনের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ, নারীর নিজস্ব আকাশ আবিষ্কারের 'অপর' ইতিবৃত্ত।

'দ্বিধাহীন সম্পূর্ণ মানুষী' : আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

"নারীর ক্রিয়াকর্মের প্রতি মনোযোগ দেবার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় যুক্তি হল, যে সমস্ত অবিচার নারীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের হানি ঘটায় তা দূর করা। সাম্প্রতিককালে ব্যবহারভিত্তিক চর্চার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে নারীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্ভ্রম আর সন্মান প্রদর্শন কতগুলি বিষয় দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়—স্বাধীন উপার্জনের ক্ষমতা, ঘরের বাইরে কর্মসংস্থান, স্বত্বলাভের অধিকার, সাক্ষরতা এবং শিক্ষালাভ করে পরিবারের ভিতরে এবং বাইরে সিদ্ধান্ত নেবার ভূমিকা।"[২] অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মনে করেছেন এইভাবে স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা অর্জন নারীর বক্তব্য ও কার্যকলাপকে ইতিবাচক শক্তিপ্রদান করে। শুধু তাই নয়, গৃহস্থালির বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতর এবং তা তাঁর কর্মদক্ষতাকে আরও কৌশলী ও শক্তিশালী করে তোলে। বহু বছরের পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার অভিঘাতকে অস্বীকার করে কিভাবে নারী পৌঁছায় স্বতন্ত্র বীক্ষায় সেই বিষয়টিকে

অনুধাবনের জন্য আলোচনার এই অংশে আমরা বেছে নিয়েছি তিনটি আত্মকথাকে, হৈমবতী সেনের 'দি মেমোয়্যারস অফ ডক্টর হৈমবতী সেন, ফ্রম চাইল্ড উইডো টু লেডি ডক্টর'[ক] (the memoirs of Dr. Himabati Sen, from child widow to lady doctor), সেতু রামস্বামীর 'এক অজানা ভারতীয় নারীর আত্মকথা'[খ] এবং কমলা দাসের 'মাই স্টোরি'[গ] (My Story)।

সময়, সমাজ, কালপর্বের বিচারে হৈমবতী, সেতু বা কমলা দৃশ্যতই তিনটি ভিন্নগ্রহের বাসিন্দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্গরমণী হৈমবতী (১৮৬৬-১৯৩৩), দক্ষিণী নারী সেতু (১৯২৪) বা জন্মসূত্রে কেরালার অধিবাসী কমলা (১৯৩৪-২০০৯) এমন এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছেন যা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেটি হল তাঁদের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি। ঔপনিবেশিক শাসনের ঘেরাটোপে বন্দি, সামাজিক রক্ষণশীলতার বোধে আক্রান্ত পারিবারিক পটভূমি হৈমবতী, সেতু বা কমলা তিনজনকেই বাধ্য করেছে অত্যন্ত অল্প বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে। বলা যেতে পারে সম্ভবত এখান থেকেই তাঁদের জীবনের বাঁকবদল ঘটে। হৈমবতী বিধবা হয়েছেন দশ বছরের বয়সে, সেতুর দশ বছর বয়সে বিবাহ এবং পনেরো বছর বয়সে তিনি অর্জন করেছেন মাতৃত্বের আস্বাদ। কমলার অভিজ্ঞতা আরও ভয়ংকর, অসম বিবাহের শিকার তো তিনি ছিলেনই, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাশবিক যৌন নির্যাতন যাকে কমলা নিজেই চিহ্নায়িত করেছেন 'ধর্ষণ' নামে। বাল্যবিবাহ, যৌন সহবাসে 'সম্মতির বয়স', দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তর্গত যৌন নির্যাতন 'ধর্ষণ'-এর সমগোত্রীয় কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্নে যখন বর্তমানে দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উত্তাল, তখন এই সকল আলোচনাকে যেন আরও মানবিক করে তোলে এই নারীদের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা যার মধ্য দিয়ে তাঁরা খুঁজে নিতে চায় ব্যক্তিগত মুক্তির পরিসরটিকে।

'নারীমুক্তির রাজনৈতিক অর্থনীতি'[৩] প্রবন্ধে মার্গারেট বেনস্টন জানিয়েছেন সমাজের উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে যেহেতু নারীদেরও আছে সুস্পষ্ট সম্পর্ক তাই অর্থনৈতিক কারণই নারীর অবস্থার পরিবর্তনের অন্যতম শর্ত। সহস্র প্রতিবদ্ধকতা সত্ত্বেও হৈমবতীর VLMS (Vernacular Licentiate in Medicine and Surgey) ডিগ্রি অর্জন এবং 'হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে হুগলির ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে যোগদান নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনে এক নিরাপত্তা ও অবলম্বন তৈরি করেছিল। তাই পেশাগত জীবনে মহিলা ডাক্তার হবার কারণেই দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের সম্মুখীন হয়েও তিনি বলতে পেরেছেন—"It gave me a log of opportunities in my life to do useful work."[৪] যে পরিবার সচেতন নির্দেশে নির্মাণ করে নারী-পুরুষের কাজের বিভাজন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অভাবে মেয়েদের কাজের সুযোগ ও অংশগ্রহণের হারকে করতে চায় নিয়ন্ত্রণ, সেখানে স্বামী স্ত্রীর কাছে দাবি করেন প্রশ্নহীন আনুগত্য সেই সমাজে দাঁড়িয়ে চল্লিশ বছর বয়সে সেতু রামস্বামী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন স্বয়ম্প্রভ হয়ে ওঠার। দক্ষ গৃহকর্ত্রীর সাংগঠনিক সক্ষমতার গতানুগতিক পরিচয় ছেড়ে তিনি নিয়োজিত হন নিজেকে আবিষ্কারের সাধনায়—"আমি বীণা বাজাতে শুরু করলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা রেওয়াজ করতাম এবং বিখ্যাত বেতারশিল্পী ভি.জি. সুব্রহ্মণ্যমের কাছে শিখতে শুরু করলাম।"[৫] দিল্লির সাংস্কৃতিক জগতে নিজেকে বাদ্যযন্ত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেতুকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁর চল্লিশতম জন্মদিনটির জন্য যেদিন তিনি প্রকৃতই 'স্বাধীনতা' অর্জন করেছিলেন। এই একই স্বাধীন স্বর আমরা শুনতে পাই কমলা দাসের কণ্ঠেও। 'মাই স্টোরি' তার বিতর্কিত চরিত্র সত্ত্বেও এমন এক প্রতিভাময়ী নারীকে চিত্রিত করে, আক্রমণ, কুৎসা, বিরূপ মনোভাব যাঁর অদম্য মনোবলকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি।

ব্যবহারিক জীবনের সংকট ও সংঘাতের বাতাবরণ কমলাকে উদ্বুদ্ধ করেছে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের দ্বারা প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত হয়ে ওঠার নিরলস প্রয়াসকল্পে। একাধারে মানসিক বিক্ষোভ, নিঃসঙ্গতা এবং অন্যদিকে সামাজিক অনুশাসনকে চূর্ণ করে নিজের শর্তে বাঁচতে চাওয়ার বিদ্রোহী মানসিকতা—এই উভয়ের দ্বন্দ্বে কমলা হয়ে ওঠেন এক পরিপূর্ণ মানবী, তার লেখনী প্রতীকায়িত করে সাহিত্যিকের মেধাবী বলিষ্ঠাতাকে—"I learnt for the first time to be miserly with my energy spending it only on my writing, which I enjoyed more than anything else in the world."[৬]

প্রত্যয়ী সত্তার অন্তর্বিশ্ব : অধিকার রক্ষার সংগ্রামে

জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর 'স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েদের অধিকার' প্রবন্ধে নারীর ভোটাধিকার অর্জন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাবার ক্ষমতা আমাদের আছে, দ্বিতীয়, প্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও আমাদের আছে, এর জন্য শিক্ষায় দীক্ষায় কৃতিত্বে চরিত্রে সকল দিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করা দরকার; এটিও একটি মস্ত বড় অধিকার—যা এতকাল কখনও আমাদের ছিল না।"[৭] মেয়েদের ভোটদানের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী যে কথাগুলি বলেছেন বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সাংস্কৃতিক নির্মাণে, পুরুষের সার্বিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে সমাজের তথা তাঁর নিজের শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। চিরাচরিত পারিবারিক ভূমিকার বাইরে বেরিয়ে এসে কিভাবে নারী স্পর্শ করে সমানাধিকারের সেই প্রচ্ছন্ন উপকূল যেখান থেকে সূচিত হয় একক ব্যক্তিসত্তার আত্মসৃজনের যাত্রাপথ, তারই মুখপত্র হয়ে ওঠে মণিকুন্তলা সেনের 'সেদিনের কথা'[ঘ], লীলা শেঠের 'অন ব্যালান্স, অ্যান অটোবায়োগ্রাফি'[ঙ] (On Balance, An Autobiography) এবং সবিতা গোস্বামীর 'অ্যালং দি রেড রিভার, এ মেমোয়্যার'[চ] (Along the Red River, A Memoir)।

মণিকুন্তলা, লীলা বা সবিতা বিচিত্র বহির্জগতে পদার্পণকারী সেই সব নারীদের প্রতিনিধি যারা ঘরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে এক উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থান ও জীবনধারা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর যে সামর্থ্য প্রয়োজন সেই সক্ষমতা অর্জনের সক্রিয় উপযোগিতার পক্ষে রায় দেন। নারীবাদী সমাজবিজ্ঞান যখন নারীর ক্ষমতায়নের তত্ত্বটিকে বোঝার চেষ্টা করে বিচারবুদ্ধি ও বাস্তব অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, নারীর জীবনযাত্রার পরিবেশের অগ্রগতির নিরিখে, তখন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের বাইরে দাঁড়িয়ে বিশিষ্ট জননেত্রী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, নারী আন্দোলনের পুরোধা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক মণিকুন্তলা সেন (১৯১০-১৯৮৭) প্রগতিশীলতার পরিধির সীমাবদ্ধতাকে বর্ণনা করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীর নিরপেক্ষতায়। তাই তিনি তাঁর আত্মকথায় দেখিয়েছেন কিভাবে নারীসমাজকে পরিপূর্ণ আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে হিন্দু কোড বিল, তার বিরোধিতা করেছে সমাজের তথাকথিত মান্যগণ্য বিশিষ্টদের পাশাপাশি স্বয়ং মেয়েরাও। আবার আইনের অধিকার সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতিষ্ঠার পথে যে নানা পারিবারিক ও সামাজিক বাধা বিদ্যমান তার কারণটিকে নির্ভুল বিশ্লেষণে চিহ্নিত করতে পারেন তিনি, দায়ী করেন দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা জনিত সমস্যা ও অসামঞ্জস্যকে, পিতৃতান্ত্রিক প্রথার কল্যাণে পুরুষের মজ্জাগত আধিপত্য-বোধকে এবং সর্বোপরি পুরুষতন্ত্রের কাছে অবদমিত হয়ে থাকার ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া নারীর দৃষ্টিকোণের মৌলিক তাৎপর্যটিকে। শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ মেয়েদের বিবাহ, পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদিতে সাহায্য করলেও তাঁদের নিজস্ব চিন্তার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা অর্জনে

সাহায্য নাও করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন যা নারী পুরুষের বৈষম্যকাঠামোকে সজোরে নাড়া দিতে পারে। সমাজসংস্কারের সুদীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে মণিকুন্তলাও তাই আস্থা স্থাপন করেছেন এই লিঙ্গ ভারসাম্যের ওপরই—"স্বাবলম্বী মেয়েদের সামনে তাদের নতুন জীবন পদ্ধতি নতুন কী কী সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং তার সমাধান কোন পথে সম্ভব হবে—এবার সেটা চিন্তা করার বোধহয় সময় এসেছে।"[৮]

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগের সময় যাতে সাংসারিক ও সামাজিক কোনও অসামঞ্জস্য না ঘটে, মণিকুন্তলা বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন সেই বিষয়টির ওপর। ভারতবর্ষের দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও (২০১২-২০১৭) লক্ষ্য হিসেবে মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ক্ষমতায়ন হল এমন একটি সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শ, যার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে রয়েছে সম্মান ও সমতার ধারণা। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মেয়েরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে, পারবে সম্পদের ওপর এবং চলতি ধারণা ও মনোভাবের ওপর অধিকার কায়েম করতে। ঠিক এই জায়গা থেকে যদি আমরা লীলা শেঠের আত্মজীবনীকে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে দেখব ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্যই লীলার (১৯৩০) একমাত্র পরিচয় নয়। লন্ডনে আইন পরীক্ষায় মহিলা হিসেবে প্রথম স্থানাধিকারী, দিল্লি হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারক, ভারতবর্ষের একটি রাজ্যের হাইকোর্টের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারক লীলা শেঠের বর্ণময় জীবন বোধহয় তখনই ভারসাম্যের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় যখন এক শিক্ষিত নারীর সমাজমনস্কতায় তিনি মেয়েদের 'empowerment'-এর প্রশ্নে সরব হন। পঞ্চদশ 'Law Commission' (১৯৯৭-২০০০)-এর পূর্ণ সময়ের সদস্য হিসেবে নারীর সম্পত্তির ওপর অধিকারের প্রশ্নে লীলা উপলব্ধি করেছেন যৌথ হিন্দু পরিবারে সম্পত্তির হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর যোগ্যতা থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হয়েছে শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণেই। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লীলা এবং তাঁর সহযোগীদের সুস্পষ্ট পরামর্শ সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির ওপর নারীর সমানাধিকারের মর্যাদাকে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। লীলার নিজের কথায়, "Despite the Constitution of India having proclaimed equality before the law as a fundamental right, a daughter is excluded from participation in ancestral property under the Mistakshare system merely by reason of her sex. It is my fervent hope that if the changes suggested are brought about and fully implemented it will be the death Knell of the curse of the dowry demand and will also improve the condition of women."[৯]

ভারত সরকারের 'National Policy for the Empowerment of Women' (২০০১) নামক ঘোষণাপত্রে বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মেয়েদের ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Globalisation has presented new challenges for the realisation of the goal of women's equality...strategies will have to be designed to enhance the capacity of women and empower them to meet the negative social and economic inputs that may flow from the globalisation process..." বিশ্বায়ন যেমন একাধারে বাড়িয়েছে সচেতনতা তেমনি অন্যদিকে তৈরি করেছে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরণে এমন এক সুস্থ মানসিকতার যা নারীর শ্রম এবং অবদানকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার পাশাপাশি এই মানসিকতা শুধুমাত্র নারীর শ্রম এবং অবদান নয়, কর্মক্ষেত্রে তাঁর সমানাধিকারকেও

সমগুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। 'Mon Gongaar Teerot' (Along the Red River) লিখতে গিয়ে সবিতা গোস্বামী (১৯৪০) কর্মক্ষেত্রে সমান মর্যাদা প্রাপ্তির অপরিহার্যতাকে বিশেষ গুরুত্বে স্থাপন করেছেন। দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন, সামাজিক বাধার বিরুদ্ধে গিয়ে সবিতার লড়াই প্রায় একক সংগ্রাম হয়ে ওঠে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গণমাধ্যমে (BBC, AFP, AP, BLITZ, THE WEEK, Dainik Janambhumi) সাফল্যের সঙ্গে পেশাদার সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করেছেন সবিতা, দেখেছেন আসামের উত্তপ্ত ও অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাংবাদিকের সন্ধানীদৃষ্টিতে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সংঘর্ষ বা সাফল্যের খতিয়ান রচনা করতে বসে সবিতা অস্বীকার করতে পারেননি কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বৈষম্যের দিকটিকে। তাই পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা অকারণ হয়রানির শিকার সবিতা প্রশ্ন রেখেছেন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতি, কিন্তু শেষপর্যন্ত লিঙ্গ বৈষম্যহীন কর্মমুখী দক্ষতার ওপর তাঁর আস্থা হয়নি ব্যাহত—"Today, when I see young men and women work together as equals facing equal competition as contemporaries, I feel delighted. Horizons have widened and minds have opened up to accept change."[১০]

বিদ্রোহীর ব্যক্তিগত উপনিবেশ; লিঙ্গচেতনার পুনর্নির্মাণ

আত্মজীবনী, যার মধ্যে থাকে রচয়িতার একক স্বর, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যক্তির সংঘর্ষ-সমন্বয়ের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, তা কি মেয়েদের আত্মপ্রভ হয়ে ওঠার পথে, আত্মপরিসর খুঁজে নিতে সাহায্য করতে পারে? বিশেষভাবে সেই মেয়েরা যদি হয় সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তাঁদের আত্মকথা কি আদৌ নৈঃশব্দ্যের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে বৃহত্তর, গঠনমূলক যাপিত জীবনস্বরকে আত্মপ্রকাশে উদ্দীপিত করার সমার্থ্য রাখে নাকি বাহ্যিক জীবনের মূল্যহীনতার বোধে আত্মগোপন করে তাঁদের নিভৃত স্বর, সমাজনির্দিষ্ট নারীধারণার বিপরীতে তাঁদের অন্তর্জীবন নির্মাণ করে নিতে পারে না আত্ম- অন্বেষণের প্রতিস্রোতী অধ্যায়টিকে। আলোচনার এই পর্যায়ে পৌঁছে আমরা তাই বেছে নিয়েছি এমন দুই নারীকে যাঁরা সামাজিক পরিচয়ে তথা পেশাগত জীবনে প্রান্তিক, তাঁদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নে লিঙ্গভিত্তিক কাঠামোগত বৈষম্যের দ্বান্দ্বিক রূপটি। ব্যক্তি নারীর সংগ্রামী মানবাধিকারকে অনুধাবনের জন্য আমাদের এবারের আলোচ্য বেবী হালদারের 'আলো-আঁধারি'[ছ] এবং নলিনী জামিলার 'দি অটোবায়োগ্রাফি অফ এ সেক্স ওয়ার্কার'[জ] (The Autobiography of a Sex Worker) নামক আত্মকথা দুটি। ১৮৮৯ সালে শ্রমজীবী নারীদের সমস্যা প্রসঙ্গে ক্লারা জেটকিন বলেছিলেন নারীমুক্তির প্রশ্নটি মূলত নারীদের কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং এটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। নারীদের অর্থনৈতিক কাজে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ক্লারার যুক্তি ছিল যে এটা শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই মেয়েদের পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতেও সহায়ক হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা তথা সামাজিক সম্মান অর্জনের যে প্রক্রিয়ায় ক্লারা মেয়েদের সংগঠিত করতে চেয়েছেন তারই বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে আমাদের সামনে উঠে আসেন বেবী হালদার (জন্মসাল আনুমানিক ১৯৭৪-৭৫) এবং নলিনী জামিলা (জন্মসাল আনুমানিক ১৯৫২-৫৩)। জীবনবৈশিষ্ট্যে বেবী এবং নলিনীর মধ্যে সাদৃশ্য যথেষ্টই। উভয়েই পেয়েছেন বিধ্বস্ত শৈশব, বঞ্চিত হয়েছেন শিক্ষার সুযোগ থেকে, শিকার হয়েছেন পারিবারিক হিংসার, নির্যাতনের, বেবী এমনকি ধর্ষিতাও হয়েছেন স্বামীর হাতে এবং শেষপর্যন্ত

অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে দুজনে বেছে নিয়েছেন দুরকম পেশা, বেবী গৃহপরিচারিকার এবং নলিনী যৌনকর্মীর। কিন্তু শুধুমাত্র জীবন সংগ্রামের সাদৃশ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বেবী এবং কেরালার নলিনী একাত্ম নন। বরং অন্তর্জীবন থেকে উঠে আসা নারীচৈতন্য, অকপট, স্বচ্ছ জীবনবোধ তাঁদের মধ্যে রচনা করেছে ঐক্যের সুর। সামাজিকভাবে নিম্নবর্গীয় এই নারীদ্বয় তাঁদের পেশাগত অস্তিত্বের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন ক্ষমতায়িত হয়ে ওঠার বীজমন্ত্র। বেবীর নিজের ভাষায়, "আমি আলাদা ঘর ভাড়া করে আছি তারপরেও বাবা ভেবেছিল যে আমি ঘরে ফিরে যাবই। ... কিন্তু আমার একই কথা যাব না, যাব না। স্বামীর ঘরে থেকে যে কত সুখ সে আমার জানা হয়ে গেছে, অনেক সুখ পেলামস অনেক দুঃখ পেলাম, অনেক জ্বালা যন্ত্রণা, অনেক নাম বদনাম। সবই পেলাম, আমি বাবাকে বললাম, এবার আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে একা থেকে দেখব থাকতে পারা যায় কিনা, আমি একা ছেলে মেয়ে মানুষ করতে পারি কিনা।"[১১]

ব্যক্তিগত জীবনের বৈষম্য, বঞ্চনা, অপমানবোধ থেকে বেবীর মধ্যে জন্ম নিয়েছে যে স্বাধিকার রক্ষার ভাবনা তার বশবর্তী হয়েই গৃহপরিচারিকার কাজ করেও তিনি স্বপ্ন দেখেছেন উন্নততর জীবনসম্ভাবনার, পালন করেছেন মায়ের কর্তব্য এবং তারপরেও নারী হিসেবে ঘটিয়েছেন আত্মজাগরণ। অপরপক্ষে কেরালার নিম্নবর্গীয় (Ezhava) পরিবারের মেয়ে নলিনী তাঁর আত্মজীবনীর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন সমাজের সেইসব নারীর কণ্ঠস্বর যাদের পরিচয় প্রান্তিকের মধ্যেও প্রান্তিক। নলিনীর পরিচয় যে তিনি একজন 'laingikatozhilai' (sex worker) কিন্তু এই পরিচয়েই বিপ্রতীপ সামাজিক অবস্থানে থেকেও তিনি অর্জন করেছেন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, আত্মপরিচিতি। নলিনীর আত্মকথার গুরুত্ব এখানেই যে তিনি শুধুমাত্র নিজের জীবনকে একটি দিশা দেননি, পাশাপাশি দেহব্যাবসার মতো একটি পেশা বেছে নিয়েও তাঁর মধ্যে নেই কোনও জীবিকাগত হীনমন্যতা। বরং যৌনকর্মীদের মানবাধিকার তথা সমানাধিকারের প্রশ্নে নলিনীর ভূমিকা একজন প্রতিবাদী সংগঠকের, 'শ্রম' এবং 'জীবিকা'র মূল্য তাঁর অন্বিষ্ট। দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, পশ্চাৎপদতা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নলিনীর মতো মেয়েদের এই পেশা গ্রহণে বাধ্য করলেও শ্রমজীবী নারীর অধিকার রক্ষায় নলিনীর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, একাধারে তিনি যেমন চেয়েছেন যৌনব্যাবসার মতো পেশায় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যৌনসম্পর্কের 'decriminalisation' তেমনি অন্যদিকে পুনর্বাসনের প্রশ্নে তাঁর মতামত নির্ভীক ও দ্বিধাহীন, "Sex work and sexual exploitation are two different things. It is the sex workers whom we bring together in our organisation. Some may have landed up in this trade through exploitation. But only those who have decided to stick to this trade for good can become part of our organisation. If a woman is found on the streets, the organisation first conducts a conselling session to find out whether she chose this trade or came into it by accident. We try to help those who want to move out. Even though we can't find them jobs, if it is a domestic issue, we extend our help."[১২]

উপসংহার

'উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা' গ্রন্থে অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, "উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্তরে যোদান এবং নেতৃত্ব দানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয় নই। উন্নয়নকে স্বাধীনতার রূপে দেখার এটি আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ

দৃষ্টিকোণ।"[১৩] কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে, 'Second Sex'-এর এই মৌলিক বীক্ষা যখন 'সেক্স' এবং 'জেন্ডার'-এর দ্বন্দ্ব, তার অর্থময়তা ও অর্থবহতাকে প্রশ্ন পরিপ্রশ্নে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চায় তখনি সামাজিকভাবে আরোপিত পরিচিতি এবং স্বীয় একক সত্তার আত্মজিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্র্যের মধ্যকার সংঘর্ষ-সমন্বয়—উত্তরণের এক অন্য কাহিনি রচিত হতে শুরু করে। আমাদের এই আলোচনা তুলে ধরতে চেয়েছে এমন আটজন নারীকে, সময়-পটভূমি-পরিচিতি-পরিস্থিতি বিচারে তাঁরা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র, পেশাগত ক্ষেত্রেও তাঁদের অবস্থান ভিন্ন। কিন্তু পৃথক পটভূমিতে দাঁড়িয়েও তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন আর সেই বন্ধন হল নারীর স্বাধিকারের বন্ধন। এই নারীরা শুধুমাত্র যে জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার বশবর্তী হয়েছেন তাই নয়, বরং নিজেদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার সংগ্রামকে তাঁরা যুক্ত করে নিতে চেয়েছেন সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব যেমন নারীকে পরনির্ভরশীল করে তোলে তেমনি অন্যদিকে সৃজনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়। আবার নিজেদের পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মক্ষেত্রেও নারীকে প্রতিনিয়ত যে অসাম্যের মুখোমুখি হতে হয় তাও তাঁদের সতর্ক সন্ধিৎসা এড়িয়ে যায়নি। এক স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, শ্রমের মূল্য, কর্মনিযুক্তি, শিক্ষা, মেধার প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মেয়েদের ক্ষমতায়নই যে জাতির উন্নয়নের একমাত্র সোপান হতে পারে হৈমবতী সেন, সেতু রামস্বামী, কমলা দাস, মণিকুন্তলা সেন, লীলা শেঠ, সবিতা গোস্বামী, বেবী হালদার এবং নলিনী জামিলার আত্মকথাগুলি তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হয়ে ওঠে। আর এইভাবেই মনোভঙ্গির স্বচ্ছতায় এই নারীরা শুধু নিজেরাই স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠেন না, দিশা দেখান সমগ্র জাতিসত্তাকে, লিঙ্গবৈষম্যের খণ্ডিত পৃথিবীতে হয়ে ওঠেন সচেতন বিশ্বনাগরিক।

তথ্যনির্দেশ

ক. রুলটানা স্কুল নোটবুকের পাতায় বাংলায় লেখা হৈমবতী সেনের স্মৃতিকথাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন তপন রায়চৌধুরী। জেরাল্ডিন ফোর্বস এবং তপন রায়চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় এই বইটি ২০০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ. সেতু রামস্বামীর মূল গ্রন্থটির নাম *'Bride at Ten, Mother at Fifteen, Autobiography of an Unknown Indian Woman'*। এটি ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। ২০১১-তে সৈয়দ তানভীর নাসরীন অনূদিত এর বাংলা অনুবাদটি দে'জ পাবলিশিং এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

গ. কমলা দাসের আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে, মালয়ালমে প্রকাশিত এই আত্মকথাটির নাম ছিল *'Ente Katha'*, আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদটি তাঁর নিজেরই করা। ১৯৮৮ সালে ইংরেজি অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

ঘ. ১৯৭৯ সাল থেকে মণিকুন্তলা সেন 'সেদিনের কথা' লিখতে শুরু করেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ১৯৮২ সালে নবপত্র প্রকাশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।

ঙ. লীলা শেঠ ১৯৯২ সালে হিমাচল প্রদেশের প্রথম বিচারক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর আত্মজীবনী 'On Balance, An Autobiograhpy' ২০০৩ সালে পেঙ্গুইন বুকস থেকে প্রকাশিত হয়।

চ. পেশাগত পরিচয়ে সাংবাদিক সবিতা গোস্বামীর মূল আত্মকথাটির নাম 'Mon Gongaar Teerot'। অসমিয়া ভাষায় রচিত এই আত্মজীবনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত 'দৈনিক জনমভূমি' পত্রিকার রবিবারের ক্রোড়পত্র 'বসুন্ধরা'তে। বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন সবিতার কন্যা ত্রিবেণী গোস্বামী মাথুর। অনূদিত গ্রন্থটি 'Along the Red River, A Memoir' নামে ২০১৩ সালে জুবান-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

ছ. বেবী হালদারের আত্মকথা 'আলো-আঁধারি' বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে রোশনাই প্রকাশনের পক্ষ থেকে। বাংলায় লেখা এই বইটি বিভিন্ন ভারতীয় তথা বিদেশি ভাষাতেও অনূদিত ও আলোচিত হয়েছে। বইটির হিন্দি অনুবাদ করেন লেখক মুন্সি প্রেমচাঁদের নাতি প্রবোধকুমার। মূল ভাষায় প্রকাশিত হবার আগেই এই বইটি হিন্দিতে প্রকাশিত হয়েছে।

জ. নলিনী জামিলার মূল আত্মজীবনীটির নাম 'Oru Laingikatozhilaliyute Atmakatha'। ২০০৫ সালে মালয়ালমে প্রকাশিত এই আত্মকথাটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জে. দেবিকা। ওয়েস্টল্যান্ড লিমিটেড ২০০৭ সালে প্রথম এই বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গনির্দেশ

১. সিমোন দ্য বোভোয়ার, *দ্বিতীয় লিঙ্গ,* হুমায়ুন আজাদ অনূদিত, পরিবর্ধিত ২য় সং, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৩৮৩।

২. অমর্ত্য সেন, *উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা,* অরন্দিম রায় অনূদিত, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ২০০৪, পৃ. ১৮৮।

৩. মার্গারেট বেনস্টনের প্রবন্ধটির ভাষান্তরিত রূপ প্রকাশিত হয় *অমৃতলোক* পত্রিকার 'নারীবিশ্ব' বিশেষ সংখ্যায় (জুন, ২০০৫)। বেনস্টনের প্রবন্ধটির ভাষান্তর করেছেন সংঘমিত্রা ঘোষ।

৪. Haimabati Sen, *the memoirs of Dr. Haimabati Sem from child widow to lady doctor,* trans. by Tapan Raychudhuri, New Delhi, Roli books, 2000, p. 336.

৫. সেতু রামস্বামী, *এক অজানা ভারতীয় নারীর আত্মকথা,* সৈয়দ তানভীর নাসরীন অনূদিত, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃ. ১৫১।

৬. Kamala Das, *My Story,* India, Harper Collins Publishers edition 2009, p. 201.

৭. জ্যোতির্ময়ী দেবী, "স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েদের অধিকার", দ্র. গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা.), *জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন ৪,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ. ২১৬।

৮. মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা,* কলকাতা নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, পৃ. ৩০৪।

৯. Leila Seth, *On Balance, An Autobiography,* India, Penguin Books, 2003, p. 402.

১০. Sabita Goswami, *Along the Red River, A Memoir,* trans. by Triveni Goswami Mathur, New Delhi, Zubaan, 2013, p. 98.

১১. দেবী হালদার, *আলো-আঁধারি,* উত্তর চব্বিশ পরগনা, রোশনাই প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ১১৭।

১২. Nalini Jameela, *The Autobiography of a Sex Worker,* trans. by J. Devika, Chennai, Westland Ltd. edition 2007, p. 139.

১৩. অর্মত্য সেন, *উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা,* অরবিন্দ রায় অনূদিত, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ২০০৪, পৃ. ১৯৮।

গ্রন্থঋণ

আকর গ্রন্থ

বাংলা

১. বেবী হালদার, *আলো-আঁধারি,* উত্তর চব্বিশ পরগণা, রোশনাই প্রকাশন, ২০০৪।

২. মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

৩. সেতু রামস্বামী, *এক অজানা ভারতীয় নারীর আত্মকথা,* সৈয়দ তানভীর নাসরীন অনূদিত, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১।

ইংরাজি

১. Das, Kamala, *My Story,* India, Harper Collins Publishers edition 2009.

২. Goswami, Sabita, *Along the Red River, A Memoir,* trans. by Triveni Goswami Mathur, New Delhi, Zubaan, 2013.

৩. Jameela, Nalini, *The Autobiography of a Sex Worker,* trans. by J. Devika, Chennai, Westland Ltd. Edition 2007.

৪. Sen, Haimabati, *the memoirs of Dr. Haimabati Sen, from child widow to lady doctor,* trans. by Tapan Raychaudhuri, New Delhi, Roli Books, 2000.

৫. Seth, Leila, *On Balance, An Autobiography,* India, Penguin Books, 2003.

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

১. অমর্ত্য সেন, *উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা,*.অরবিন্দ রায় অনূদিত, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ২০০৪।

২. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান,* কলকাতা, প্রথম মিত্রম্ সংস্করণ ২০০৯।

৩. চিত্র দেব, *মহিলা ডাক্তার : ভিন গ্রহের বাসিন্দা,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

৪. বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), *নারী পৃথিবী : বহুস্বর,* কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, ২০১১।

৫. বৃন্দা কারাত, *অস্তিত্ব ও মুক্তি,* বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার অনূদিত, কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৬।

৬. ভার্জিনিয়া উলফ্, *নিজস্ব এক ঘর,* অনসূয়া গুহ অনূদিত, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০২।

৭. মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারীজাগরণে,* জন্মশতবার্ষিক রচনাসংগ্রহ, কলকাতা, থীমা, ২০১০।

৮. যশোধরা বাগচী, *নারী ও নারীর সমস্যা,* কলকাতা, অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১২।

৯. শাশ্বতী ঘোষ, *অর্ধেক অর্থনীতি,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।

১০. শেখর ভৌমিক (সম্পা.), *সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা,* কলকাতা, ইন্দিরা প্রকাশনী, ২০০৫।

১১. শেফালী মৈত্র, *নৈতিকতা ও নারীবাদ : দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা,* ২য় সং, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৭।

১২. শ্যামলী গুপ্ত, *ক্লারা জেটকিন : সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেত্রী,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৯।

১৩. সিমোন দ্য বোভোয়ার, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, হুমায়ুন আজাদ অনূদিত, পরিবর্ধিত ২য় সং, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০২।

১৪. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন*, জেন্ডার গ্রন্থমালা-১, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩।

ইংরাজি

১. Avasthi, Abha, and A.K. Srivastava ed., *Modernity, Feminism and Women Empowerment,* Jaipur, Rawat Publications, 2001.

২. Bathla, Sonia, *Women, Democracy and the Media : Cultural and Political Representations in the Indian Press,* New Delhi, Saga Publications, 1998.

৩. Martin, Susan Ehrlich and Nancy C. Jurik, *Doing Justice, Doing Gender : Women in Legal and Criminal Justice Occupations,* 2nd ed., California, Saga Publications, 2007.

৪. Mishra, Kamal K. and Janet Huber Lowry, ed. *Recent Studies on Indian Women : Empirical Work of Social Scientists,* Jaipur, Rawat Publications, 2007.

৫. Moi, Toril, *Sexual/Textual Politics : Feminist Literary Theory,* London, Methuen, 1985.

৬. Outshoom, Joyce, ed. *The Politics of Prostitution : Women's Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce,* Cambridge University Press, 2004.

৭. Roy, Sanjoy, *Women in Contemporary India : Realities and Perspective,* New Delhi, Akansha Publishing House, 2010.

৮. Saunders, Kriemild, ed. *Feminist Post-Development Thought : Rethinking modernity, post-colonialism & representation,* London, Zed Books Ltd., 2002.

৯. Shukla, Dinesh K., *Poetry of Kamala Das : The Aesthetic Dimension,* New Delhi, Adhyayan Publishers & Distributors, 2010.

১০. Sodhi, Meena, *The Singular Self : Essays on Indian Autobiographies;* New Delhi, Discovery Publishing House, 2011.

সহায়ক পত্রিকা

১. রীনা সোনোয়ল কোউলি (সম্পা.), *যোজনা ধনধান্যে*, জুন ২০১২।

২. সমীরণ মজুমদার (সম্পা.), *অমৃতলোক : ১০৪* (নারীবিশ্ব বিশেষ সংখ্যা), জুন ২০০৫।